বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা

দ্বিতীয় খণ্ড

নবযুগ

নিবেদন

'বাঙ্‌লা সাহিত্যের রূপরেখা' দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হল। প্রথম খণ্ডে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙ্‌লা সাহিত্য আলোচিত হয়েছিল, তার 'নিবেদনে' আমি আমার দৃষ্টিভঙ্গি ও আলোচনা-পদ্ধতির কথা যা বলেছি, তার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এই খণ্ডে আধুনিক যুগের বা নবযুগের বাঙ্‌লা সাহিত্যের আলোচনা আরম্ভ হল—মাত্র ইং ১৮০০ থেকে ইং ১৮৫৭-৫৮ পর্যন্ত কালের বাঙ্‌লা সাহিত্যের কথাই এ ভাগে বলা হয়েছে। নবযুগের বাঙ্‌লা সাহিত্যের পক্ষে এ কাল 'প্রস্তুতির পর্ব'; 'প্রকাশের পর্ব' বা 'সৃষ্টির পর্ব' আসে এর পরে—মধুসূদন-বঙ্কিমের সঙ্গে।

সাহিত্য-সৃষ্টির দিক থেকে এ পর্ব বৃহৎ নয়, এ জন্য সাহিত্য-রসিকেরা এ পর্বের যথার্থ গুরুত্ব অনেক সময়ে উপলব্ধি করেন না। কিন্তু 'বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস মূলতঃ বাঙলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসের একটি অঙ্গ এবং বাঙালীর ইতিহাসেরই একটি শাখা'—এই মূল দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই এ পর্বও আমি আলোচনা করেছি। তাই শুধু রস-বিচারে আমি আলোচনা আবদ্ধ রাখি নি; বরং তৎকালীন বাঙালী জীবনের সমগ্র পরিবেশটিই এ জন্য আভাসিত করবার প্রয়োজন বোধ করেছি। অবশ্য মুখ্যতঃ যা সাহিত্যের রূপরেখা, তার পরিমিত আয়তনকেও একেবারে অতিক্রম করা আমার অভিপ্রায় ছিল না। এই দুই অভিপ্রায়ের মধ্যে সংগতি স্থাপন করবার জন্যও চেষ্টার ত্রুটি করি নি, তবু ত্রুটি থেকে গিয়েছে। কারণ অনেক সময়ে মনে হয়েছে কোনো কোনো বিষয় আমাদের শিক্ষিত সাধারণের নিকট যেমন সুবিদিত, অন্য কোনো কোনো বিষয়ের গুরুত্ব তেমনি তাঁদের অগোচর। এ ধারণার বশেই এই খণ্ডে কোথাও তথ্যের আধিক্য, কোথাও তার বিশদ উল্লেখ বা পুনরুল্লেখ, কোথাও সে তুলনায় বহুবিদিত তথ্যের অনধিক আলোচনা যা রইল এবারের মত আমি তা এই আকারেই উপস্থাপিত করলাম—শিক্ষিত সাধারণের তা গোচরীভূত হোক। তাঁদের মতামত ও সমালোচনা লাভ করলে তদনুযায়ী বারান্তরে এই আলোচনা পরিমার্জিত করা যাবে।

বলা বাহুল্য, আমি কোনো মৌলিক পুঁথিপত্র আবিষ্কার করি নি। কিন্তু এ পর্ব, এবং সমগ্র উনিশ শতকের বাঙলা সাহিত্য, সংস্কৃতি ও বাঙালী জীবন সম্বন্ধে আমার দৃষ্টিভঙ্গিতে মৌলিকত্ব থাকবার সম্ভাবনা, আলোচনা পদ্ধতিতেও তাই মৌলিকত্ব থাকতে বাধ্য। সে সবের মূল্য পাঠক বিচার করবেন।

এ পর্বের লেখক ও গ্রন্থাদির সম্বন্ধে তথ্যগত অনিশ্চয়তা অনেকাংশে বিদূরিত হয়ে এসেছে। সে জন্য বিশেষভাবে স্মরণীয় পথিকৃৎগণ—প্রথম ডঃ সুশীলকুমার দে, পরে স্বর্গীয় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। দু'জনারই গ্রন্থাদির, বিশেষতঃ 'সাহিত্য-সাধক চরিতমালার' ও 'দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালার' আমি পুনঃ-পুনঃ শরণ নিয়েছি। ডঃ সুকুমার সেন, মনোমোহন ঘোষ, সজনীকান্ত দাস, যোগেশচন্দ্র বাগল প্রমুখ পণ্ডিতেরাও বহু ক্ষেত্রে আমার পথ-প্রদর্শক। নানা বিষয়ের আলোচনায় মুদ্রণকালে ও তৎপূর্বে, আমাকে বিশেষ রূপে উৎকৃত করেছেন আমার পত্নী শ্রীযুক্তা অরুণা হালদার, অগ্রজ রঞ্জীন হালদার, অধ্যাপক দেবীপদ ভট্টাচার্য, বন্ধুবর সুনীল চট্টোপাধ্যায় ও অনিল কাঞ্জিলাল। তা ছাড়া জ্ঞাতে অজ্ঞাতে কত স্বর্গত ও জীবিত, কত মনস্বী সুহৃদ ও বন্ধুর নিকট যে আমি ঋণী তা নিজেও জানি না। যাঁদের কথা জানি তাঁদের নাম গ্রন্থমধ্যে স্বীকার করেছি। যদি তাতে ত্রুটি থেকে থাকে সে অনিচ্ছাকৃত অপরাধ আমাকে জানালে বাধিত হব। আমার খ্যাতনামা প্রকাশক ও প্রকাশালয়ের বিচক্ষণ কর্মী বন্ধুদের নিকট আমি নানা দিকে কৃতজ্ঞ।

এ আলোচনা অসম্পূর্ণ, ভ্রমপ্রমাদও তাতে থাকা সম্ভব। আমার আশা সমালোচকগণ তা প্রদর্শন করে আমাকে উপকৃত করবেন। শিক্ষিত সাধারণের নিকট প্রত্যাশা—তাঁরাও যুগ-জিজ্ঞাসায় ও মূল গ্রন্থাদি পাঠে আগ্রহ বোধ করবেন। তা হলে পরবর্তী সৃষ্টিমুখর কালের জীবন-পরিচয়ও সাহিত্য-আলোচনায় লেখক উৎসাহ লাভ করবেন। ইতি—

গোপাল হালদার

সংকেত ও গ্রন্থপঞ্জী

গ্রন্থোল্লিখিত লেখক ও পুস্তক পত্রিকাদির নাম সন্ধনী মধ্যে দ্রষ্টব্য। কোনো কোনো লেখকের ও পুস্তকের নাম বহুবার উল্লেখিত হওয়ায় সংক্ষেপিত হয়েছে।

সংকেত

সাঃ সাঃ চরিত—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ প্রকাশিত চরিত সমূহ।

ডঃ দে (সুশীলকুমার)—'সাহিত্যের ইতিহাস' বা Bengali Literature =History of the Bengali Literature in the 19th Century by Dr. S. K. De.

ডঃ সেন (সুকুমার)—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম ও ২য় খণ্ড)

" " —বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য

বঃ সাঃ পঃ=বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্

বঃ সাঃ পরিচয়=বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়—ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত।

কঃ বিঃ=কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

গ্রন্থপঞ্জী

মূল গ্রন্থাদি, দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা ও সাহিত্য পরিষদের দ্বারা পুনর্মুদ্রিত সংকলন গ্রন্থাদি ও উপরোক্ত গ্রন্থসমূহ ব্যতীত কয়েকখানি আলোচনা-গ্রন্থ বিশেষ উল্লেখযোগ্য:

কাজী আবদুল ওদুদ—বাংলার জাগরণ (বিশ্বভারতী)

সজনীকান্ত দাস—বাংলা গদ্যের প্রথম যুগ (মিত্র ঘোষ)

Amit Sen—Notes on Bengali Renaissance (N. B. Agency)

মনোমোহন ঘোষ—বাংলা সাহিত্য

যোগেশচন্দ্র বাগল—উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা

সূচী

নবযুগ

প্রথম ভাগ—প্রস্তুতির পর্ব (খ্রীঃ ১৮০০—খ্রীঃ ১৮৫৭)

প্রথম ভাগ

প্রস্তুতির পর্ব

(খ্রীঃ ১৮০০—খ্রীঃ ১৮৫৭)

শিক্ষা ও সংঘাত

প্রথম পরিচ্ছেদ

ঔপনিবেশিক পরিবেশ

ইং ১৭৫৭ অব্দে পলাশীতে ইংরেজ রাজত্বের সূত্রপাত হয়েছিল। সে রাজ্য আইনতঃ আরম্ভ হয় ইং ১৭৬৫তে, কোম্পানির বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভে। ভারতের আধুনিক ঐতিহাসিকরা ইং ১৭৬৫ থেকেই এ দেশের আধুনিক কাল গণনা করেন। তার মধ্যে ১৭৬৫ থেকে সিপাহী যুদ্ধের শেষ ১৮৫৮ পর্যন্ত কালকে বলা হয় 'কোম্পানির আমল'। ইং ১৮৫৮র ১লা নভেম্বর ব্রিটেনেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়া স্বয়ং ভারত-শাসনভার গ্রহণ করেন; ১৮৭৭ সালে তিনি ভারতসম্রাজ্ঞী বলে ঘোষিত হন। ১৯৪৭ পর্যন্ত ভারত-শাসন ব্রিটিশরাজের অধীনেই চলে। খ্রীঃ ১৮৫৮ থেকে খ্রীঃ ১৯৪৭ পর্যন্ত কাল ব্রিটিশ-রাজের শাসন-কাল ('India under the Crown') বা 'ব্রিটিশ-রাজের আমল'।

যুগ ও পর্ব: অবশ্য খ্রীঃ ১৭৫৭ থেকে খ্রীঃ ১৯৪৭ পর্যন্ত এই একশ' নব্বুই বৎসরকে সাধারণভাবে 'ইংরেজ রাজত্ব' বলা হয়। আর এক হিসাবে এই ইংরেজ রাজত্ব-কালকে (১৭৫৭ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত) 'ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার যুগ'-ও বলা চলে—এটি সামাজিক-রাজনৈতিক গণনা। সেই দৃষ্টিতে দেখলে ইং ১৭৫৭ থেকে ইং ১৮৫৮ পর্যন্ত কালকে ব্রিটিশ 'বণিক-পুঁজির (Merchant Capital) শাসন-পর্ব' এবং ইং ১৮৫৮ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত কালকে ব্রিটিশ 'শিল্প-পুঁজির (Industrial Capital) শাসন-পর্ব'ও বলা যায়। তবে ১৮৯০এর সময় থেকে এই 'শিল্প-পুঁজি' যে পৃথিবীব্যাপী 'সাম্রাজ্যতন্ত্র' (Imperialism)-এর রূপ গ্রহণ করতে থাকে তাও স্মরণীয়। বলা বাহুল্য, এসব তারিখ চুলচেরা ভাবে ধরা উচিত নয়, মোটামুটি তা এক-একটা পর্বের সূচক মাত্র। না হলে ব্রিটিশ শিল্প-মালিকেরা ১৮৫৮র পূর্বেই ভারত-শাসনে প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিল, তাতে সন্দেহ নেই। মনে রাখা দরকার—ঘড়ির কাঁটা দেখে যুগের আরম্ভ হয় না, যুগের সমাপ্তিও হয় না; প্রকাশেরও পূর্বে চলে আয়োজন, আর সমাপ্তিরও শেষে থাকে জের বা পরিশিষ্ট।

এ সব রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পট-পরিবর্তনের মূল্য অবশ্য বাঙলা সাহিত্যে প্রত্যক্ষ নয় পরোক্ষ মাত্র। এমন কি, শিক্ষা ও সংস্কৃতির অন্যান্য বিভাগে সে প্রভাব যতটা স্পষ্ট, সাহিত্য ও সুকুমার-শিল্পের ক্ষেত্রে তা ততটাও স্পষ্ট নয়। তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। নবাবী আমলের বাঙলা সাহিত্যে যেমন সিরাজদ্দৌলা-মীরজাফর-মীরকাশেমের নাম নেই, তেমনি ইংরেজ আমলের বাঙলা সাহিত্যেও ক্লাইব্-হেষ্টিংস্ থেকে শুরু করে ডাল্‌হৌসি-ক্যানিং কেন, লিন্‌লিথ্‌গো-ওয়েভেলদেরও কোনো পরিচয় নেই। আধুনিক বাঙলা সাহিত্যও জন্মেছে এবং বর্ধিত হয়েছে বাঙালী-সমাজের বুকে। বাঙালী-সমাজে একালে যে বিরাট পরিবর্তন ঘটেছে তা না বুঝলে উপলব্ধি করা যায় না যে, কেন, কি ঘাত-প্রতিঘাতের সূত্রে পূর্ব যুগের বাঙলা বা ভারতীয় সাহিত্যের এমন রূপান্তর ঘটল। যথাসম্ভব সেই সমাজের ইতিহাসের সঙ্গে মিলিয়েই তাই এই সাহিত্যেরও পর্ব-বিভাগ যুক্তিযুক্ত। সেদিক থেকে আমরা গোটা অষ্টাদশ শতাব্দীকে সাধারণভাবে 'নবাবী আমল' (খাশ নবাবী আমল + 'নাবুবী আমল') বলেছি। ইং ১৭৯৩এর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরেই অবশ্য আর-একটা নূতন সামাজিক ব্যবস্থার সূত্রপাত হয়। তবুও মোটামুটি ইং ১৮০০ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত কালকেই বাঙলায় 'ঔপনিবেশিক মধ্যবিত্তের যুগ' বা বাঙালী 'ভদ্রলোকের যুগ' বলে গ্রহণ করেছি। অবশ্য ১৮১৭ (হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা) থেকে ১৯১৮ (প্রথম মহাযুদ্ধের অবসান) পর্যন্ত কালটা তাঁদের প্রতিপত্তির কাল। এই কালেই পড়ে বাঙলার 'জাগরণের যুগ' বা যাকে বলা হয় বাঙলার রিনাইসেন্স। তন্মধ্যে ১৮০০ থেকে প্রায় ১৮৫৭-৫৮ পর্যন্ত কালকে বলব তার 'প্রস্তুতির পর্ব'; ইং ১৮৫৮ (বা ইং ১৮৫৯) থেকে প্রায় ইং ১৮৯৩ পর্যন্ত কালকে বলতে চাই 'প্রকাশের পর্ব', তখন 'বাংলার জাগরণের' বা 'বাঙলার রিনাইসেন্সের' ভরা জোয়ার। সে জোয়ার ১৮৯৩ কেন, ১৯০৫ পর্যন্ত দুকূল ছাপিয়ে প্রবাহিত। তথাপি বঙ্কিমের পরবর্তী কালকে (বিশেষ করে ১৯০৫এর 'স্বদেশী যুগে'র সময় থেকে) জাতীয় 'অভিযানের পর্ব' বলাই শ্রেয়ঃ। অবশ্য তার মধ্যে আরও ভাগ-বিভাগ আছে। যেমন, ১৯০৫ থেকে ১৯১৮ 'স্বদেশীর যুগ'; ১৯১৮ থেকে ১৯৪২ 'বিশ্বসংকটের যুগ'; তারপর 'কালান্তর'। ইং ১৯১৮র সময়েই 'কালান্তরের' বীজও উপ্ত হয়; কিন্তু তা অঙ্কুরিত হয়ে ওঠে ১৯৪১-৪২এর সময়ে।

মানুষের নাম দিয়ে যদি এসব পর্বকে চিনতে হয় তা হলে সে নাম হবে সাহিত্যের যুগ-পুরুষদের নাম। যেমন, প্রথম, রামমোহন-বিদ্যাসাগরের যুগ (১৮০০-১৮৫৮); দ্বিতীয়, মধুসূদন-বঙ্কিমের যুগ (১৮৫৯-১৮৯৩); তৃতীয়, রবীন্দ্রনাথের যুগ (১৮৯৪-১৯৪১)। মোটামুটি ভাবে অবশ্য আমরা বাঙালী জীবনের এ যুগের আর একটা সাধারণ বিভাগও করি—তা হল 'উনবিংশ শতকের বাঙলা'—তার প্রথমার্ধ 'প্রস্তুতির পর্ব', দ্বিতীয়ার্ধ খাশ 'রিনাইসেন্স' অথবা 'প্রকাশের পর্ব'। এ খণ্ডের পরে 'বিংশ শতকের বাঙলা'। কাজ চালাবার পক্ষে এ বিভাগও বেশ সুবিধাজনক, যদিও এটা তারিখ-দাগা বিভাগ।

কিন্তু ১৭৫৭র রাজনৈতিক পরিবর্তনেই যে এই বাঙালী জীবন ও বাঙালী সমাজ বিশেষভাবে পরিবর্তিত হয়ে যায়—ক্লাইব্-হেস্টিংস্দের ভুলে গেলেও সে বিষয়ে সন্দেহ করা চলে না। পলাশীর ফলেই বাঙালী সমাজ মধ্যযুগ ছাড়িয়ে উঠতে লাগল। এ চেষ্টাটা সক্রিয় হয়ে উঠতে থাকে ১৮০০র পর থেকে। আর এই পলাশীর পাপে—বা ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার চাপে, যা'ই তাকে বলি,—সেই ১৯৪৭ পর্যন্তও বাঙালী জীবন আধুনিক কালের মধ্যে সম্পূর্ণ আত্মপ্রতিষ্ঠ হতে পারল না,—রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের এই ঔপনিবেশিক প্রেক্ষাপট ও ভাব-বিপর্যয়ের অভিনব রূপ তাই বিশেষ লক্ষণীয়। কারণ, আধুনিক বাঙলা-সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি তার সঙ্গে নানাসূত্রে জড়িত।

॥ ১ ॥ রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট

(১) **ইংরেজের রাজ্যবিস্তার:** ইং ১৮০০ থেকে ইং ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত যে বৎসরগুলি এল তাকে আর 'নাবুবী আমল' বলবার উপায় নেই। কারণ, ১৮০০ সালের পূর্বেই শাসকেরা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে বসেছেন। এমন কি, ১৭৯৩এর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করে রাজস্ব ব্যবস্থায়ও তাঁরা স্থায়িত্ব এনেছেন। আর, ১৭৭৩ সালের 'রেগুলেটিং অ্যাক্ট' ও ১৭৮৩ সালের পিট্-এর 'ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট' দ্বারা সেই বণিক্ কোম্পানিকে ব্রিটিশ রাজশক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন করে নিয়েছেন। ভারত-জয়ের ভূমিকা যখন এভাবে প্রস্তুত, উদ্যোগী পুরুষেরা তখন চুপ করে বসে থাকেন কি করে? রাজ্যবিস্তার ছিল ওয়েলেস্লির (১৭৯৮ থেকে ১৮০৫) প্রধান লক্ষ্য। মৈশুরের টিপু সুলতানের পতন ঘটল (ইং ১৭৯৯), নানা ফড়নবিশের মৃত্যুর (ইং ১৮০০) পরে মারাঠা

শক্তির পতন ঠেকাবার মত কেউ রইল না, অবশ্য সে পতন সম্পূর্ণ হল ইং ১৮১৯ অব্দে। তারপরও দেশীয় একটি রাজশক্তি ছিল—শিখ শক্তি; রণজিৎ সিং-এর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সেই শিখ শক্তিও ভেঙে পড়ল। ১৮৪৯এ পাঞ্জাবও কোম্পানির রাজ্যভুক্ত হয়ে গেল। যুদ্ধ-বিগ্রহ ও রাজ্যবিস্তারের ইতিহাসে আফগান যুদ্ধ, বর্মা যুদ্ধ, নেপাল যুদ্ধ, কিংবা ভারতমহাসাগরে ইংরেজ আধিপত্য স্থাপন—এসবও গণনীয়, কিন্তু সাহিত্যের বিচারে তার মূল্য কী? সমাজের হিসাবেই বা গুরুত্ব কতটুকু? এসব যুদ্ধ-বিগ্রহ, রাজ্যবিস্তার কলকাতা থেকেই পরিচালিত হয়েছে; কিন্তু কলকাতার বা বাঙলার বাঙালী সমাজকে তা প্রায় স্পর্শও করেনি। অবশ্য যুদ্ধ ও রাজ্যজয়ের আসল মাশুল জুগিয়েছে প্রধানতঃ বাঙলা ও অযোধ্যা। তাতে নিরুপায় প্রজাশ্রেণী শুধু শোষিতই হয়েছে। তবে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদ থেকে দু'চারজন বাঙালী কর্মী পুরুষ কমিসারিয়েটে কাজ ও ঠিকাদারী নিয়ে 'পশ্চিমে' গিয়েছেন, সেখানে বসবাস করেছেন, সেসব অঞ্চলে নতুন শিক্ষা-দীক্ষাও কিছুটা প্রচলিত করতে কালবিলম্ব করেন নি। ইংরেজের তল্পীদার রূপে সৌভাগ্য লাভ করলেও নানা সূত্রে পরবর্তী কালের জন্য (বিশেষ করে এই উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ও শেষ ভাগে) তাঁরা উত্তর ভারতে বাঙালীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করেন, সুশিক্ষা ও দেশপ্রীতিরও একটা ঐতিহ্য রচনা করে যান। অর্থাৎ, ইংরেজের রাজ্যজয়ে শিক্ষিত ও ভদ্রলোক বাঙালীর পরোক্ষ কিঞ্চিৎ সৌভাগ্য লাভও ঘটেছে। কিন্তু স্পষ্টতঃ কোনো রাজনৈতিক বা সামাজিক উল্লাস বা বিক্ষোভ এইসব যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে দেখা দেয় নি। যুদ্ধ ও রাজ্যজয় অপেক্ষা বরং কোম্পানির শিক্ষা-বিষয়ক প্রস্তাব (১৮১৩ ও ১৮৩৫) ও সমাজ সংস্কারের উদ্যোগে (১৮২৯, ১৮৪৩, ১৮৫৪ ইত্যাদি), বেন্টিংক্-মেকলের প্রয়াসেই বাঙালী সমাজ বেশি চকিত ও বিচলিত হয়েছে। তার পূর্বেই অবশ্য বাষ্পীয় পোত (১৮২৪), তণ্ডুল কল (১৮২৬), গম-ভাঙার কল (১৮২৯), এমন কি নূতন তাঁত (১৮৩০) কলকাতার বাঙালীকে আকৃষ্ট করেছে। তারপরে ডালহৌসির (১৮৪৮-১৮৫৬) Conquest ও Consolidation—তাঁর দেশীয় রাজ্য গ্রাসের নীতি—বাঙলা দেশে উদ্বেগ সঞ্চার করেছিল কিনা তা বলা কঠিন। তবে তাঁর প্রারব্ধ Development, নব প্রবর্তিত টেলিগ্রাফ (১৮৫৪) ও রেলপথ (১৮৫৩) প্রভৃতি নূতন যন্ত্রশিল্পের আভাস নিয়ে এসে সমাজের সকল স্তরের মানুষকেই

চঞ্চল ও চমকিত করেছিল। অবশ্য ততক্ষণে নতুন শিক্ষারও যথেষ্ট প্রসার বাঙলায় ঘটেছে, 'জাগরণে'র জোয়ার দেখা দিয়েছে। কোম্পানির রাজনৈতিক আয়ু ডালহৌসির পরেই ফুরিয়ে গেল সিপাহী যুদ্ধে। বাঙলা দেশের ব্যারাকপুরে পশ্চিমাঞ্চলের সিপাহীরাই এ বিদ্রোহের সূচনা করে ২৯শে মার্চ ১৮৫৭ সালে। উত্তরাপথ মাথা চাড়া দিয়ে উঠলেও বাঙালীর তখন বিশেষ মাথা খারাপ হয় নি, দেখা যায়। অথচ প্রায় তখন (১৮৫৮) বা একটু পরেই (১৮৫৯ অব্দে) নীলকরের অত্যাচার প্রতিরোধ করতে বাঙালী মাথা তুলে দাঁড়াল দেখতে পাই,—সিপাহী যুদ্ধের পরিণাম দেখেও সে নিস্তব্ধ থাকে নি।

এ কথা অবশ্য ঠিক নয় যে, ইংরেজের শাসন ও শোষণ বাঙলা দেশে সকলে মাথা পেতে মেনে নিয়েছে। বিদেশী ও বিধর্মীর শাসনের বিরুদ্ধে পলাশীর পর থেকে ছোট বড় অভ্যুত্থান চলেছে। যেমন, ঢাকার নবাব সরফরাজ খাঁ, বীরভূমের নবাব আসাদ জামাল খাঁ প্রভৃতি সামন্ত প্রধানদের বিদ্রোহ; সন্ন্যাসী ও ফকিরদের নেতৃত্বে নানা জাতের বৃত্তিহীন মানুষের অভ্যুত্থান; মেদিনীপুরের চুয়াড়দের বিদ্রোহ, শ্রীহট্টের সংঘাত (১৭৯৯), ও মুর্শিদাবাদের উজীর আলীর চক্রান্ত ও বিদ্রোহ (১৭৯৯) প্রভৃতি বিভিন্ন প্রচেষ্টা—তাতে মুসলমানও ছিল, হিন্দুও ছিল। ১৮০০এর পরেও কোম্পানির শোষণের ও উৎপীড়নের শেষ ছিল না। বরং দেশের অর্থনৈতিক বিপর্যয় আরও ঘনিয়ে ওঠে। কাজেই ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের (ইং ১৮০০ থেকে ইং ১৮৫৭) আগুন বাঙলা দেশে বরাবরই এখানে-ওখানে জ্বলে উঠেছিল, তা' দেখতে পাই (দ্রষ্টব্য: অধ্যাপক শশিভূষণ চৌধুরী লিখিত নবপ্রকাশিত ইংরেজী গ্রন্থ *Civil Disturbances during the British Rule in India (1765-1867)*; World Press, 1955)।

(২) **আন্তর্জাতিক সংযোগ:** এ সব আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ বা ভারতীয় যুদ্ধের চেয়ে ইংরেজের নিকট (১৭৯৩ থেকে ১৮১৪ পর্যন্ত) দুশ্চিন্তার কারণ হয়েছিলেন নেপোলিয়ন। পলাশীর পূর্বেই অবশ্য ফরাসী, ওলন্দাজ প্রভৃতি ইউরোপীয় বণিক্ শক্তিকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ইংরেজ কোম্পানি প্রায় পরাস্ত করেছিল। তার প্রধান কারণ, ফরাসী বা ওলন্দাজ বণিক্ মণ্ডলের পিছনে রাজনৈতিক শক্তি যোগাবার মত যথার্থ বণিক্ রাষ্ট্র ('বুর্জোয়া স্টেট') তাদের স্বদেশে—ফ্রান্সে বা হল্যাণ্ডে—তখনো প্রতিষ্ঠিত হয় নি। বুর্জোয়া রাষ্ট্র

এতদিন পর্যন্ত (অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ) একমাত্র ব্রিটেনেই ছিল (ইং ১৬৮৮ অব্দের 'রক্তহীন বিপ্লবের' ফলে তা' স্থায়ী হয়)। একশত বৎসর পরে হলেও 'ফরাসী বিপ্লবের' (১৭৮৯-১৭৯৩) দুর্বার তেজ নিয়ে নেপোলিয়ন ফ্রান্সে সেই বুর্জোয়া রাষ্ট্রই গঠন করেন। তখন তিনি হারানো সুযোগ পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় পাশ্চাত্য পৃথিবী মথিত করে বেড়ান। মৈশুর, মারাঠা প্রভৃতি ভারতীয় রাজশক্তির সঙ্গেও ফরাসী রাজশক্তির কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। শেষ ফলাফল যা' ঘটে তা' আমরা ইতিহাসে দেখতে পাই; কিন্তু পরোক্ষে যে বীজ তাতে উপ্ত হয় তা' বিস্মৃত হবার মত নয়। বাণিজ্য ব্যাপারেই তার ফল প্রথম দেখা দিল। নেপোলিয়ন ইউরোপ খণ্ডের বাজার ব্রিটেনের বণিক্‌দের মুখের ওপর বন্ধ করে দেন। তার ফলে বাধ্য হয়েই ব্রিটেন তার নবাবিষ্কৃত যন্ত্রশক্তির বলে নিজ উৎপাদন বৃদ্ধি করতে অগ্রসর হল; এবং সেই উৎপন্ন মালের বাজার হিসাবে ভারতবর্ষকেই আবার প্রধান আশ্রয়স্থল করে ফেলল। অর্থাৎ ব্রিটিশ শিল্পবিপ্লব ও ভারতের কুটিরশিল্পের সর্বনাশ নেপোলিয়নীয় যুদ্ধে নিকটতর হয়ে উঠল। সে যুদ্ধের দ্বিতীয় ফল আরও দুর্নিরীক্ষ্য—তা' রাজনৈতিক। ইংরেজের রাজ্যলাভে ভারতের ভাগ্য ব্রিটিশ রাজনীতির সঙ্গে জড়িত হয়ে যায়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সেই কারণেই সমুদ্রপথ সুপ্রশস্ত হয়, বহির্বিশ্বের সঙ্গেও নূতন করে ভারতের একটা সম্পর্ক গড়ে উঠতে থাকে। নেপোলিয়নীয় যুদ্ধ সেদিকেও ভারতবাসীর দৃষ্টি খুলে দেয়। ইংলণ্ডের রিফর্ম অ্যাক্ট, দক্ষিণ আমেরিকায় স্পেনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, ইতালির নেপ্‌লস্-এ অষ্ট্রিয় সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে মুক্তিসংগ্রাম—রাজা রামমোহনকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। প্রজাতন্ত্রের 'তেরঙ্গা ঝাণ্ডা' ইয়ং বেঙ্গলের যুবকদেরও প্রবুদ্ধ করত। ফ্রান্সের স্থান উনিশ শতকে ক্রমে গ্রহণ করে রুশিয়া। ভারতবর্ষের মনে তারও একটা ছায়া ঐ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে পড়ে, তা' আমরা জানি। (বালক রবীন্দ্রনাথ মাতার নির্দেশ মত সেই আশঙ্কা জানিয়েই পাঞ্জাব-প্রবাসী মহর্ষিকে প্রথম পত্র লিখেছিলেন, 'জীবনস্মৃতি' দ্রষ্টব্য)। বলা বাহুল্য, ব্রিটিশ রাজনীতি সম্বন্ধে বাঙালীর সশ্রদ্ধ আগ্রহ জেগেছিল ইংরেজী-শিক্ষা প্রচলিত হলে; আর আন্ত-র্জাতিক রাজনীতিতে যথার্থ জিজ্ঞাসা তার পূর্বে জাগতে পারে না—সংবাদপত্রের প্রচার না বাড়লে শিক্ষিত সাধারণের সে বিষয়ে আগ্রহ জন্মে না। সামন্ত রাজারা শুধু চুক্তি ও চক্রান্তই করতে পারেন, তার বেশি সমকালীন

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বোঝবার মত ইচ্ছা বা সামর্থ্য তাঁদের ছিল না। এই জন্যই ভারতে 'আন্তর্জাতিক চেতনা'র গুরু বলতে হয় রাজা রামমোহন রায়কে।

(৩) **হুইগ্-টোরির ইণ্ডিয়া-পলিসি:** কিন্তু পরাধীন জাতির রাজনীতি নেই, কারণ রাষ্ট্র তার নিজের নয়। ভারত রাষ্ট্র ছিল কোম্পানির ব্যবসা। ব্রিটিশ রাজনীতিতে ভারত-ভাগ্য জড়িয়ে গেলে ব্রিটেনের হুইগ্-টোরির দলগত হার-জিতের খেলায় কোম্পানির ভারতীয় শাসন-নীতি ও শাসন-পদ্ধতি একটা বড় ঘুঁটি হয়ে পড়ে। ভারতীয়রা অবশ্য স্বদেশে নিজেদের এই ভাগ্য-বিবর্তনেও দর্শক থাকতেই বাধ্য ;—প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরে (১৭৬৫-১৮১৫) তাঁরা নিষ্ক্রিয় ও নিস্পৃহ দর্শকই থাকেন। কিন্তু ব্রিটিশ রাজনীতির সেই আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে ভারতবাসীর দুর্ভাগ্য ও দুর্দশার রক্তমাখা কাহিনীও ক্ষণে ক্ষণে উদ্‌ঘাটিত হয়ে পড়ত হুইগ্‌দের মুখে। তারাই ক্লাইব্-হেস্টিংস-এর 'ইম্পীচ্‌মেণ্ট' ঘটায়। তারাই কোম্পানির লুণ্ঠন, অত্যাচার, দুর্নীতির মুখোশ খুলে কোম্পানির বাণিজ্যাধিকার বাতিল করার জন্য আন্দোলন করত। এসব করেছে তারা নিজেদের দলীয় স্বার্থের তাগিদেই। তার মূল কারণটা এই—সেই কবে (ইং ১৬০০ অব্দে) রাণী এলিজাবেথের হাত থেকে জনকয়েক ইংরেজ বণিক্ ভারতভূমিতে বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার প্রথম পায়। যে বণিক্‌রা তা পেল না তারা কেউ কেউ অনেক চেষ্টা করে একশ' বৎসর পরে (১৭০৮) 'সংযুক্ত' কোম্পানির ভেতর ঢুকতে পেল। কিন্তু তার পরেই একদিকে ফরাসী ওলন্দাজ প্রভৃতি বিদেশীয় বণিক্‌দের হারিয়ে ইংরেজ কোম্পানি ভারতের বহির্বাণিজ্যে যথার্থই একচ্ছত্র বাণিজ্যাধিকার আয়ত্ত করে ; আর অন্যদিকে পলাশীর পরে রাজ্যলাভ করে বেপরোয়া শোষণ ও লুণ্ঠনের অধিকারী হয়। 'নাবুবী আমলের সেই ঐশ্বর্য যখন ইংলণ্ডের মানুষদের চোখ ঝলসে দিচ্ছে তখন অন্যদিকে নতুন নতুন অনেক ইংরেজ বণিক্ মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে ;—তারা আরও উদ্যোগী, আরও বেশি তাদের আকাঙ্ক্ষা। তাই এই উদ্যোগী বণিক্‌দের প্রধান স্বার্থ হল ভারতীয় বাণিজ্যে কোম্পানির একচেটিয়া অধিকার লোপ করে 'অবাধ বাণিজ্যাধিকার' স্থাপন করা। ব্রিটিশ অর্থশাস্ত্রের আদিগুরু অ্যাডাম্ স্মিথ্, তাই একচেটিয়া বাণিজ্যের কুদৃষ্টান্তরূপে কোম্পানির বর্ণনা করেছেন। ঠিক এ সময়েই আবার আমেরিকা বিদ্রোহ করে স্বাধীন হয়। তার ফলে সেই ইংরেজ বণিক্‌দের ঔপনিবেশিক বাজার

সংকুচিত হয়ে পড়ে ; ভারতের বাজারে প্রবেশ তাদের পক্ষে আরও প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। আর ঠিক এ সময়েই (১৭৬০-এর পরে) এই উদ্যোগী বণিক্‌দের প্রয়োজন অনুযায়ী ব্রিটেনে নূতন নূতন যন্ত্রপাতির উদ্ভাবনা আরম্ভ হয়, ব্রিটেনের 'শিল্প-বিপ্লবে'র সূচনা হতে থাকে ;—সেসব কথা মুখ্যতঃ 'অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে'র প্রসঙ্গেই আলোচ্য। কিন্তু এই বণিক্ শাসনের বনিয়াদই হল অর্থনৈতিক তাড়না। সেই শাসনের নীতি ও পদ্ধতিতে এসব কারণে যে পরিবর্তন ঘটল তা' বোঝবার জন্যই এ কথা এখানেও উল্লেখ করতে হয় যে, কোম্পানির অংশীদার গদীয়ান বণিক্‌দের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের রাজনীতিতেই তখন (ইং ১৭৬৫এর সময় থেকে) উদ্যোগী নতুন বণিক্ ও অঙ্কুরায়িত শিল্প-মালিকদের দ্বন্দ্ব ঘনিয়ে উঠেছে। তাতে হুইগ্-দল হয়েছে 'অবাধবাণিজ্য'-কামী উদ্যোগীদের মুখপাত্র. আর টোরি-দল হয়েছে 'একচেটিয়া বাণিজ্যাধিকারী' কোম্পানির আশ্রয়—সেদিনে ইংলণ্ডের রাজা-উজীর থেকে পার্লামেণ্টের সদস্যদের মতামত প্রায় প্রকাশ্যেই কোম্পানির ঘুষেই নিয়ন্ত্রিত হত—মাদার অব পার্লামেণ্টের এ রূপ স্মরণীয়। তবু ইং ১৭৭৩এর 'রেগুলেশন অ্যাক্ট' ও ১৭৮৪র পিট্-এর 'ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট' ভারত-শাসনে কোম্পানির অধিকার অনেকটা খর্ব করে ব্রিটিশ-রাজের অধিকার স্থাপিত করে। তাতে পুরনো বণিক্‌দের রাজনৈতিক ক্ষমতা মূলতঃ হ্রাস পেলেও 'একচেটিয়া বাণিজ্যের' অধিকার রইল। ১৮১৩তে কোম্পানির সনদ পরিবর্তনের কালে ভারতবর্ষে কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার লোপ করা হয় (চীনে তা' তখনো থাকে)। ব্রিটেনে তখন শিল্পবিপ্লব পুরো দমে চলতে শুরু করেছে। ১৮১৩র পরে কার্যতঃ তাই হুইগ্‌দল ও ব্রিটিশ 'শিল্প-পুঁজি'রই ক্ষমতা ভারত-শাসনে প্রবল হয়ে ওঠে। অবশ্য, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 'একচেটিয়া বণিকের' পরিবর্তে 'শিল্প-পতিদের' প্রভাব স্থাপিত হয় ১৮৩৩এ—প্রায় বিশ বৎসরে। তখন কোম্পানির সনদ আবার পরিবর্তিত হয়-তাতে চীনের বাণিজ্যেও আর কোম্পানির অধিকার রইল না। মেকলে তখন হুইগ্‌নীতির মুখপাত্র ছিলেন। ইং ১৮১৩তে যখন সনদ আবার পরিবর্তিত হয় তখন ব্রিটিশ শিল্প-পুঁজি ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত। এদেশে, তখন বাঙালী শিক্ষিত নেতারা রাজনৈতিক আন্দোলন ও দাবী উত্থাপন করেছিলেন। তাতে হুইগ্ রাজনীতিতে বিশ্বাস সুস্পষ্ট। দেশে তখন প্রায় দু'পুরুষ ধরে 'লিবারল্ এডুকেশন' চলছে।

(৪) **নূতন রাজনৈতিক চেতনা :** কোম্পানির শাসনের আভ্যন্তরীণ বিবর্তনের দিক থেকে এই সনদ পরিবর্তনের পর্যায়গুলিও তাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য—বিশেষ করে, ইং ১৮১৩র পর্যায়ের, ইং ১৮৩৩এর পর্যায়ের এবং শেষে ১৮৫৩এর পর্যায়ের পরিবর্তন। শাসক ও প্রশাসনের ব্যবস্থা ছাড়াও শিক্ষা ও সামাজিক ব্যাপারেও ইং ১৮১৩ থেকে ১৮৫৩এর মধ্যে সুস্পষ্ট ব্যবস্থা হয়ে যায়। যেমন, ইং ১৮১৩তে প্রথম শিক্ষা ব্যাপারে বার্ষিক ১ লক্ষ টাকা ব্যয় করার সিদ্ধান্ত হয়। খ্রীষ্টান মিশনারিরা ভারতে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের অনুমতি ইং ১৭৯৩তেও পায় নি, এবার (ইং ১৮১৩তে) তারাও প্রথম অনুমতি লাভ করল। তাতে তারাও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান খোলবার সুযোগ পেল। ১৮৩৩এর সনদে ইংরেজরা এদেশে জমির স্বত্বস্বামিত্ব অর্জন করবার অধিকার পেল। তাতে ইংরেজরা জমির মালিক হয়ে নীলের চাষ দ্রুত বাড়াতে লাগল। প্রথম দিকে কৃষক বা জমিদার কারও নীল চাষে আপত্তি হয় নি ; বরং নূতন cash crop বা 'নগদা ফসল' উৎপাদন দেশের পক্ষে লাভজনক হয়েছে। ইং ১৮৫৩-তে সনদের আবার পরিবর্তন হয়—তখন বাঙলার শিক্ষিত শ্রেণী নানা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার দাবী করে। তারই ফলে শিক্ষাবিষয়ক প্রস্তাব—উড্-এর ডেস্‌প্যাচ্ (১৮৫৪)—প্রণীত হয়। ব্রিটিশ ভারতের সরকারী শিক্ষানীতির তা' ভিত্তিস্বরূপ। তখন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনও স্থির হল। সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসেও এই 'লিবারল্' শিক্ষাবিষয়ক ও সামাজিক ব্যবস্থাসমূহ স্মরণীয় জিনিস।

অবশ্য ব্রিটিশের রাজনৈতিক-সামাজিক বিবর্তন এবং ভারত-শাসনে 'এক-চেটিয়া বণিকের' স্থলে 'শিল্প-পতিদের' ক্রমাধিকার স্থাপন নিয়ে ইং ১৮০০এর পূর্বে ভারতীয়েরা কেউ মাথা ঘামান নি। ১৮১৩র সনদ পরিবর্তনের কালেও ভারতীয়দের কথা শোনা যায় না—বাঙালী সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তখন শিল্পবিপ্লবের ফলে বিপর্যস্ত। কিন্তু ইং ১৮৩৩এর কালে দেখতে পাই—সনদ পরিবর্তনের ব্যাপারে বাঙালী প্রধানরা নিজেদের বক্তব্য উপস্থিত করতে ব্যগ্র। অবশ্য তার পূর্বেই মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা, সতীদাহ প্রভৃতি ব্যাপারে বাঙালী শিক্ষিত সমাজ অ্যাজিটেশন' করতে শিখেছে। বলা বাহুল্য, তা' নূতন রাজনৈতিক চেতনারই প্রকাশ। এই রাজনৈতিক চেতনারও প্রাথমিক উন্মেষ ১৮১৭এর দিকেই ঘটে থাকবে—হিন্দু কলেজ স্থাপন, নানা পুস্তিকা প্রচার ও সংবাদপত্র প্রকাশের আগ্রহে তারই লক্ষণ দেখতে পাই। 'লিবারল্ এজুকেশন্'

তখনি প্রবর্তিত হচ্ছিল। প্রাচীনপন্থী আর প্রগতিপন্থী দু রকম দৃষ্টিই তখন ছিল। কিন্তু ইং ১৮৫৩ সনে সনদ পরিবর্তনের সময়ে বাঙালীরা অনেকাংশে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া অ্যাসোশিয়েশন'-এর আওতায় (সম্পাদক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর)। তখন তারা শুধু ভারতীয় শিল্পে সরকারের উৎসাহদান, আর রাজকর্মে ভারতীয়দের অধিকতর নিয়োগই দাবী করে নি— ভারতের জন্য ভারতীয় সংখ্যাধিক্যে আইন সভাও দাবী করে বসল ; অর্থাৎ ইং ১৮৩৩ ১৮৫৩, এই বিশ বৎসরে তাদের রাজনৈতিক চেতনা রীতিমত দানা বেঁধে উঠেছিল।

শিক্ষিত শ্রেণীর এই রাজনৈতিক বোধ (বা পাব্লিক্ লাইফ্-এর উন্মেষ), এ একটা মৌলিক ভাব-বিপর্যয়। পূর্ব যুগের সামন্ত স্বার্থের রাজনৈতিক বোধের থেকে এ যে স্বতন্ত্র জাতের তা বোঝা দরকার। অথচ উৎপীড়িত জনসমাজের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ-প্রতিরোধের সঙ্গেও শিক্ষিতদের এই রাজনৈতিক চেতনার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল না। ১৮০০ থেকে ১৮৫৭ পর্যন্ত ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সামন্ত-স্বার্থের বিদ্রোহ ও জন-স্বার্থের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ যা ঘটেছে, বাঙালী শিক্ষিতরা তা থেকে মোটামুটি দূরেই ছিলেন।

(৫) **শোষিতের প্রতিরোধ :** কোম্পানির শাসনের বিরুদ্ধে বাঙলার প্রথম যুগের বিদ্রোহ প্রভৃতি অবশ্য ইং ১৮০০-এর পূর্বেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। ১৭৯৩-র চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে যেমন ইংরেজ শাসনের উপর নির্ভরশীল একদল নূতন জমিদার সৃষ্টির ব্যবস্থা হল তেমনি ভূমি-বঞ্চিত কিছু প্রাচীন জমিদার-ইজারাদারও তাতে ক্ষুব্ধ থেকে গেল। ৬০ বৎসর পরে ১৮৫৭এর ভারতীয় বিদ্রোহের কালে বাঙলায় এই পুরাতন সামন্তগোষ্ঠীর বিদ্রোহের শক্তি বিশেষ ছিল না। বরং ১৮১৭-১৮৫৭ এই ৪০ বৎসরে বাঙালী শিক্ষিত মধ্যবিত্তই তখন বাঙলায় জাগ্রত শক্তি। 'উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে অর্থাৎ বর্তমান উত্তরপ্রদেশে পূর্ব যুগের সামন্ত অভিজাতরা কিন্তু ১৮৫৭র কালে একেবারে বলহীন হয়ে পড়ে নি। বাঙলার বাইরে ইং ১৮০০র পরেকার এরূপ একটি রাজনৈতিক ঘটনা হচ্ছে কটকের পাইক বিদ্রোহ (১৮১৭-১৮) ও বারাণসীর জনসাধারণের প্রতিবাদ আবেদন (১৮১০-১৮১১) ; এ দুটি বাঙলার দুয়ারের ঘটনা (অনু'রূপ আন্দোলনের সংবাদ অধ্যাপক শশিভূষণ চৌধুরীর Civil Disturbances in India, 1765-1857-এ দ্রষ্টব্য)। বাঙলার ঘরের মধ্যে এ-ধরনের প্রধান

প্রধান ঘটনা হল : ওহাবী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত বারাসাত অঞ্চলে তিতু মিঞার বিদ্রোহ (১৮৩১) ; ফরিদপুর, নদীয়া, ২৪-পরগণায় অশান্তি, বিশেষ করে 'ফরাজী'দের অভ্যুত্থান (১৮৩৮-১৮৪৭) ; ছোটনাগপুরের কোল-বিদ্রোহ (১৮৩১-৩২) ; মানভূমের ভূমিজ গঙ্গনারায়ণের হাঙ্গামা (১৮৩২) ; শ্রীহট্টের উত্তরে খাশিয়াদের অভ্যুত্থান (১৮২৯-১৮৩৩) ; ময়মনসিংহের শেরপুরের পাগলপন্থীদের গোলমাল (১৮৩৩) ; আর সর্বশেষে সিপাহী যুদ্ধের পূর্বক্ষণে সাঁওতাল অভ্যুত্থান (ইং ১৮৫৫-১৮৫৬)। এ সব বিদ্রোহের প্রায় প্রত্যেকটির পিছনেই নানা সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণ ছিল। ওহাবী বিদ্রোহেও যে তা' না ছিল, এমন নয়। কিন্তু বিশেষ করে মুসলমানদের ধর্মগত গোঁড়ামিই ছিল তার প্রাণ, আর অন্যতম কারণ মুসলমানদের রাজনৈতিক ক্ষমতাচ্যুতি। অন্যান্য বিদ্রোহের প্রধান প্রধান কারণ কোম্পানির ক্রমবর্ধিত শোষণ ও উৎপীড়ন, ব্রিটিশ শিল্পবিপ্লবের ফলে জনসাধারণের অর্থনৈতিক বিপর্যয়, রাজ-কর্মচারী এবং কোম্পানির অনুগত গোমস্তা জমিদার মহাজন ও দালাল শ্রেণীর নানাবিধ শোষণ ও উৎপাত ;—এ সব মিলে প্রজা-সাধারণের জীবন দুর্বহ করে তুলেছিল। এক-একবার তাই অপেক্ষাকৃত সরল ও পশ্চাৎপদ লোকগোষ্ঠী পূর্বাপর বিবেচনায় অসমর্থ হয়ে আপনা থেকেই বিদ্রোহ করে বসত। কিন্তু বিদ্রোহ সার্থক করবার মত সংগঠন ও বল কারও ছিল না। সাধারণের ছড়ায়, গানে তাদের কথা লোকে বলেছে—কখনো প্রশংসা করে, কখনো নিন্দা করে। কিন্তু শিক্ষিতরা তা এতই নিষ্ফল উন্মত্ততা বলে মনে করেছে যে, সাহিত্যে এসব বিদ্রোহের কথা লেখার প্রেরণা পায় নি। অবশ্য তখনও সাহিত্য অর্থ প্রধানতঃ শিক্ষাবিষয়ক পুস্তক রচনা বা সংবাদপত্র লেখা। রাজনৈতিক প্রতিরোধ অপেক্ষাও সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংঘাতেই এ ধরনের সাহিত্যের তখন উদ্বোধন হয়।

॥ ২ ॥ সামাজিক সংঘাত

'স্বদেশী সমাজ' : এই সামাজিক ঘাত-প্রতিঘাতে বাঙালীর রাজনৈতিক প্রচেষ্টায় প্রকাশ দেখা যায় ইং ১৮৪২এর দিকে। অবশ্য তার সংঘাত আরম্ভ হয়েছিল অনেক পূর্বেই। এক অর্থে বলা যায় পলাশী থেকেই তার সূচনা।

মূল কথাটা স্মরণে রাখা প্রয়োজন—রাজা-রাজ্যের পতন-অভ্যুদয়ে ভারতীয় পল্লীসমাজের যথার্থ বিপর্যয় ঘটত না—তার নিজস্ব গতিধারা তাতে সময় সময়

কতকটা ব্যাহত বা কতকটা পুষ্ট হত মাত্র। পল্লীসমাজ (village community) ও পল্লীর স্বয়ংসম্পূর্ণ আর্থিক জীবন (self-sufficient village economy), জাতি-ধর্মের (caste-class) সামাজিক ব্যবস্থা, জন্মান্তর ও কর্মবাদে অবিচলিত আস্থা (ideology)—এই তিনটি বিশিষ্ট জিনিস ভারতীয় জীবনধারাকে একটা নির্দিষ্ট খাতে নিস্তরঙ্গ রীতিতে বইয়ে নিয়ে যেত।

ভারতীয় সামন্ত-নীতি পাশ্চাত্ত্য সামন্তদের ম্যানোরিয়াল সিস্টেমের (manorial system) থেকে স্বতন্ত্র (এ বিষয়ে শেল্‌ভেংকরের ইংরেজী বই Problem of India দ্রষ্টব্য)। আমাদের সামন্ত অধিরাজ ও তার অধীন সামন্ত রাজারা রাজ্যরক্ষা ও প্রজাপালনের জন্য পল্লীর প্রজাসাধারণের কাছ থেকে ফসলের হারে সামান্য কিছু কর বা রাজস্ব গ্রহণ করতেন, আর রাজশক্তি সেচের বড়-বড় খাল, রাজপথ প্রভৃতি নির্মাণ ও রক্ষা করত। রাজাশ্রয়ে শ্রেষ্ঠী শিল্পী ও রাজকর্মচারীদের নিয়ে বর্ধিত হত ভারতের পৌর-সভ্যতা। কিন্তু পল্লী-সমাজের স্বাতন্ত্র্য ও আত্মকর্তৃত্বে এই রাজশক্তি হাত দিতেন না। এরূপ সমাজের একটা আদর্শ রূপ রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'স্বদেশী সমাজে' কল্পনা করেছেন, আর তাঁরও পূর্বে কার্ল মার্কস্ অদ্ভুত নিপুণতায় তার বাস্তব রূপ বর্ণনা করেছেন (দ্রষ্টব্য 'কাপিটাল', ১ম খণ্ড)। এ সমাজের গতিবিমুখতা, নিরুদ্যম, প্রকৃতিবশ্যতা, মানব মহিমা সম্বন্ধে নিশ্চেতনতা ও মানুষের আত্মাবমাননার কথাও কঠিন ভাষাতেই সেই সঙ্গে মার্কস্ বর্ণনা করেছেন ('দি ব্রিটিশ রুল ইন ইণ্ডিয়া' শিরোনামায় ১৮৫৩তে 'নিউ ইয়র্ক ডেলি ট্রিবিউনে' লেখা পত্রাদি দ্রষ্টব্য)। তুর্ক বিজয়েও সেই মূল ভারতীয় সমাজ-পদ্ধতি পরিবর্তিত হয় নি। কিন্তু পলাশীর পরে সেই সমাজের পরিবর্তন বাঙলায় অনিবার্য হয়ে উঠল।

বিপ্লব ও বিপর্যয়: ইংরেজ কোম্পানি মুঘল-পাঠান কেন, পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী প্রভৃতি শক্তির অপেক্ষাও উন্নততর সামাজিক শক্তির বাহক, সে এল ব্রিটেনের ধনিক-বিপ্লবের উত্তরাধিকার নিয়ে। বাঙলায় বা ভারতবর্ষে অবশ্য ইংরেজরা ধনিক-বিপ্লব সঞ্চারিত করতে এল না, এল বরং নিজেদের ধনিক-শোষণ ও ধনিক-শাসন বিস্তারিত করতে। তাই আমাদের পল্লী সমাজের স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতিকে ধ্বংস না করে তার উপায় নেই, আর সেই শোষণের দায়েই এই শোষিত সমাজকে শাসনযন্ত্রের নাগপাশে বেঁধে স্বাভাবিক বিকাশ থেকে বঞ্চিত না রাখলেও তার চলে না। বাঙালী সমাজে ও ভারতীয় সমাজে

তাই ইংরেজ রাজত্বে গতানুগতিক সামন্ততন্ত্রের ব্যবস্থা ভেঙে যেতে লাগল, কিন্তু ধনিকতন্ত্রী জীবন্-যাত্রাও গড়ে উঠতে পারল না। বরং সেই শূন্যতার মাঝখানে ইংরেজ শাসকরা দাঁড় করিয়ে রাখল একটা 'আধা-সামন্ততান্ত্রিক শোষণ ব্যবস্থা' —দেশী রাজা জমিদার মহাজন প্রভৃতি ইংরেজ শাসনের তাঁবেদার, দায়িত্বহীন আমলাতন্ত্র ও ব্রিটিশ ধনিক-ব্যবস্থার ক্রমবর্ধিত শোষণ,—এই হল ১৯৪৭ পর্যন্ত ইংরেজ রাজত্বের শাসন-ব্যবস্থার রূপ—ইংরেজ আমলের এই সাধারণ সত্য বিস্মৃত হবার নয়। ইংরেজ শাসন চেপে বসলে যা ঘটবার কথা তা সমাজ-বিপ্লব নয়, তার নাম সমাজ-বিপর্যয়। যাকে সমাজ বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় 'কলোনিয়্যাল সিস্টেম বা 'ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা', এ শাসন তা' ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু ইংরেজের অভীষ্ট না হলেও ইংরেজের এ ব্যবস্থাই ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের অবসান ঘটাল ; আর সেই শ্রীহীন অবস্থার মধ্যে ইংরেজের বাহিত বুর্জোয়া ভাবধারাও সমাজের হত-চেতন সৃষ্টিশক্তিকে একটু চঞ্চল, সচেতন করে তুলল। এই বাস্তব বিপর্যয়ে পুষ্ট হল নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং এই ভাব-বিপর্যয়ে পুষ্ট হল সে শ্রেণীর অন্তর্নিহিত সৃষ্টিশক্তি। অবশ্য সেই সৃষ্টিশক্তিও ঔপনিবেশিক ব্যবস্থায়ই আবার বাস্তব ক্ষেত্রে ব্যাহত হল। তবু নানা ঋজুবঙ্কিম পথে তা স্ফূর্তও হল তীব্র মানস-প্রচেষ্টায়।

১৮০০ থেকে এই সমাজ-বিপর্যয়ের ও সামাজিক সংঘাতের আঘাতে বাঙালী জীবনে সেই 'দিন বদলের পালা এল। এল—সমাজের মধ্য থেকে স্বাভাবিক নিয়মে নয়—সমাজের বাইরে থেকে ধনিক-শোষণের তাড়নায়। এল ওপরতলার বিদেশীয় ধনিক-শাসনযন্ত্রের চাপে, নিচের তলায় জীবন যাত্রার বিকাশের ফলে নয়। ইং ১৮১৭র কাছাকাছি আমরা দেখি বাঙালীর এ বোধের উন্মেষ হয়েছে, ১৮৫৭র কাছে পৌছতে পৌছতে দেখি তা' নানা সামাজিক সাংস্কৃতিক আয়োজনে-ব্যবস্থায়, অনুষ্ঠানে-প্রতিষ্ঠানে রূপ লাভ করতে সচেষ্ট।

সামাজিক বিপর্যয় সত্বেও, ইংরেজ আপনার অনিচ্ছাতেও এভাবে 'এশিয়ার প্রথম সমাজ-বিপ্লবের অচেতন অস্ত্র' হয়ে গিয়েছে। হয়ত বলা উচিত, সেই বিপ্লবের 'সচেতন বাধা'ও হয়েছে। একটা ছোট কথা এই প্রসঙ্গেই তাই উল্লেখ করা উচিত। ভারতের সামন্ততন্ত্রে—সেই স্বতন্ত্র পল্লী-সমাজ ও কর-সন্তুষ্ট সামন্ত শাসনে, ভাঙন ধরেছিল কিন্তু অনেক দিন থেকেই আর আপনা থেকেই। এমন কি, খিলজী ও তুঘলক সম্রাটরাও (ইং ১২৯০-১৩৯৮)

লাখেরাজ বাজেয়াপ্ত করেছিলেন, টাকায় খাজনা আদায় করতে চেয়েছিলেন, জায়গীরদারদের বদলী করে জায়গীরদারী বিলোপের চেষ্টা করেছিলেন (কেম্ব্রিজ হিস্ট্রি অব ইণ্ডিয়া, ৩য় খণ্ডে এ-সবের উল্লেখ আছে)। অবশ্য তা' দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। শের শাহ (ইং ১৫৪২-১৫৪৫) পথঘাট তৈরী করে বাণিজ্য প্রসারের ব্যবস্থা করেন আর সরাসরি গ্রামের রায়ত-চাষীর সঙ্গেই রাজস্বের বন্দোবস্ত করে পল্লীকেন্দ্রিক সমাজকে ও জায়গীরদারীকে দুর্বল করেন। আকবর-জাহাঙ্গীরের আমলে শের শাহ্-এর এ প্রয়াসকেই তোডর মল্ল রাজস্ব ব্যবস্থার ভিত্তি করেছিলেন। তাঁরা টাকায় খাজনা দেওয়াও প্রচলিত নিয়ম করে তুলতে চান। তার ফলে টাকার প্রচলন বা 'মানি ইকোনমি'ও কিছুটা প্রবর্তিত হবার কথা—মহাজনী সাহুকারীও দেখা দেয়। সাজাহান প্রভৃতি নীল চাষ করতেন, নিজেরাও ব্যবসায় করতেন, অর্থাৎ দেশে বণিক্ শক্তির গুরুত্ব তখন থেকেই বাড়ছিল বলে মনে হয়। তাছাড়া, মধ্য যুগের সাধুসন্তদের প্রচারে জাতি-বন্ধন শিথিল হওয়ায় অধ্যাত্মক্ষেত্রে ব্যক্তিরও মুক্তির পথ হয়েছিল। (এসম্বন্ধে আগ্রহ থাকলে রামকৃষ্ণ মুখার্জির ইংরেজীতে লেখা ১৯৫৫তে বার্লিন থেকে প্রকাশিত The Rise and Fall of the East India Company গ্রন্থে সংগৃহীত তথ্যসমূহ দ্রষ্টব্য।) অর্থাৎ সামন্ত-সমাজব্যবস্থা বাস্তব ও মানসিক দুই ক্ষেত্রেই ক্রমে ভাঙছিল; বাঙলা সাহিত্যে তার প্রমাণ ভারতচন্দ্রের 'অন্নদা-মঙ্গল', রামানন্দ ঘোষ ও জগৎরাম বাঁড়ুজ্জে। কিন্তু দূর দূরান্তরে বিচ্ছিন্ন সমাজে যা' শিকড় গেড়ে আছে, তাকে উন্মূলিত করার মত শক্তি মুঘল-সাম্রাজ্যের শেষ দিকে দেশের অভ্যন্তরে জন্মাবার পূর্বেই এসে গেল পাশ্চাত্য বণিকেরা। তাদের মধ্যে একমাত্র ইংরেজই ধনিক রাষ্ট্রের দূত আর ধনিক-তন্ত্রের অগ্রদূত। তারাই ক্রমে এ দেশেও প্রাধান্য লাভ করল, পলাশীতে জিতল; আর যা' পাঠান ও মুঘল সম্রাটরা পারেন নি তা' ক্রমে সম্পন্ন করল—নিজেদের শোষণ স্বার্থে যেভাবে যতটা দরকার। মনে হয় না কি—ভারতীয় সমাজ নিজের শক্তিতেও সামন্ত-তন্ত্র শেষ করত, কিন্তু তার সময় লাগত বেশি; ইংরেজ বণিক্ সেই ধ্বংসের কাজটা দ্রুতই করেছে। অবশ্য স্বাভাবিক নিয়মে যা' সম্পন্ন করতে আমাদের সময় লাগত তার স্থলে আমরা ধনিক-ব্যবস্থাও স্বাভাবিক ভাবে গড়ে তুলতে পারতাম। তার পরিবর্তে সবই চলল অস্বাভাবিক পথে—ইংরেজ বণিকের রাজ্যলাভে তাই সেই গঠনের সুযোগ আমরা পেলাম না, ধনিক-ব্যবস্থা প্রায় দু'শত বৎসর ঠেকে রইল,—

সামন্ত-ব্যবস্থা ভেঙে গেলেও লুপ্ত হতে পারল না। আমরা ঠেকে রইলাম ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার বালুচরে—ন যযৌ ন তস্থৌ।

অবশ্য এই সব সামাজিক ইতিহাসের তথ্য ও তত্ত্ব আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের আলোচনায় গৌণ বিষয়। কিন্তু যে সমাজ-বিপর্যয়ের আবর্তে ইংরেজ-শাসনে আমরা, আমাদের সাহিত্য, আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের জীবন শুদ্ধ পাক খেতে লাগলাম তার অর্থ সম্পূর্ণ উপলব্ধি করতে হলে ভারতীয় সামন্ত-তন্ত্রের বাস্তব ও সামাজিক বৈশিষ্ট্য, আমাদের সমাজ-শক্তির ব্যাহত বিকাশের কথাও মনে রাখা প্রয়োজন। [এ জন্যই ইংরেজিতে লেখা রমেশচন্দ্র দত্তের The Economic History of India দু-খণ্ড, Under Early British Rule ও Under Victoria, রজনী পামে দত্তের India Today ও কার্ল মার্কসের ভারতবিষয়ক লেখার ইংরেজি সংকলন Marx on India প্রভৃতি গ্রন্থের সঙ্গে পরিচয় না রাখলে বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসের ছাত্রেরও চলে না। অধ্যাপক নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহের নব-প্রকাশিত Economic History of India, from Plassey to the Permanent Settlement (প্রকাশিত —1965)-এ আরও মূল্যবান তথ্য সংগৃহীত হয়েছে।]

(১) **বাস্তব-বিপর্যয়:** ইতিহাসের যে নিয়মে ইংরেজ বণিক্ রাজ্যলাভ করল সে নিয়মেই অন্যান্য কতকগুলো বিকাশও অনিবার্য হয়ে পড়ে; এবং তার ফলে বাঙলার ও ভারতবর্ষের জীবনে বাস্তব-বিপর্যয় ও ভাব-বিপর্যয় দুই-ই সংক্রামিত হয়। বাঙলাতেই প্রথমত তা' আরম্ভ হয়, এবং বাঙলাতেই তা' বিস্তারলাভ করে। কৃষকের সর্বনাশ, ভূ-স্বামীর উৎখাত, কৃষির পতনের সঙ্গে সঙ্গে তন্তুবায়দের বৃত্তিধ্বংস ও পল্লীশিল্পের সর্বনাশ বাঙলাতেই আরম্ভ হয়, এবং বাঙলাতেই তা' ব্যাপক ও গভীর সমস্যার সৃষ্টি করে। ইং ১৮০০ সালের পূর্বেই তার স্বরূপ অবশ্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। পল্লীসমাজের প্রধান অবলম্বন কৃষি ও কৃষি-নির্ভর পল্লীশিল্প। কিন্তু কোম্পানির রাজস্বের পীড়নে কৃষক ও ভূস্বামী সর্বস্বান্ত হল। কুঠির কর্মচারী ও গোমস্তার অত্যাচারে তন্তুশিল্পী দাদন-দেওয়া দাসে পরিণত হয়, পল্লীশিল্প দমিত হয়। কোম্পানি ও তার কর্মচারীদের দৌরাত্ম্যে মীরকাশেমের পূর্বেই অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য থেকে দেশের সওদাগর বণিকেরা বিতাড়িত হয়। মীরকাশেমের সময়েই জগৎশেঠদের প্রভাব খর্বিত হতে থাকে ও হেস্টিংসের সরকারী 'জেনারেল কোম্পানি'র দেশী

দালালদের নাম শোনা যায়। এসব প্রত্যক্ষ অবস্থা। পরোক্ষেও ব্রিটেনে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপাদেই আরম্ভ হয় যন্ত্রের উদ্ভাবনা ও শিল্পবিপ্লবের সূচনা। এ সব তথ্য বরাবর মনে না রাখলে সমাজ-চিত্রটা যথার্থরূপে স্পষ্ট হয়ে ওঠে না। সুখপাঠ্য না হলেও আমরা এখানে এই সমাজ-চিত্রের অতি প্রয়োজনীয় দিক ক'টি সংক্ষেপে উল্লেখ করছি।

প্রথম কথা: সর্বশ্রেণীর সর্বনাশ: যে সমাজের বুকে বাঙলা সাহিত্য ও বাঙলা সংস্কৃতি ভূমিষ্ঠ ও পালিত হত সে সমাজের ভাঙন দ্রুত এগিয়ে যায়। প্রজা সাধারণ মরে, পুরনো অভিজাতরা পঙ্গু হয়। শিল্পীরা মরে, বণিক্‌রা বিলুপ্ত হয়। কারণ, রাজস্ব বাড়ে—ইং ১৭৬৫-র ১'৪৭ লক্ষ (এক লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার) টাকার রাজস্ব ১৭৯২ সনে দাঁড়ায় ২'১৮ লক্ষে (দুই লক্ষ আঠারো হাজারে)। লুণ্ঠনের বোঝাও বাড়ে। হিসাব করলে দেখা যায় নবাবের যা' ভূমি-রাজস্ব ছিল, কোম্পানির কর্মচারীদের লুণ্ঠন তার চতুর্গুণ পরিমাণ হত। এ টাকার অবশ্য এক কড়াও দেশে থাকল না, বিদেশে গেল। পূর্ব যুগে নবাব-বাদশাহেরা উৎপীড়ন করলেও দেশেই তাঁদের সেই অর্থ ব্যয়িত হত। কিন্তু এখন দেশের ধনসম্পদ গেল সমুদ্রপারে, বিলাতের পকেটে। দেশবাসীর ঋণের ভারও সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে। কোম্পানির যুদ্ধবিগ্রহের সমস্ত খরচাই শাসকেরা চাপাতে থাকে প্রজার স্কন্ধে। ইং ১৮১৩ থেকে 'হোম চার্জ' যোগানো হল ভারতের নিয়ম। যে সব সামন্ত ও অভিজাত গোষ্ঠী সমাজের শিল্পী ও গুণীদের প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে পোষণ করত ১৭৬৫র পরে তারা অনেকেই সম্পত্তি হারায়। অন্যদিকে কোম্পানি ও তার সাহেব কর্মচারী ও দেশী গোমস্তাদের অত্যাচারে তন্তুবায়দের হাড় কালো হতে থাকে। তন্তুবায়েরা বাধ্য হয়ে বিদেশী বণিকের দাদন নিয়ে সস্তায় কোম্পানির দাস হয়ে পড়ে। বহির্বাণিজ্য ও অন্তর্বাণিজ্য হারিয়ে সওদাগর বণিকেরা কোম্পানির দালালী নিতে বাধ্য হয়। গোটা ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের একটা খামারে পরিণত হয়, ভারতবাসী হয় ইংরেজ মুনিবের ক্ষেত্রদাস। ঢাকা, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি শহরগুলোর পতন ঘটে—অবশ্য তার জায়গায় কলকাতার শ্রীবৃদ্ধি হয়। ঢাকায় পূর্বে বাসিন্দা ছিল দেড় লক্ষ; কিন্তু ইং ১৮৪০এ দেখা যায় মাত্র ৩০।৪০ হাজার লোক ঢাকার অধিবাসী। ঢাকা থেকে ইং ১৭৮৭তেও ইংলণ্ডে ৩ লক্ষ টাকার মসলিন রপ্তানী হত। ২০ বছর পরে, ইং ১৮০৭এ, আর

মসলিন রপ্তানীর চিহ্নও দেখা যায় না। এ থেকে সহজেই বোঝা যায় পল্লীসমাজে কৃষক, জমিদার বা বণিক্ সওদাগর কারও আর সাধ্য রইল না যে, কোনরূপ সংস্কৃতি বা সাহিত্যের পোষকতা করবে। নতুন ভাগ্যবান্‌দের শহর কলকাতাতেই সেরূপ আসর গড়ে ওঠা সম্ভব—অন্য কোথাও নয় (দ্রষ্টব্য: Hunter-এর Annals of Rural Bengal—"from the year 1770 the ruin of two-thirds of the old aristocracy of Lower Bengal dates")।

দ্বিতীয় কথা: শিল্পবিপ্লবের বাজার বিস্তার—যখন আমাদের পল্লী-সমাজ এরূপে পর্যুদস্ত তখনি ইংলণ্ডের ভূমিতে শিল্পবিপ্লব জন্ম নিচ্ছে। উদ্যোগী বণিকদের তাগিদে যন্ত্রোদ্ভাবনা ইং ১৭৬০ থেকে ইংলণ্ডে অদ্ভুত গতিতে বৃদ্ধি পায়। বস্ত্রশিল্পই ছিল চিরদিন ভারতের প্রধান শিল্প আর যন্ত্র আবিষ্কারের ফলে তাতেই প্রথম বিপ্লব ঘটল। প্রথম আবিষ্কার, হারগ্রিব্‌সের 'স্পিনিং জেনি', ইং ১৭৬৪এ। তারপর প্রধান আবিষ্কার ইং ১৭৬৫তে ওয়াট্‌সের স্টিম এঞ্জিন, ১৭৮৫তে কার্টরাইটের বাষ্পচালিত তাঁত। এসবে বস্ত্রোৎপাদন বাড়বার কথা—ভারত থেকে ইংলণ্ডে বিলাস-বস্ত্র ছাড়া অন্যরূপ বস্ত্রের রপ্তানী কমা তাই অনিবার্য। বিশেষতঃ ১৭৭৬ থেকে মার্কিন উপনিবেশ বিদ্রোহ করায় ভারতই ব্রিটিশ শিল্পের প্রধান 'বাজার' হল। অর্থাৎ ভারতবর্ষ (প্রধানতঃ বাংলা) বিলাতের পক্ষে কাঁচামালের প্রধান যোগানদার ও বিলাতের উৎপন্ন পণ্যের ক্রেতা হবার কথা। বিলাতের সেই কল-কারখানার পুঁজিও অবশ্য আসছিল কোম্পানি ও তার কর্মচারীদের বাংলা-লুটের টাকা থেকে; এ টাকা না হলে ইংলণ্ডের শিল্পবিপ্লব সহজসাধ্য হত না। শিল্প বাণিজ্যের এই নূতন 'ধনিক-পুঁজি'কে অবশ্য কোম্পানির 'বণিক্-পুঁজি' সহজে ভারতের 'বাজার' ছেড়ে দিতে চায় নি—'অবাধ বাণিজ্য' ও 'একচেটিয়া বাণিজ্যের' সে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। এর পরে ১৮০০র কাছাকাছি নেপোলিয়নের ইউরোপ অধিকারে ইংলণ্ডের পণ্যোৎপাদন বাড়ে, ভারতের বাজারে ধনিক-পুঁজির আধিপত্যও সুনিশ্চিত হয়ে যায়.—এসব কথা আবার উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। সাধারণ ভাবে শুধু এই ক'টি কথা এ প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা প্রয়োজন:—

এক, ইং ১৭৬০ থেকে ১৮৩০ পর্যন্ত কালটাকে বৈজ্ঞানিক বিবর্তনের ইতিহাসে বলা হয় 'আবিষ্কারের প্রথম যুগ' (দ্রষ্টব্য বার্নাল—Science in

History)। যন্ত্রপাতি যেমন আবিষ্কার হয় অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিও তেমনি পরিষ্কার হতে থাকে (অ্যাডাম স্মিথের Wealth of Nations প্রকাশিত হয় ইং ১৭৬৫তে)। বুর্জোয়া চিন্তার জগতেও আশা ও পরিচ্ছন্নতা দেখা দেয় (১৭৮৯র ফরাসী বিপ্লবের কাল থেকে)।

দুই, ইং ১৮০০র দিকে দেখি এসব বাস্তব ও মানসিক পরিবর্তনের স্রোত ইংলণ্ডে প্রবল হয়ে উঠেছে, ভারতে তার ঢেউ ক্রমে ক্রমে একটু একটু লাগছিল। ১৮১৫র কাছাকাছি ইংলণ্ডে এই শিল্পবিপ্লবের ভরা জোয়ার। (ব্রুকস্ অ্যাডামস্ The Law of Civilisation and Decay, পামে দত্ত India Today, page 95-এ উদ্ধৃত)। ইং ১৮১৩তে কোম্পানির চার্টার পরিবর্তনে ভারতেও শিল্প-পুঁজির অধিকার কতকটা স্বীকৃত হয়—তখনো ভারতের পণ্য উৎকৃষ্ট বলে পৃথিবীতে গণ্য। কিন্তু এ দেশের শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এই সময় (১৮১৩) থেকে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থাও পুরোপুরি কায়েম হতে থাকে। পূর্বেই, একদিকে যেমন ব্রিটিশ কল কারখানার মালের জন্য বিনা শুল্কে বাজার খুলে দেওয়া হয়েছিল, অন্যদিকে তেমনি ভারতের পণ্যের উপর ট্যাক্স কেবলি বাড়ানো হয়েছিল। তা সত্ত্বেও ১৮১৩ পর্যন্ত বিলাতের বাজারে ভারতীয় বস্ত্রই ছিল সস্তা। তাই তখন শতকরা ৭০।৮০ হারে ভারতীয় বস্ত্রের উপর শুল্ক বসল (মিলের 'History of British India'য় উইলসনের কঠিন মন্তব্য দ্রষ্টব্য)। তারপর ১৮৩৩ পর্যন্ত যে ভাবে বিলাতী বস্ত্রের আমদানী বাড়ল আর যে ভাবে ভারতীয় বস্ত্রের রপ্তানী কমল, যে ভাবে তামা সীসা লোহা কাচ ও মাটির বাসন শতকরা ৪০০৲ টাকা হারে রপ্তানী শুল্ক বসিয়ে বন্ধ করা হল আর ব্রিটেন থেকে তা আসতে লাগল মাত্র শতকরা ২॥০ টাকা হারে আমদানী শুল্ক দিয়ে, সে সব তথ্য রমেশচন্দ্র দত্ত উল্লেখ করেছেন। দু'একটা মোটা অঙ্ক মনে রাখাই যথেষ্ট—ইং ১৮১৩তে কলকাতা থেকে ২০ লক্ষ পাউণ্ডের বস্ত্র বিলাতে রপ্তানী হয়। আর ১৮৩০এ সে রপ্তানী তো গেলই, কলকাতা উল্টো ২০ লক্ষ পাউণ্ডের বিলাতী কাপড় আমদানী করে। মস্‌লিনের দেশে মস্‌লিন লুপ্ত হল; বিলাতী কলের সূক্ষ্ম বস্ত্র তখন 'মস্‌লিন' নাম পেল। ১৮২৭এ এদেশে সেই 'বিলাতী মস্‌লিন' আসত ১০ লক্ষ গজ। ১৮৩৭এ আসছে দেখি ৬ কোটি ৪০ লক্ষ গজ।

তিন, ইং ১৮৩৩ পর্যন্ত কোনো বাঙালী নেতার এসব দিকে দৃষ্টি ছিল কিনা জানি না; কিন্তু কারও মুখে প্রতিবাদ ফোটেনি। হিন্দু কলেজের 'ইয়ং বেঙ্গল'

প্রথম ব্যবসা বাণিজ্যের এ অবস্থার দিকে দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, ব্যবসায়ে তাঁরা নামেনও (রামগোপাল ঘোষ, ভোলানাথ চন্দ, প্রভৃতি)। কিন্তু ক্রমেই ব্যবসা ক্ষেত্রে দেশীয় বণিকেরা প্রতিহত হয়ে ফিরে আসতে থাকেন (রুস্তমজী কাওয়াসজী, দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতিদের ভাগ্য-নাশ এ সম্পর্কে স্মরণীয়)।

চার, ১৮৩৩এ বাঙলায় পোত আসছিল (প্রথম আসে ১৮২৫এ), গম-পেষা যন্ত্র কলকাতায়ও স্থাপিত হচ্ছিল (১৮২৯-৩০)। এর পর থেকে চা-বাগান (১৮৩৩), কয়লার খনি (১৮২০-৪০) প্রভৃতিতে ইংরেজ পুঁজির দৃষ্টি পড়ে। ইং ১৮৫৩-৫৬ হচ্ছে ডালহৌসির কাল—"Conquest, Consolidation and Development"এর কাল। চটকল (রিষড়ায় ইং ১৮৫৩ সালে স্থাপিত), রেলপথ ও টেলিগ্রাফের ব্যবস্থা হল—বিলাতি পণ্যের বাজার ভারতে প্রসারিত হতে লাগল। শিল্পবিপ্লবের এরূপ প্রসারে তাই ভারতের যুগ-যুগান্তরের পল্লীসমাজ যেমন ধ্বসে যাচ্ছিল তেমনি এই 'ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা নিজের অভ্যন্তরেই যুগের গতিবেগ, ধনিকতন্ত্রের আয়োজন-অনুষ্ঠান, শিক্ষা-দীক্ষা, ভাবনা-ধারণার বীজও বহন করে নিয়ে আসছিল, তাও দেখতে পাব। ১৮০০ থেকে ১৮৫৭ পর্যন্ত কালে বাঙালী সমাজও এসব বাস্তব পরিবর্তনে প্রতিনিয়ত দোলা খেতে থাকে। একটা ভাব-বিপর্যয়ের মধ্যে সমাজ এগিয়ে যায়, সাহিত্য ও সংস্কৃতির পক্ষে তা এক গভীর সত্য।

তৃতীয় কথা : **ভূমিস্বত্বের উপস্বত্ব ও মধ্যবিত্তের আত্মপ্রতিষ্ঠা**—প্রাচীন পল্লী-সমাজের ভাঙন ক্রমাগত বেড়ে চলেছে, তার স্থানে তৈরী হচ্ছে 'ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা', আধা-সামন্ততন্ত্র। বাঙলা বিহারে এ সমাজের বিশেষ ভিত্তি হল—কর্নওয়ালিস্-প্রবর্তিত 'জমিদারী প্রথা। এ ব্যবস্থা অবশ্য ১৭৯৩তে বাঙলায় চিরস্থায়ী ঘোষিত হয়। কিন্তু মাদ্রাজে মনরোর 'রায়তওয়ারী প্রথা' এবং আরও পরে অন্যত্র 'মহালওয়ারী প্রথা কোম্পানি প্রবর্তন করে। সে সব ব্যবস্থায় কয়েক বৎসরের মত জমির বন্দোবস্ত হত এবং কোম্পানি চড়া ডাকে জমি বন্দোবস্ত দিতেন। অর্থাৎ এসব প্রথায় রাজস্ব বৃদ্ধি করার সুযোগ কোম্পানির পুরোপুরি থাকে—জমিদারী প্রথায় তা থাকে না ;—সে সুযোগ কোম্পানিও পুরোপুরি গ্রহণ করে। তার ফলে ওসব অঞ্চলের রাজস্বের ভারে চাষী জমি ইস্তফা দিয়ে সমুদ্র পারে কুলি চালান যেতে থাকে, আর জমি সাহুকার মহাজনের হাতেই গিয়ে জমে। অর্থাৎ বাঙলায় বা বাঙলার বাইরে কোনখানেই কৃষক জমির মালিক থাকেনি, জমিদার বা অন্য যে নামেই হোক

খাজনাভোগী অ-কৃষক শ্রেণী 'ভূম্যধিকারী' হয়েছে। তফাৎ এই—বাঙলায় জমির বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী, অন্যত্র তা' নির্দিষ্টকালের জন্য হয়। তাই বাঙলায় ভূমির মালিকানা যেমন আভিজাত্যের মাপকাঠি, তেমনি মুনাফারও কামধেনু হয়ে ওঠে। ১৭৯৩এর কর্ন'ওয়ালিসী ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছিল—জমির ওপর পল্লী-সমাজের স্বত্ব খর্ব করে ব্যক্তিস্বত্ব সৃষ্টি করা এবং সেই স্বত্ব দিয়ে বিলাতের মত কৃষিকর্ম-নিপুণ একদল দেশীয় ভূম্যধিকারী (Landlord) সৃষ্টি করা—তারা জনগণের স্বাভাবিক নেতা হবে এবং তারা নিজেদেরই স্বার্থে হবে কোম্পানির পরিপোষক (পরে লর্ড বেন্টিঙ্ক স্পষ্ট ভাষায় এই 'দালাল'-সৃষ্টির উদ্দেশ্যটা ব্যক্ত করেন)। মুর্শিদকুলী খাঁর আমল থেকেই অবশ্য এরূপ খাজনা-আদায়কারীদের 'জমিদার' করে জমি ইজারা দেওয়া হচ্ছিল কর্নওয়ালিসী ব্যবস্থা তারই পরিণতি—একথা কেউ কেউ বলেন (History of Bengal, Vol. II)। কিন্তু ঔপনিবেশিকতার যে পরিবেশে এই পরিণতি ঘটল, আর ঔপনিবেশিকতার ভিত্তিরূপে যে ব্যবস্থা প্রণীত হল, ব্রিটিশ শিল্পবিপ্লবের অভ্যুদয়ের মুখে ইং ১৮০০ সনের পরে তার অর্থ স্পষ্ট হয়ে উঠল। এখানে আমরা তা' সংক্ষেপে উল্লেখ করছি :—

এক. পুরনো অভিজাতদের হাত থেকে জমি খসে গেল। অনেক ক্ষেত্রে এখন জমিদার হয়ে বসল চতুর নতুন ভাগ্যবান্‌রা—সাহেবদের মুন্সি বেনিয়ান, দালাল প্রভৃতি, যারা কলকাতা শহরে ও বাজারে বন্দরে টাকার ফিকিরে ঘুরে বেড়াত, জমি ও প্রজার সঙ্গে যাদের কোনো সম্পর্কই থাকত না। এই জমিদারদের দেয় রাজস্ব চিরস্থায়ী বা স্থির হলেও তাদের আদায় বা শোষণ বেপরোয়া বেড়ে যেতে কোনো বাধা ছিল না। অর্থাৎ জমিদারদের শোষণের মাত্রা রইল না।

দুই, এই জমিদাররা অনেকে দালাল, মুৎসুদ্দি ইংরেজের অনুগ্রহজীবী, কলকাতার অধিবাসী। তাই গ্রামাঞ্চলের জীবনের সঙ্গে এদের যোগাযোগ ছিল না, এরা absentee landlordরূপে শহরবাসী হয়েই থাকত। এদের শিক্ষা-দীক্ষা বা রুচিও দু' এক পুরুষে এতটা উন্নত হল না যাতে এরা পল্লীপ্রধান প্রাচীন সংস্কৃতি ও শিক্ষা প্রভৃতিকে বনেদী অভিজাতদের মত পরিপোষণ করবে (দ্রষ্টব্য, ডঃ সুশীলকুমার দে'র ইংরেজিতে লেখা Bengali Literature in the 19th Century, পৃ. ২৮-২৯)। এই শহরে ধনীদের পোষকতা পেল বরং নতুন ধরনের 'বাবু বিলাস'—যাত্রা, কবি, আখড়াই, তরজা আর

বুলবুলির লড়াই প্রভৃতি (পরে 'নববাবু বিলাস' দ্রষ্টব্য)। অবশ্য ইংরেজী শিক্ষা পেয়ে ইংরেজ হুইগ্-টোরির মত এঁদের মধ্যেও কেউ কেউ নতুন কালচারের পরিপোষক হলেন—যেমন, রামমোহন রায়, রাধাকান্ত দেব প্রভৃতি (দ্রষ্টব্য : লেখকের 'সংস্কৃতির রূপান্তরে' 'বাঙলার কালচার' পরিচ্ছেদ)।

তৃতীয় কথা, জমি শোষণে জমিদারীতে যে অভাবনীয় মুনাফার সুযোগ পাওয়া গেল বাঙলায় তার দুটি বিষময় ফল ফলল : বাঙলা দেশে বণিক্-ব্যবসায়ী, বৃত্তিজীবী (দ্বারকানাথ ঠাকুর, দুর্গাচরণ লাহা, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রভৃতি) বা যে কোনো অর্থবান্ লোক ব্যবসা-পত্র ছেড়ে মুনাফার লোভে জমিদারী কিনতে থাকলেন। এমন কি, বিংশ শতকের প্রথম পাদেও অবস্থা অব্যাহত ছিল। এর সঙ্গে বোম্বাইয়ের একালের বণিক্ ও অর্থবান্দের তুলনা করলে দেখব—সেখানে জমিদারী ও মুনাফার সুযোগ ছিল না ; অর্থবান্রা সেখানে তাই টাকা খাটাতে লাগল প্রথম ব্যবসায়ে, তারপর কলকারখানায়। জমিদারীতন্ত্র বাঙালীর বাণিজ্য-প্রয়াস ও শিল্পোদ্যোগকে আরও পঙ্গু করেছে। এর ফলে জমিদারী কিম্বা বাড়িভাড়া বা কোম্পানির কাগজে টাকা খাটানোই বাঙালী অবস্থাপন্নের পক্ষে নিয়ম হয়ে ওঠে। পুরুষানুক্রমে যে কোনো একটা স্থায়ী বিধি-ব্যবস্থা, স্থাণু অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানকে জমিদারীর মত আঁকড়িয়ে থাকাই হল এই অলস শ্রেণীর অভ্যাস।

চার জমিদাররা প্রথম থেকেই কৃষির প্রতি উদাসীন থেকে কেবল মুনাফা আহরণের সহজ উপায় খুঁজেছিল। যুগ যুগান্তর ধরে প্রজা যে জমি চাষ করত বর্ধিত খাজনার লোভে জমিদাররা তা থেকে প্রজাদের উৎখাত করছিল। আবার প্রায় প্রথম থেকেই বাঙলা দেশে সৃষ্টি হতে লাগল জমিতে মধ্যস্বত্ব—তালুকদারী, পত্তনিদারী, দর-পত্তনিদারী প্রভৃতি নানা স্তরের উপস্বত্ব। এই ভূমিস্বত্বের উপস্বত্ব আশ্রয় করেই বাঙলা দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণী প্রথম দাঁড়িয়ে ওঠে। পরে (১৮৩৫) সরকারী চাকরিও হয় তার দ্বিতীয় আশ্রয়।

একটা কথা : খাজনাভোগী ও জমির মালিক একটা মধ্যবিত্ত শ্রেণী বাঙলাদেশে মুসলমান আমলেও ছিল ; সম্ভবতঃ হিন্দু আমলেও তাদের দেখা যায়। রাজকর্মচারী, টোলের পণ্ডিত, বৈদ্য প্রভৃতি উচ্চবর্ণের বৃত্তিধারীরা জমিতে এরকম উপস্বত্ব ভোগ করতেন (দ্রষ্টব্য—'ইতিহাস' পত্রে ডঃ নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহের প্রবন্ধাদি)। এঁরা পূর্বেও অক্ষম ছিলেন না—কিন্তু এখন জমিদারীতন্ত্রের মধ্যে এঁরা সংখ্যায় ও ক্ষমতায় ক্রমেই প্রসার লাভ করতে পারলেন। শ্রেণী

হিসাবে বাঙালী 'ভদ্রলোক' তাই দাঁড়িয়ে উঠল। অবশ্য কর্ন'ওয়ালিস সামান্ত বেতনে ছাড়া দেশীয়দের সরকারী-কর্মে নিয়োগ নিষিদ্ধ করেছিলেন। ইং ১৮৩১এর পরে যখন শিক্ষিত দেশীয়দের ১ শত টাকার উর্ধ্ব' বেতনেও রাজকার্যে নিয়োগের নীতি বেন্টিঙ্ক ঘোষণা করেন তখন এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্যতম জীবিকোপায়ও আয়ত্ত হল। হিন্দু কলেজের শিক্ষা গৌরবে ইংরেজী বিদ্যায় কৃতবিদ্যরা (কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মধুসূদন দত্ত, পরে হরিশ মুখুজ্জে প্রভৃতি) সামাজিক মর্যাদায় ক্রমে জমিদারদের সমকক্ষ হন। এ কথা বোঝা দরকার: (ক) এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও শিক্ষিত শ্রেণী (intelligentsia) কালক্রমে এক হয়ে ওঠেন। বাঙলার 'ভদ্রলোক' শ্রেণী বলতেও এঁদেরই বোঝায়। (খ) বাঙালী মধ্যবিত্ত মোটামুটি জমিতে বাঁধা; অনেকটা সামন্ত ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত। তাই বাঙালী মধ্যবিত্ত ধনিক-উদ্যোগে উৎসাহী ইংরেজী 'মিডল ক্লাস' হয়ে উঠে নি। এবং (গ) নানাবিধ কারণে কোনো দিনই মুসলমান মধ্যবিত্ত যথেষ্ট সংখ্যায় উদ্ভূত হতে পারে নি—মুসলমান রাজত্বকালে মধ্যবিত্ত বিশেষ গণনীয় ছিল না। ১৭৯৩এর জমিদারী-তন্ত্রের মধ্যেও মুসলমান সম্ভ্রান্তদের মোটেই স্থান হয় নি। (ঘ) প্রথম দিকে (ইং ১৮১৭-৫৮ পর্যন্ত) রামমোহন, রাধাকান্ত দেব, কিম্বা পাথুরিয়াঘাটা, পাইকপাড়া, জোড়াসাঁকোর 'রাজা'রা ও কালিপ্রসন্ন সিংহ প্রভৃতি অভিজাত-গোষ্ঠী নতুন সমাজ-জীবনে নেতৃত্ব করেছেন। কিন্তু গোটা উনবিংশ শতক জুড়ে জমিদারীতন্ত্রের আওতায় মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক-শ্রেণীর শ্রীবৃদ্ধি সম্ভব হতে থাকে। প্রথমে হিন্দু কলেজে শিক্ষা পেয়ে ও পরে স্কুল কলেজের ক্রমবিস্তারে ভদ্রলোক শ্রেণী আত্মপ্রকাশের সুযোগ পায় আর তার সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার'ও করে। তাই, এই 'ঔপনিবেশিক যুগে'র বাঙলা সংস্কৃতি বা সাহিত্যকে কেউ মধ্যবিত্তের সাহিত্য' বা 'ভদ্রলোকের সাহিত্য' বললে তা একেবারে ভুল হবে না। অন্ততঃ ইং ১৮১৭ (হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা) থেকে ১৯১৮ (প্রথম মহাযুদ্ধের শেষ ও কৃষি সংকটের প্রকাশ-কাল) পর্যন্ত একশত বৎসরকে 'মধ্যবিত্তের মধ্যাহ্নকাল' বা ভদ্রলোকের শতাব্দী' বললেও অন্যায় হয় না। (ঙ) আর একটি কথাও তাই স্পষ্ট—'কলোনির মধ্যবিত্ত' আত্মদ্বন্দ্বে, শিক্ষায়, চারিত্রিক অসঙ্গতিতে খণ্ডিত জীবন যাপন করতে বাধ্য; তার সাহিত্যেও তার আঁকা-বাঁকা, তীব্র তির্যক্ প্রকাশ প্রত্যাশিত।

চতুর্থ কথা: মুসলমানের ভাগ্যবিপর্যয়—ধর্মগত পার্থক্য সত্ত্বেও

বাঙালী মুসলমান বাঙালী। বাঙালী মুসলমান ও বাঙালী হিন্দুর সম্পর্ক ভারতের অন্য প্রান্তের হিন্দু ও মুসলমানের সম্পর্কের মত নয়। কারণ, এখানে তারা সকলেই শুধু একই (বাঙলা-ভাষা) ভাষা-ভাষী নয়, একই জীবনযাত্রারও অধিকারী ছিল। পাঠান আমল থেকেই বাঙলার মুসলমান তাই বাঙালী। মুঘল আমলেও তা'ই। সে সময়েও অবাঙালী মুসলমান শাসকশ্রেণী সাধারণ মুসলমানের এই বাঙালীত্ব নিয়ে আপত্তি করে নি। বরং অষ্টাদশ শতাব্দীতে এসে ওপরতলার বাঙালী হিন্দুও অনেকটা মুসলমানী আদবকায়দা গ্রহণ করে ওপরতলার মুসলমানের কাছাকাছি এসে গিয়েছিল—নিচের তলায় গ্রাম্য সমাজের হিন্দু-মুসলমান তার বহুদিন পূর্বেই পরস্পরের আত্মীয় হয়েছে। বাঙালী জাতীয়তার এই 'প্রোসেস্'টা বিশেষ করে বাধা পেল বরং ১৭৫৭এর পর থেকে, তৃতীয় এক শক্তির রাজ্যলাভে। সাধারণ হিন্দু ও মুসলমান অবশ্য প্রায় নিষ্ক্রিয়ভাবেই তা মেনে নেয়। কিন্তু স্বভাবতই ওপরতলার মুসলমান সামন্তরা ইংরেজ-আমলে ক্ষমতা হারিয়ে বারবার বিদ্রোহ করেছিল; কিছু কিছু হিন্দু সামন্তও ছিল সেরূপ বিদ্রোহী। তবে সাধারণভাবে বলা যায়, নবাবদের দরবারী নিয়মের বদলে কোম্পানির ইংরেজী আধিপত্য মেনে নিতে হিন্দু-রাজ-কর্মচারীদের বা হিন্দু রাজপ্রসাদজীবীদের বেশি বাধা হল না। বিশেষ করে, চতুর হিন্দু বৃত্তিজীবীরা তৎপূর্বেই দালাল, মুন্সি, মুৎসুদ্দি হিসাবে কোম্পানির সাহেবদের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। কাজেই হিন্দু অভিজাতদেরও ইংরেজ-প্রাধান্য স্বীকার করতে বেশি আপত্তি হয় নি। কিন্তু মুসলমান অভিজাত তার গর্ব ও সুযোগ ছাড়তে যে সেরূপ সহজে রাজী হল না, তা সহজবোধ্য। সাধারণ মুসলমানও (১৭৬৪এর পরে) চমকিত হয়ে দেখল—নবাবের রাজ্যনাশে সে আর 'রাজার জাতি' রইল না। বরং কোম্পানির লুণ্ঠনে, শোষণে উৎপীড়িত সাধারণ মুসলমানও পূর্বেকার শাসক মুসলমানের ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের স্বপ্নে একটা নিষ্ক্রিয় সহানুভূতি বোধ করত। তাই বলা যায়, বাঙালী মুসলমান,—কেউ প্রকাশ্যে, কেউ গোপনে, কেউ সক্রিয় ভাবে, কেউ নিষ্ক্রিয় ভাবে,—মোটের ওপর কোম্পানির শাসনের বিরোধীই ছিল। অপর দিকে, হেস্টিংস-এর মত চতুর শাসক অবশ্য কলকাতায় মাদ্রাসা স্থাপন করে তাদের বিরূপতা দূর করতে চাইছিল; কিন্তু মুসলমানদের প্রতি আশঙ্কা ও সন্দেহ কোম্পানির শাসক-গোষ্ঠীর মনে বরাবরই ছিল (কাজী আব্দুল ওদুদ সাহেব 'বাঙলার জাগরণে' তা' মনে করেন নি। দ্রষ্টব্য বাঃ জা, পৃ ১১৪)। কার্যতঃ মুসলমানদের

প্রভাব-প্রতিপত্তি নষ্ট করা ছিল ১৭৬৫ থেকে প্রায় ১৮৭৫ পর্যন্ত অলিখিত ব্রিটিশ নীতি। ব্রিটিশ রাজত্বের প্রথম দিকে মুসলমান অভিজাতরা বিশেষ সুবিধা লাভ করল না, করবার কথাও নয়। কারণ, জমির ইজারাদারী ও খাজনা আদায়ের কাজে মুর্শিদকুলী খাঁর সময় থেকে (ইং ১৭০৭এর কাছাকাছি) হিন্দু দেওয়ান ও কর্মচারীই প্রাধান্য অর্জন করে। পরে ইং ১৭৯৩তে জমিদারী প্রথার আওতায় মধ্যস্বত্ব-লাভেও মুসলমানগণ বিশেষ যত্নপর ও অগ্রসর হন নি। কারণ, মুসলমান সমাজে ওপরতলার অভিজাত ও নিচতলার কৃষক বৃত্তিজীবী ছাড়া মধ্যবিত্ত শ্রেণী ততদিন পর্যন্ত প্রায় ছিল না—বাঙালী মধ্যবিত্ত প্রায়ই ছিল হিন্দু। ১৮২৮এর লাখেরাজ বাজেয়াপ্তের নীতিতে মুসলমান শিক্ষাদীক্ষার আর্থিক আশ্রয়ভূমিও হারাল—এ সাংস্কৃতিক বিপাকের তুলনা নেই। এর পরে 'হুসরার' রাজত্বে ক্ষোভের বশে দূরে সরে থেকে মুসলমান সমাজ আপনার আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রাধান্য আরও হারাতে লাগল। (মুসলমানের দুর্গতি বোঝবার পক্ষে W. W. Hunter-এর Indian Mussalmans অবশ্য দ্রষ্টব্য।)

যতই তার দুর্দশা বৃদ্ধি পেল ততই স্বাভাবিক ভাবে মুসলমান সমাজে ক্ষুব্ধ আত্মজিজ্ঞাসাও জাগল। ক্ষুব্ধ আত্মজিজ্ঞাসা সুস্থ আত্মজিজ্ঞাসা নয়। ঊনবিংশ শতকের তৃতীয় দশকে সে তাই মনমতো উত্তর দেখল ওহাবী তত্ত্বে ও কর্মনীতিতে। সহজেই রাজ্যচ্যুত মুসলমান মেনে নিল ইসলামের বিশুদ্ধ নীতি থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে বলেই বাঙলার ও ভারতের মুসলমানের এই শাস্তি। অর্থাৎ ধর্মগত গোঁড়ামি ও মধ্যযুগীয় মতাদর্শকেই মুসলমানরা আঁকড়ে ধরতে গেল। রায় বেরিলীর সৈয়দ আহমদ ইং ১৮২২এর পরে মক্কা থেকে ফিরে আম্বালা, পাটনা, কলকাতা পর্যন্ত এই ওহাবী বিদ্রোহের আহ্বান জানান,—মধ্য বাঙলা তাতে কম সাড়া দেয় নি। পরবর্তী প্রায় ৫০ বৎসর কাল পর্যন্ত পাটনা ও মধ্য বাঙলা হয়, ওহাবী আন্দোলনের কেন্দ্র (ইং ১৮২৬-১৮৭০)। তত্ত্ব হিসাবে ওহাবী-মতবাদ কতজন বাঙালী গ্রহণ করেছিল ঠিক নেই ; কিন্তু এই জেহাদী মনোভাব বাঙলা দেশে বেশ ব্যাপক হয়। তিতুমীরের অভ্যুত্থান (১৮৩১) তার প্রকাশ্য প্রমাণ (অথচ হিন্দুসমাজে তখন বাঙালী ইয়ং বেঙ্গলের বিদ্রোহ বহ্নিমান)। ঢাকা ও ফরিদপুরে মৌঃ শরিয়তুল্লা ও দুধামিঞার নেতৃত্বে পরিচালিত অনুরূপ আন্দোলন, 'ফরাজী' আন্দোলন নামে (প্রায় ১৮২৮ থেকে ১৮৩০ পর্যন্ত) জনসাধারণের মধ্যে প্রবল আকার ধারণ করে। সেখান থেকে

দলে দলে মুসলমান যুবক শিখদের বিরুদ্ধে জেহাদে যোগদান করতে যেত, পাঞ্জাবে ও সীমান্তপ্রদেশে প্রাণ দিত (ইং ১৮৫১ পর্যন্ত)। পরে (দ্বিতীয়ার্ধে), অবশ্য মুসলমানের ধর্মবিশুদ্ধির চেষ্টা পরিত্যক্ত হল না, তবে নবাব আবদুল লতিফ ও মৌঃ কেরামত আলীর চেষ্টায় ব্রিটিশ বিরোধ কমল। ২৪ পরগণা, নদীয়ায় তিতু মিঞা বা তিতুমীরের (ইং ১৮৩১-১৮৩২) মুসলমান ও হিন্দু কৃষকের বিদ্রোহ কলকাতাকেও শঙ্কিত করে তোলে। ধর্মগত গোঁড়ামি সত্ত্বেও ফরিদপুর ও নদীয়ার দুই আন্দোলনই বহুল পরিমাণে ছিল উৎপীড়িতের ব্যর্থ বিদ্রোহ। কিন্তু ধর্মোন্মাদদের বাড়াবাড়িতে হিন্দু নেতারা সংবাদপত্রে এসব আন্দোলনের বিরুদ্ধে কলরব তোলে। আন্দোলনও ব্যর্থ হয়ে যায়।

ব্যর্থ বিদ্রোহের পরে ইং ১৮৩৫ থেকে ইং ১৮৩৮এর মধ্যে বাঙালী মুসলমান সমাজ শেষ ক্ষমতাও খোয়ায়। ১৮২৮ থেকেই কোম্পানির সরকার 'আয়েমা' সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে মুসলমান-সমাজের শক্তিকেন্দ্র ভেঙে দিয়েছিল। ১৮৩৫-এর পরে ১৮৩৮এ কোম্পানি ফৌজদারী বিচারে কাজীদের স্থান বাতিল করে এবং আদালতের কাজে ফারসির পরিবর্তে বাঙলা ভাষা প্রবর্তন ক'রে মুসলমান সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠাও বিনষ্ট করে। (এ বিষয়ে সাধারণ ভাবে W. Cantwell-Smith-এর Modern Islam in India, 1943 ও W. Hunter-এর পুনর্মুদ্রিত Indian Mussalmans, 1871 দ্রষ্টব্য।) অবশ্য ওহাবী-চক্রান্ত তথাপি বাঙলা থেকে উত্তর প্রদেশ পর্যন্ত গোপনে-গোপনে চলতে থাকে।

কিন্তু এই বিক্ষোভ, হতাশা ও ওহাবী চিন্তার প্রভাবে শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ভাগ্যবিপর্যয় থেকে মুসলমানের যে ভাববিপর্যয় দেখা দিল তা জানা প্রয়োজন। পূর্বে বিশেষ করে তার লক্ষ্য ছিল শিখ সাম্রাজ্য। ইংরেজের বিরুদ্ধে বৈরিতা কমল যখন মৌঃ শরিয়তুল্লা ভারতবর্ষকে দার-উল-ইস্‌লাম ঘোষণা করলেন। কিন্তু ধর্ম ও সংস্কৃতিতে তিনিও চাইলেন বিশুদ্ধ ইস্‌লামের প্রসার—সমস্ত হিন্দু ভাব ও প্রথা-নিয়মের সঙ্গে মুসলমান জনগণের সম্পর্কচ্ছেদ। তখন থেকে শরিয়তের নিয়ম কানুন অক্ষরে অক্ষরে পালন করে সমাজ-শুদ্ধি করার জন্য বাঙলায় মুসলমানের মধ্যে অবাধ প্রচার চলে। এর এক প্রত্যক্ষ ফল :—ইংরেজী শিক্ষার প্রতি বাঙলার ও ভারতের মুসলমানের দীর্ঘকালীন ঔদাসীন্য থেকে যায়। পরোক্ষ ফল বাঙালীর জাতীয়তা ও বাঙালীর সংস্কৃতির পক্ষে আরও মারাত্মক হয়। বাঙালী মুসলমান বাঙালী হিন্দুর সঙ্গে চিরদিন একযোগে যে সামাজিক

পার্বণ উৎসবাদি পালন করত ক্রমশঃ তা' থেকে দূরে সরে যেতে লাগল,—এবং একান্ত ভাবে শরিয়তী গোঁড়ামি ও আরবী-ফারসি ধর্ম-শিক্ষাকেই আশ্রয় করতে গিয়ে গতানুগতিক আরবী ফারসি বিষয়বস্তু ও কেচ্ছা, ধর্মনামা ও ইসলামী পুরাণ রচনা করল (১৮০০-১৯০০)। অর্থাৎ বাঙালী সংস্কৃতির প্রস্তুতি (১৮০০-১৮৫৭) ও প্রকাশের (১৮৫৭-১৯১৮) পথে বাঙালী মুসলমান পশ্চাৎপদ হয়ে রইল। ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার ফলে বাঙালী হিন্দু যখন আধুনিক শিক্ষাদীক্ষা সংগ্রহ করেছে (১৮১৭ থেকে), ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার বিরোধিতায় বাঙালী মুসলমান তখন সামন্ত যুগের গোঁড়ামিকে আরও সবলে আঁকড়ে ধরেছে। ফলে সে শুধু আত্মবিস্মৃত নয় যুগভ্রষ্ট এবং আত্মদ্রোহীও হয়ে পড়ল। বাঙালী মুসলমান নিজেও তাই পশ্চাৎপদ হয়ে রইল, উনবিংশ ও বিংশ শতকের বাঙালীর জাতীয় বিকাশকেও অবজ্ঞা করল। অবশ্য মুসলমানের এ ভাব-বিপর্যয় শুধু নিজের ঔদাসীন্যের জন্যে হয় নি, নানা বাস্তব অসুবিধার জন্যেই ঘটেছে। সরকারী বিরোধিতা বিশেষ করে তার ভাগ্যেই বেশি জুটেছে। সিপাহী যুদ্ধের পরে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইংরেজের বিরূপতা কিছু কাল আরও বৃদ্ধি পায়। ক্রমে উত্তর প্রদেশে সৈয়দ আহমদ খাঁ ইংরেজী শিক্ষাদীক্ষা ও ইংরেজের সহযোগিতার দিকে মুসলমানদের মুখ ফেরাতে পারেন। তার পূর্বেই বাঙলাদেশে মুসলমানদের ইংরেজী শিক্ষা দিতে চেষ্টা করেন নবাব আব্দুল লতিফ। মৌঃ আব্দুল লতিফ (ফরিদপুরের) ইং ১৮৬৮, ও সৈয়দ আমির হোসেন (পাটনার) ইং ১৮৮০'তে মুসলমানদের সপক্ষে আধুনিক শিক্ষার দাবী তোলেন। পাদ্রী লঙ্ ও হিন্দু সম্প্রদায়ের মুখপত্র 'বেঙ্গলী' ও 'হিন্দু পেট্রিয়ট' তাঁদের দাবী জোর গলায় সমর্থন করেন। হাণ্টার সাহেব এ দাবী সমর্থন করলেও ছোটলাট এ্যাশলি তাতে উৎসাহ দেন নি। বাঙলায় সৈয়দ আমীর আলীও তখন বাধা সৃষ্টির পরিবর্তে সৈয়দ আহমদের মত যুক্তিসিদ্ধ ইসলামের ব্যাখ্যা করছিলেন। এই ইংরেজী-শিক্ষিত স্বল্পসংখ্যক মুসলমান সহজেই ইংরেজ-রাজের সুনজরে পড়েছেন, তা ঠিক ; কিন্তু মুসলমান সমাজ তাই বলে তখন ইংরেজের সুনজরে পড়ে নি। স্বদেশী যুগের পূর্ব পর্যন্ত মুসলমানই ছিল সাম্রাজ্যবাদের দুয়োরাণী, এ কথা মোটামুটি ঠিক। বিংশ শতকে সে সুয়োরাণী হয়।

যা এখানে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য তা হচ্ছে এই যে, প্রথমতঃ ১৮০০এর পরে ইংরেজ শাসনের মধ্যে যেটুকু নতুন শক্তি সংগঠনের বাস্তব সুযোগ এল তা

বাঙালী হিন্দুরাই গ্রহণ করল, বাঙালী মুসলমানরা পেল না ও গ্রহণ করতে পারল না। দ্বিতীয়তঃ, বাঙালী হিন্দু ও বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকে যে আর্থিক বৈষম্য ও অসম বিকাশের সূত্রপাত হল তা দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ বিংশ শতকে দুই সম্প্রদায়কে প্রতিদ্বন্দ্বী করে তোলার সুযোগ পেল। তৃতীয়তঃ, জাতীয়তার ও জাতীয় সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এই অসম বিকাশের ছায়া ১৮৫৭এর পর থেকে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। এক-আধজন মুশাররফ হুসেন বা নজরুল আর পরবর্তী কালের (বিংশ শতকের) বাঙালীর ইতিহাসের ট্র্যাজিডিকে (১৯:৬-৪৭) ঠেকাবার পক্ষে যথেষ্ট হল না।

সমগ্রভাবে দেখলে বাঙলা সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা বড় দুর্ঘটনাই এইটি :—একই জাতির অঙ্গীভূত হয়েও বাঙালী হিন্দুর ও বাঙালী মুসলমানের এই অসম বিকাশ। বাঙালী সংস্কৃতি ও সাহিত্যে প্রধান প্রতিষ্ঠা হিন্দুর; মুসলমান সেখানে প্রতিষ্ঠাহীন অনেকাংশে আত্মবিস্মৃত, তার সৃষ্টি-প্রতিভা এখনো প্রায় অনাবিষ্কৃত। উনবিংশ শতকের বাঙালী জাগরণে এজন্য হিন্দুত্বের রঙ ক্রমেই বেশি করে লাগল (বিশেষ করে 'প্রকাশের পর্বে'), আর ক্রমেই বাঙালী হিন্দু ও বাঙালী মুসলমানের মধ্যে ভেদরেখা গভীর হয়ে উঠতে থাকল।

পঞ্চম কথা ঃ কলিকাতা কমলালয়—পল্লীসমাজ যেমন ভাঙল ও শিল্প-পণ্যের বাজার গড়ে উঠল শহরে, তেমনি আধুনিক বাঙালী সমাজের জীবন কেন্দ্রিত হয়ে উঠতে লাগল কলকাতায়। হুগলী, চুঁচুড়া, কৃষ্ণনগরেও তার ছায়া পড়ে। কিন্তু আধুনিক কলকাতাই আধুনিক বাঙলা সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র। গৌড় বা নদীয়ায় পূর্ব পূর্ব যুগের বাঙলা সাহিত্য সত্য সত্যই কতটা রচিত হয়েছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। মোটামুটি এতদিন পর্যন্ত বাঙলা সাহিত্য ছিল পল্লীসমাজের বুকের জিনিস। তাই পল্লীসমাজ ভাঙলে বাঙলার সমাজ সাহিত্য সংস্কৃতি সব-কিছুরই বাসাবদল হ'ল—এল শহরে, কলকাতায়।

এ কলকাতা অবশ্য ইংরেজেরই শহর। তবে কলকাতা জব চার্নকের আবিষ্কার নয়। কারণ, জব চার্নক যখন কলকাতা আশ্রয় করেছিলেন তারও পূর্বে সুতানটি কলকাতায় গঙ্গাতীরের একটা গঞ্জ বা আড়ত ছিল।* বিপ্রদাসের

---

* কলকাতা নাম থেকেই তা' বোঝা যায়—এটি 'কল' বা 'কলি' শামুক চূণের 'কাতা' বা গোলা, আড়ত। 'চুণা গলি', 'চুণাপুকুর' তার স্মৃতি এখনো জেগে রয়েছে। শ্রীযুত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এ ধারণা পোষণ করেন।

মনসামঙ্গলে (১৪৯৫-৯৬) কলকাতার প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে প্রায় এক শত বৎসর পরে কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গলে (ইং ১৬০৪ ?) ভাগীরথীর দুই তীরের গ্রামের নাম রয়েছে। আর তারও প্রায় একশত বৎসর পরে ইং ১৬৯৮ খ্রীষ্টাব্দে বাঙালী জমিদার সাবর্ণ চৌধুরীদের কাছ থেকে ইংরেজ কোম্পানি কলকাতা, সুতানটি ও গোবিন্দপুর ইজারা নেয়। আর্মানি বণিকেরা ইংরেজের আগেই এখানে ব্যবসা গেড়েছে। কলকাতার প্রাচীনতম চিহ্ন হচ্ছে আর্মানি গির্জায় রীজাবিবির (১৬৩১ ইং) সমাধি-চিহ্ন। সুবর্ণবণিক ও তন্তুবায়রা তখনো ব্যবসা-প্রধান ছিল। প্রথমে সুরাট, বোম্বাই, মাদ্রাজও কোম্পানির ব্যবসা-কেন্দ্র হিসাবে সামান্য ছিল না। তারপর ইংরেজের ভাগ্যোদয়ের সঙ্গে কলকাতা ফেঁপে উঠল। কোম্পানির কুঠির বেনিয়ান, মুৎসুদ্দি রূপে ব্রাহ্মণ কায়স্থ 'অভিজাত'দের পূর্বপুরুষেরাও কলকাতায় আসতে লাগল। ইংরেজ বণিকের গঠনপ্রতিভা ও শক্তির ওপর ভরসা করে কেউ কেউ বর্গীর ভয়ে কলকাতা আশ্রয় করল। রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণবল্লভ প্রভৃতি ভাগ্যান্বেষীরাও অনেকে কলকাতায় আশ্রয় নেয় নবাবের বিরোধী পক্ষ রূপে। তারপরে পলাশী—১৭৫৭। ১৭৬৮ সালে মুর্শিদাবাদ থেকে শাসনকেন্দ্র কলকাতায় চলে এল। ১৭৭৩ থেকে কলকাতাই হল ইংরেজের ভারত রাজ্যের রাজধানী। ইং ১৯১১ পর্যন্ত কি চীনের বাণিজ্য, কি বর্মা যুদ্ধ—সমস্ত অর্থনৈতিক ও মানসিক-আধ্যাত্মিক উদ্যোগ ইংরেজ রাজশক্তি এখানে থেকেই প্রারম্ভ করেছে, ও পরিচালিত করেছে। স্বভাবতই বণিক্‌যুগের পরে ঔপনিবেশিক শিল্প-প্রসারের প্রধান ক্ষেত্রও হয়েছে কলকাতা। গঞ্জ থেকে কলকাতা হয়েছে বন্দর, তারপর শিল্পনগর, শেষে মহানগর। হাণ্টারের অনেক কথার মতই এই কথাও অর্ধসত্য, তবে স্মরণীয় অর্ধসত্য ("Our Indian Empire")। ভারতবর্ষে ইংরেজের কৃতিত্ব আধুনিক নগর নির্মাণ, "এ কাজে আমাদের ইংরেজদের যোগ্যতা প্রতিভা যে অতুলনীয় তা আধুনিক শিল্পবাণিজ্য কেন্দ্রে আমাদের মহানগর নির্মাণের সাফল্যে প্রমাণিত হয়। আমাদের মহানগর নির্মাণের অসাধারণ প্রতিভা ছিল বলেই ভারতবর্ষে নতুন শ্রমশিল্পযুগের সূচনা হয়েছে।" অথবা, ইংলণ্ডে শিল্পযুগ এল বলেই ইংরেজের মহানগর নির্মাণের প্রতিভাও বিকাশ লাভ করল। না হলে ক্লাইভের কথাতেই জানি, তাঁর আমলেও মুর্শিদাবাদ লণ্ডনের অপেক্ষা বিশালতর ছিল! তারপরে ইংরেজের 'গঠন-প্রতিভায়'

ঢাকা, সুরাট, মুর্শিদাবাদ ক্রমেই ম্রিয়মাণ হ'ল ; কাশিমবাজার, হুগলী, মালদহ আর জাগল না ; বরং খালবিল মজে পুরনো গঞ্জ, বন্দর পরিত্যক্ত হল। কাজেই মূল সত্য হল—শিল্পবিপ্লব ও শিল্পবিপ্লবে ইংরেজের নেতৃত্ব, এই হল ইংরেজের প্রতিভার অর্থ।

কিন্তু কলকাতা জাগল। কাদের নিয়ে জাগল কলকাতা? ইংরেজ আর্মানি, মারোয়াড়ী, ক্ষেত্রী প্রভৃতি বণিক্‌দের শুদ্ধ কলকাতা জেঁকে উঠল তার প্রথম ব্যবসায়ী বণিক্‌ বাসিন্দা, মল্লিক, শেঠ, বসাক, শীল, বড়াল, আঢ্য প্রভৃতি সুবর্ণবণিক্‌ ও তন্তুবায়দের নিয়ে। তারপর ইংরেজ কোম্পানি ও তার সাহেবদের বেনিয়ান, মুৎসুদ্দি, দেওয়ান, মুন্সি প্রভৃতি অনুগ্রহজীবী ভাগ্যান্বেষী-দের নিয়ে। মহারাজা নবকৃষ্ণ, রাজা রাজবল্লভ, দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, গোবিন্দ মিত্র, কান্তবাবু, গৌরী সেন, দর্পনারায়ণ ঠাকুর, লক্ষ্মীকান্ত ধর, রাজা সুখময় রায়, আমীর চাঁদ, বৈষ্ণবচরণ শেঠ, হাজারীমলদের এখানে ভাগ্যলাভ হল। ১৮০০এর পূর্বেই জগৎশেঠের ঐশ্বর্য প্রায় শেষ হয়ে গেল,—হেষ্টিংস স্থাপন করেছিলেন প্রথম জেনারেল ব্যাঙ্ক (১৭৭০)। তারপরে আরও ব্যাঙ্ক গড়ে ওঠে। লণ্ডনের ব্যাঙ্কের শাখাও প্রতিষ্ঠিত হয়। ইংরেজ বণিকের ১৯টি এজেন্সি হাউস ইং ১৭৯৭-এই এখানে ছিল, ১৮১৩এর পর থেকে উদ্যোগী বণিক্‌দের এজেন্সি হাউসের সংখ্যা কলকাতায় বৃদ্ধি পেতে থাকে। এইসব এজেন্সি ফার্মই একালের চা, কয়লা, লোহা, পাট প্রভৃতি শিল্পপণ্যের মহাকায় ব্রিটিশ কারবারীদের পথপ্রদর্শক। আর, এদের পার্শ্বচর ও অনুচর রূপে এগিয়ে এসেছিলেন কাওয়াসজী রুস্তমজী, কার-টেগোর কোম্পানির দ্বারকানাথ, রামদুলাল দে, মতিলাল শীল প্রমুখ দেশীয় উদ্যোগী পুরুষেরা। (রুস্তমজী কাওয়াসজীর বিষয়ে দ্রষ্টব্য যোগেশচন্দ্র বাগলের "উনবিংশ শতকের বাংলা"।) দিশী বিলিতি বণিক্‌-সহযোগিতার প্রথম প্রতিষ্ঠান রুস্তমজী টার্নার অ্যাণ্ড কোং (১৮২৭এর পূর্বে), ও কার-টেগোর অ্যাণ্ড কোং (১৮৩৪)। বীমা ব্যবসায়ে, ব্যাঙ্ক পরিচালনায়, জাহাজ ব্যবসায়ে রুস্তমজী ছিলেন অগ্রগণ্য—তখনো কলকাতায় জাহাজ নির্মাণ হত। ১৮৪৮এ 'ইউনিয়ন ব্যাঙ্কে'র পতনে দু'টি ভারতীয় বণিক্‌ প্রতিষ্ঠানই লুপ্ত হল। তখনো বাঙালীরা অনেকে ব্যবসায়ী ছিলেন। কিন্তু ১৮৫০-এ পৌঁছতে না পৌঁছতেই দেখি—দেশীয় বণিকেরা কেউ পণ্যোৎপাদনে অগ্রসর হতে পারলেন না। ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক চালাতে গিয়ে রুস্তমজী ও দ্বারকানাথ ব্যর্থমনোরথ হলেন।

জাহাজী ব্যবসায়ে পি এণ্ড ও-র পত্তনে কাওয়াসজী পরাহত হলেন। পূর্বেকার দেশীয় ব্যবসায়ীরা অধিকাংশই জমিদারী কিনে, বাড়ির মালিক হয়ে, কোম্পানির কাগজে পুঁজি খাটিয়ে নিরুদ্যম বিলাসে জীবন-যাপন করেছেন। বেণ্টিঙ্কের কৃপায় শিক্ষিত বাঙালী সরকারী চাকরীতে পদ ও প্রতিষ্ঠা অর্জনে ঝুঁকে পড়ল। বাঙালী পুঁজি স্থায়ী ও স্থাণু হয়ে বসল জমিতে, বাড়িতে, কোম্পানির কাগজে। ১৮৫৮ সালেও আশুতোষ দে, রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি বড় বড় বাঙালী ব্যবসায়ী ছিলেন, বেনিয়ানের কাজও করতেন অনেকে (এ বিষয়ে বিনয় ঘোষের 'বাঙলার নব জাগৃতি'-তে উদ্ধৃত হিসাব দ্রষ্টব্য)। কিন্তু ততক্ষণে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার চৌহদ্দির মধ্যে বাঙালী ব্যবসায়ীর পক্ষে স্বাধীন উদ্যোগ সুসম্ভব নয়। এবং বেনিয়ান, মুৎসুদ্দি, দেওয়ান, দালালদের অত সাহসও হল না। অতএব, ১৮৩৮এর পর থেকে নব্য শিক্ষিত বাঙালী যেমন ডিপুটিগিরি পেয়ে চাকুরে হয়ে উঠলেন, মুৎসুদ্দিদের বংশধররা তেমনি বাবু-বিলাসে আরও নিমগ্ন হলেন। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নববাবু বিলাসে' (১৮২৩ ও কালী সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'য় (১৮৬২) তাঁদের ব্যঙ্গচিত্র স্থায়ী হয়ে আছে। তা' থেকে কলকাতার 'বাবু'দের জন্ম ও বিবর্তনের কথাও জানতে পারি—

"ইংরাজ কোম্পানি বাহাদুর অধিক ধনী হওনের অনেক পন্থা করিয়াছেন এই কলিকাতা নামক মহানগর আধুনিক কাল্পনিক বাবুদিগের পিতা কিম্বা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আসিয়া…বেতুনভুক্ হইয়া কিম্বা রাজের সাজের খাটের ঘাটের মাঠের ইটের সরদারী চৌকিদারী জুয়াচুরি পোদ্দারী করিয়া অথবা কোম্পানির কাগজ কিম্বা জমিদারী ক্রয়াধীন বহুতর দিবাবসানে অধিকতর ধনাঢ্য হইয়াছেন…" ('নববাবু বিলাস')।

কলকাতার শ্রীবৃদ্ধিতে এদের ঐশ্বর্য ও বাবু-বিলাস বৃদ্ধি পায়। এবং সেই প্রয়োজনে কলকাতায় যে শহুরে সংস্কৃতির সৃষ্টি হয়—পাচালী, কবিগান, যাত্রাগান, খেউড়, তরজা, টপ্পা, হাফ-আখড়াই ও বুলবুলির লড়াই প্রভৃতিতে আমরা তার রূপ দেখতে পাই;—একেই আমি 'বাবু কালচার' বলতে চেয়েছি।

কলকাতার গতিমুখর জীবনযাত্রায় শুধু এদেরই জন্ম হল না। সমস্ত বাঙলার বিলাসীদের যেমন কলকাতা আকর্ষণ করল তেমনি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করে সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠা করে, ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা করে,—শিল্পবাণিজ্যে শিক্ষায়-দীক্ষায় শতমুখী উদ্যোগে আয়োজনে—সমাজ-জীবনে ভাব-বিপর্যয়ও কলকাতা অনিবার্য করে তুলল। তাই নূতন সংস্কার নিয়ে পুরুষশ্রেষ্ঠ রামমোহন

রায়ের মত ধনাঢ্য 'দেওয়ান' (ইং ১৮১৪), স্ত্রীশিক্ষা ও প্রাচ্য-বিদ্যাচর্চায় দৃঢ়ব্রত রাধাকান্ত দেব, নবোদ্যোগী দ্বারকানাথ ঠাকুর, উন্নয়নকামী প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রমুখ পুরুষ-প্রবরেরা শতাব্দীর প্রথম পাদেই এখানে উদিত হলেন। হিন্দু কলেজে অদ্ভুত-কর্মা 'ইয়ং বেঙ্গল', আর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রমুখ যুগন্ধর পুরুষেরা কলকাতাতেই সমগ্র ভারতবর্ষের জাগরণের যুগ উদ্বোধন করলেন। কলকাতার এই মহৎ সাধনাতে বাঙলা সাহিত্যেও আধুনিক যুগ জন্ম লাভ করল—বিষয়বস্তু নতুন হল, পরিধি বিস্তৃত হল, চিত্ত প্রবুদ্ধ হল।

॥ ৩ ॥ ভাব-বিপর্যয়

সমাজ-সংঘাতের ফলে ভাব-সংঘাত অনিবার্য, আর ভাব-সংঘাতই সাহিত্যের প্রবাহে প্রত্যক্ষভাবে নূতন বেগ সঞ্চার করে। ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার পক্ষে আবার এ কথাটাই বিশেষ রূপে সত্য। কারণ সে ব্যবস্থায় শাসক-শক্তি বাস্তব ক্ষেত্রে পরাধীনদের আত্মপ্রতিষ্ঠ হতে দেয় না—অথচ মানসিক ক্ষেত্রে পরাধীন-দের সম্পূর্ণ বাধা দিতেও পারে না। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভারত-বাসীর, বিশেষ করে আবার বাঙালীর, চোখের ঠুলিও বৈদেশিক শাসন সাহায্যেই খুলে যেতে লাগল। এবং, একবার তা খুলে যাবার পরে সাধ্য কি সে চোখে কেউ ঠুলি পরিয়ে দেয়? ইং ১৮০০-এর থেকে ১৮৫৭-এর মধ্যে বাঙালীর ভাবনেত্রই শুধু খুলল না, তার রসানুভূতিও ক্রমে জাগ্রত হল।

মুদ্রাযন্ত্র পূর্বেই এসেছিল। বাঙলা অক্ষরে বাঙলা বই ছাপা হয়েছিল উইল-কিন্‌স্ পঞ্চানন কর্মকারের কৃতিত্বে হালহেডের ব্যাকরণ (A Grammar of the Bengali Language) ইং ১৭৭৮ অব্দে, হুগলী থেকে বাঙলা অক্ষরে মুদ্রিত সম্পূর্ণ গ্রন্থ (Regulations for the Administration of Justice in the Courts of Dewanee Adalat) আইনের বই ইম্পের কোড কলকাতা থেকেই ছাপা হয়েছিল ১৭৮৫ অব্দে। কলকাতায় প্রথম প্রেসে প্রথম ইংরেজী সংবাদপত্র হিকির 'বেঙ্গল গেজেট' (১৭৮০) ছাপা হতে থাকে। এদিকে উইলকিন্‌সের ইংরেজী অনুবাদ 'ভগবদ্গীতা'ও বারাণসী থেকে ১৭৮৫তে প্রকাশিত হয়। আর ১৭৯৯এর ডিসেম্বর মাসে ফর্‌স্টারের বাঙলা-ইংরেজী শব্দ-সংগ্রহ (A Vocabulary) প্রথম ভাগ ছাপা হয়েছিল। তারপর ১৮০০ অব্দে শ্রীরামপুরে শ্রীরামপুর মিশনেরও মুদ্রাযন্ত্রের কাজ শুরু হয়, আর কলকাতায়

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। আরবী, ফারসি, সংস্কৃত ছাড়াও হিন্দুস্থানী, বাঙলা, তেলুগু, মারাঠী, তামিল, কানাড়ি ভাষা শিক্ষার ও পাঠ-গ্রন্থ প্রণয়নের আয়োজন চলল। ১৮০০ থেকে ইং ১৮১৫ পর্যন্ত কালটা বাঙলা লেখার এই প্রথম পর্বের কাল। তার পূর্বেই বেনিয়ান-মুৎসুদ্দির দল ইংরেজী শব্দ মুখস্থ করছিল, মুন্সি-দেওয়ানরা (যেমন, রামরাম বসু, তারিণীচরণ মিত্র প্রভৃতি) ইংরেজী শিখছিল। শেরবোর্ন স্কুল, কানিংহামের ক্যালকাটা অ্যাকাডেমি, ড্রুমণ্ডের ধর্মতলা অ্যাকাডেমির মত ইংরেজী শেখার স্কুলও স্থাপিত হয়েছিল। ব্যবসায়ের খাতিরে ইংরেজী শেখা চল্‌ত। রাধাকান্ত দেব ও রাম-মোহনের মত উদ্যোগী পুরুষরা বৈষয়িক কাজের ইংরেজী বিদ্যা ছাড়িয়ে ইংরেজীর জ্ঞান-বিজ্ঞানের রাজ্যে সাগ্রহে প্রবেশ করেছিলেন। ১৮১৪ অব্দের শেষদিকে রামমোহন কলকাতায় এসে বাস করতে লাগলেন; ১৮৩০এর নভেম্বর পর্যন্ত তিনি কলকাতায় অধিষ্ঠিত থাকেন। ১৮১৫ অব্দে তাঁর 'বেদান্তগ্রন্থ' প্রকাশের সঙ্গেই এই 'দ্বিতীয় পর্যায়' বা রামমোহনী কালের সূচনা হল। ১৮১৩ অব্দে অবশ্য শিক্ষার জন্ম সরকারী ব্যয়ের প্রস্তাব স্থির হয়; খ্রীষ্টান মিশনারিরাও খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের স্বাধীনতা পান; সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে বাঙলা স্কুল খুলে বসেন, আর ধর্মপুস্তিকা প্রভৃতি লিখে নামেন মসীযুদ্ধে। বাঙালী হিন্দু প্রধানরা তখন ইংরেজী শিক্ষা ও ইংরেজী-স্কুলের প্রয়োজন বেশি অনুভব করেছিলেন। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন সে দিনের মহাপ্রাণ ইংরেজ ডেভিড হেয়ার—শিক্ষিত বাঙালীর চিরদিনের নমস্য—আর সম্ভবতঃ ইংরেজের বিস্মৃত গৌরব। সুপ্রীম কোর্টের জজ স্যর এড্‌ওয়ার্ড হাইড্ ঈষ্ট-কে পুরোধা করে এই হিন্দু নেতারা হিন্দু কলেজ খুলতে এগিয়ে যান (ইং ১৮১৭ অব্দে)। মিশনারিদের শ্রীরামপুর কলেজ (১৮১৮) ও বিশপস্ কলেজ স্থাপিত হল (১৮২০); অন্যদিকে রামমোহন রায় ও ডেভিড হেয়ার নিজেরাও ইংরেজি শিক্ষার পাঠশালা খোলেন। সংবাদপত্র প্রকাশের কাজে নামলেন দু'তরফ ছেড়ে তিন তরফ—খ্রীষ্টান মিশনারি (সমাচার দর্পণ, ইং ১৮১৮-১৮৪১), হিন্দু প্রতিপক্ষ (সম্বাদ কৌমুদী, ইং ১৮২১ সমাচার চন্দ্রিকা, ইং ১৮২২) আর প্রগতিকামী হিন্দু রামমোহন ('সম্বাদ কৌমুদী'র পরে 'ব্রাহ্মণ সেবধি', প্রথম তিন সংখ্যা, ইং ১৮২১)। সমাজ ও সংস্কৃতির জগতে এভাবে খ্রীঃ ১৮১৫ থেকে ১৮৩০-এর মধ্যে অনিবার্য সংঘাত বাধল—নিরাকার ব্রহ্ম বনাম সনাতন হিন্দুধর্মের তর্ক, হিন্দুত্ব বনাম

খ্রীষ্টধর্মের তর্ক, শাস্ত্র বনাম যুক্তির তর্ক, রামমোহনই শুরু করলেন বাঙলায়, ইংরেজীতে, ফারসিতে, হিন্দুস্থানীতেও। ১৮১৫ থেকে ১৮৩০ (রামমোহনের বিলাত যাত্রা) পর্যন্ত রামমোহন এই সাংস্কৃতিক জগতের আসর জুড়ে ছিলেন। আর শুধু তর্কেও তার সমাপ্তি ঘটল না।—ডিরোজিও, ডেভিড হেয়ারের প্রেরণা, সত্য ও স্বাধীনতার নামে 'ইয়ং বেঙ্গলের' বিদ্রোহে আত্মপ্রকাশ করল (১৮৩০এর পরেই)। ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকরে'র (প্রথম প্রকাশ—২৮শে জানুয়ারি, ১৮৩১) মতই 'ইয়ং বেঙ্গলের' 'এনকোয়ারার' ও 'জ্ঞানান্বেষণ'কে (প্রথম প্রকাশ—১৮ই জুন, ১৮৩১) এজন্য এ-কালের মুখপত্ররূপে গণ্য করতে পারি। ক্রমে ইংরেজী শিক্ষার সপক্ষে মেকলের মন্তব্য (ইং ১৮৩৫) 'ওরিয়েন্টা-লিস্ট বনাম অ্যাঙলিসিস্টদের' সংঘাতের অবসান ঘটাল। ঢাকা, মেদিনীপুর, বরিশালে নূতন ইংরেজী স্কুল স্থাপিত হল। মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হওয়ায় চিকিৎসা বিজ্ঞানের কেন্দ্র তৈরী হল। বেণ্টিঙ্কের (পরে হার্ডিঞ্জের, ইং ১৮৪৪) সরকারী কর্মে শিক্ষিতদের নিয়োগনীতি এই শিক্ষিত শ্রেণীর জন্য নূতন প্রতিষ্ঠা-পীঠ তৈরী করল। চাকুরে মধ্যবিত্ত এবার সমাজে একটা শক্তি হয়ে উঠতে পারবে। আর আইন আদালতে ফারসির স্থলে বাঙলার প্রবর্তন (১৮৩৮) যেমন বাঙলা ভাষার জন্মাধিকার স্বীকার করল, তেমনি শিক্ষার ভাষা হিসাবে বাঙলার পরবশ্যতাও মেকলের সময় থেকেই সুস্থির হয়ে রইল। 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র প্রতিষ্ঠায় (১৮৩৯) ও 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র প্রকাশে (১৮৪৩) বাঙালী সমাজে ও বাঙলা সাহিত্যে সমাজ-সংস্কার ও স্বদেশাভিমানের ভাবোন্মাদনা সুস্থির রূপ পরিগ্রহ করতে থাকে। বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমারের হাতে বাঙলা ভাষা জ্ঞান-বিজ্ঞানের এবং দেবেন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ বসুর হাতে আত্ম-মর্যাদাময় ভাব-কল্পনার বাহন হয়ে উঠল—যুক্তির সঙ্গে রসানুভূতির ক্রমোন্মেষ ঘটছিল বিদ্যাসাগর ও দেবেন্দ্রনাথের গদ্য ভাষায়। প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদারের 'মাসিক পত্রিকা' (১৮৫৪), এই ভাষা ও ভাব অন্তঃপুরে পৌঁছে দেবার প্রয়াস। বিদ্যাসাগরের শিক্ষানীতি ও শিক্ষা-প্রয়াস, বিদ্যালয় স্থাপন, উডের শিক্ষা-বিষয়ক পত্র বা ডেস্‌প্যাচ (১৮৫৪) ও বর্তমান সরকারী শিক্ষা ব্যবস্থার গোড়াপত্তন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা (১৮৫৭), রাজনীতি ক্ষেত্রে বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সোসাইটি নামক দৃঢ় সংগঠনের প্রকাশ (১৮৪৩), তথাকথিত ব্ল্যাক বিলের সপক্ষে ও সনদ পরিবর্তনের কালে (১৮৫৩) রামগোপাল ঘোষ,

হরিশ মুখুজ্জে প্রভৃতির আন্দোলন, বিদ্যাসাগরের প্রবল পুরুষকারের চরম সাফল্য বিধবা-বিবাহ আইন পাশ করা (ইং ১৮৫৬), রেল ও টেলিগ্রাফের বিস্তার,—এসব বাঙলা দেশে যে ভাব-স্রোতকে সুপ্রবাহিত করে তোলে তাতে বুদ্ধির মুক্তিই শুধু সুদৃঢ় হয় নি, মুক্তির বুদ্ধিরও সূচনা হয়। একই কালে বাঙালী বহু বহু যুগের উত্তরাধিকার লাভ করল—রিনাইসেন্স, রিফর্মেশন, ফরাসী বিপ্লবের সঙ্গে শিল্প বিপ্লবের প্রবল তাড়না,—বেদান্তের সঙ্গে বাইবেল, শেক্স্‌পীয়রের সঙ্গে কালিদাস, বেকন ও হিউম, ও বেন্থাম টম্ পেনের সঙ্গে টডের রাজস্থান ও উপনিষদের ব্যাখ্যান। এ সত্য তখন প্রত্যক্ষ—অশোক আকবর যা' পারেন নি তা' সম্ভব হয়েছে, ইংরেজ কোম্পানি এক-রাজ্য-পাশে ভারতবর্ষকে একত্রবদ্ধ করেছে। শক-হূন-পাঠান-মোগলের যা' সাধ্য হয় নি বিলিতি ধনিকতন্ত্রের তা' সাধ্য হয়েছে—উপড়ে ফেলেছে অচল অনড় পল্লীসভ্যতার বনিয়াদ, এনে ফেলেছে 'মানি ইকোনমি' ও চলন্ত পৃথিবীর সঙ্গে 'বাজারের' যোগাযোগ। কবীর নানক চৈতন্যের কাছে যা' অভাবনীয় ছিল তা' সম্ভব করেছে মুদ্রাযন্ত্র ও রেলপথ,—টেক্‌নোলজি ও ইডিয়োলজি মুক্তি দিয়েছে মানুষের চৈতন্যকে, মানবতাবাদ অবশেষে আবির্ভূত হচ্ছে। প্রস্তুতি সম্পূর্ণ।

॥ ৪ ॥ পথ ও প্রতিষ্ঠান

এই প্রস্তুতির কালটা অবশ্য কেবল সাহিত্যের পক্ষেই প্রস্তুতির কাল নয়,—আধুনিক যুগের বাঙালী-জীবন ও সংস্কৃতির পক্ষেও প্রস্তুতির কাল। সেই প্রস্তুতির প্রথম পথ হয় শিক্ষা, তার প্রধান রূপ দেখা দেয় সংঘাতে। ধর্ম, সমাজ ও জীবনের মৌলিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রে এ সংঘাত তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে ওঠে। আর সংঘাতের ফলে গড়ে উঠতে থাকে নতুন-নতুন প্রতিষ্ঠান। উনবিংশ শতাব্দীর এই প্রথমার্ধের বিভিন্ন দিকের সে সব আয়োজন তাই লক্ষণীয়:—

বাঙলার মুদ্রাযন্ত্র (১৮০০) দিয়েই যুগের উদ্বোধন। কিন্তু (ক) ইংরেজী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বা স্কুল-কলেজ ও স্কুল-সোসাইটি (১৮১৮), স্কুল বুক সোসাইটি (১৮১৭) প্রভৃতিই নূতন শিক্ষার প্রথম ও প্রধান কেন্দ্র হয়। (খ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরেই ধর্মালোচনার প্রতিষ্ঠানের স্থান—মিশনারিরা ছাড়া রামমোহন ('আত্মীয় সভা', ইং ১৮১৫ সনে স্থাপিত), রাধাকান্ত দেব, ভবানীচরণ

বন্দ্যোপাধ্যায় ('ধর্মসভা') তার প্রধান কর্মকর্তা। (গ) তার সঙ্গে এল প্রচার-প্রতিষ্ঠান, বিশেষ করে বাঙলা সংবাদপত্র—'দিগ্‌দর্শন', 'বেঙ্গল গেজেট', 'সমাচার দর্পণ' (ইং ১৮১৮)। সংবাদপত্র ও পুস্তক-পুস্তিকার মাধ্যমেও সংঘাত জমে উঠল। এর পরেই (ঘ) লোকমত সংগঠনের ও পাব্লিক ম্যুভমেণ্টের আন্দোলনের পথও আবিষ্কৃত হল। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা খর্ব করার (১৮২৩) বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলনের বাহন হল সভা-সমিতি। গণ দরখাস্ত তার প্রকরণ (বা টেক্‌নিক্), 'অ্যাঙলিসিস্ট বনাম ওরিয়েণ্টালিস্ট'-দের শিক্ষাবিষয়ক সংঘাতে ও ১৮৩৩-এর সনদ পরিবর্তনের ব্যাপারেও তা দেখা গেল। এভাবে সভা-সমিতি ও আবেদন-নিবেদন গণ-আন্দোলনের একটা পরিচিত পদ্ধতি হয়ে গেল। (ঙ) পঞ্চম প্রকাশ ডিরোজিওর 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন' বা 'অ্যাকাডেমিক ইনস্টিটিউশন' (ইং ১৮২৮এর পূর্বেই প্রবর্তিত)। তা' প্রথম জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা সভা, বলতে পারি শিক্ষিত বাঙালীদের 'সংস্কৃতি-সভা'র গোড়াপত্তন।* অর্থাৎ শিক্ষিত শ্রেণী এবার শৈশব কাটিয়ে কৈশোরে পদার্পণ করছে—বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের যুগ এবার আসছে।

বলা বাহুল্য, এ সবই হচ্ছে নূতন ভাব-সংঘাতের প্রধান বাহন। না হলে বরাবরই এদেশে পণ্ডিত সভা ছিল, পণ্ডিতেরা প্রাচীন ধারায় বিচার করতেন। ইংরেজরা অষ্টাদশ শতকেই কলকাতায় নিজেদের সংস্কৃতি-প্রতিষ্ঠানও খাড়া করেন,—যথা, সভা, সংবাদপত্র, থিয়েটার ইত্যাদি। কলকাতার বেনিয়ান, মুৎসুদ্দি ও বড় মানুষেরা সে সব ইংরেজী কেতার সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে (যেমন, ১৮২৯এর পূর্ব পর্যন্ত এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলে) স্থান না পেলেও বিলাতী বিলাস-ব্যসনের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে গৌরব বোধ করতেন। দেশীয় বুলবুলির লড়াই-এর মতই ইংরেজের প্রবর্তিত ঘোড়দৌড়, জুয়াখেলা প্রভৃতিও তাঁদের ব্যসন হয় (George W. Thomsonএর *The Stranger in India*, London, 1843এর সাক্ষ্য দ্রষ্টব্য)। কিন্তু এ হল 'বাবুর' দলের আয়োজন; তাঁদের সাংস্কৃতিক প্রকাশ তখনকার কবিওয়ালাদের রস-নিবেদনে পাওয়া যায়। কিন্তু সংঘাতমূলক ওসব শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ

---

* শ্রীযুক্ত বিনয় ঘোষ এই Learned Societyর বাঙলায় নাম দিতে চান 'বিদ্বৎ-সভা' (বিশ্বভারতী, ১২শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা)। আপত্তি নেই। তবে কানে ঠেকে বলে "Learned Society" বলতে শুধু সংস্কৃতি-সভাই বলা হল।

ছিল নূতন ভাবাদর্শের গদ্য-রচনায়, থিয়েটার-ব্যবস্থায়, নূতন সংস্কৃতি-প্রয়াসের। রিনাইসেন্সের যুগের সাহিত্য ও সমাজ-সংস্কারের প্রস্তুতি এসবে সুসম্পন্ন হয়।

এসব আয়োজন-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সাহিত্য ও সংস্কৃতির সম্পর্কটা তাই আকস্মিক নয়, আন্তরিক। এ পর্বের ভাব-বিপর্যয়ের কেন্দ্রস্থানীয় এসব প্রতিষ্ঠানের পরিচয়ও সংক্ষেপে সেরে রাখা ভাল। কারণ, সাহিত্য পরিচয়ে বারে বারে এদের দান স্বীকার করতে হবে।

(ক) **শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: (১) ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ** (১৮০০) থেকে আধুনিক যুগের বাঙলা রচনার আরম্ভ। কিন্তু ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ দেশীয় লোকদের শিক্ষাদানের জন্ম স্থাপিত হয় নি, তাদের শিক্ষাদান করেও নি। কোম্পানির নবনিযুক্ত ইংরেজ কর্মচারীদের দেশীয় ভাষাসমূহ, আইন-কানুন, আচার-নীতি, সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়ে সুদক্ষ শাসক তৈরী করাই ছিল এই কলেজ-প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য। কথাটা আর একবার স্মরণ করা দরকার—এদেশে শিক্ষা-ব্যবস্থা চালু করা কোম্পানির মোটেই অভীষ্ট ছিল না। বার্ক-এর বক্তৃতা থেকেও আমরা জানি—শিক্ষা প্রবর্তিত করলে যে কোম্পানির শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে দেশবাসী সচেতন হয়ে উঠবে, এ বোধ কোম্পানির কর্তাদের খুবই তীক্ষ্ণ ছিল; ভাষাটা হল এই—The most absurd and suicidal measure that could be devised। এ জন্যই তারা মিশনারিদের প্রচারের ও শিক্ষা দানেরও বিরোধী ছিল। 'কলকাতা মাদ্রাসা' (ইং ১৭৮১) ও 'সংস্কৃত কলেজ' (বারাণসী ১৭৯১) স্থাপন করে কোম্পানি চেয়েছিল নিজেদের কাজী, 'জজ পণ্ডিত' যোগাড় করতে ও দেশকে মধ্য যুগের আওতায় ঘুম পাড়িয়ে রাখতে। তবু রাজ্য যখন স্থাপিত হল দক্ষ শাসকও তখন চাইখ তাই ওয়েলেস্‌লি ইংরেজ শাসক শিক্ষার্থীদের জন্য কলেজ প্রতিষ্ঠা করলেন—(নিজের শ্রীরঙ্গপত্তম বিজয়ের দিন ৪ঠা মে, ইং ১৭৯৯ তারিখটির সঙ্গে জড়িত করে, এই কলেজের প্রতিষ্ঠা-দিন তিনি গণিত করলেন—৪ঠা মে, ইং ১৮০০) এবং দেশের ভাবী শাসক ইংরেজ ছাত্রদের জানালেন—"God-like bounty to bestow expansion of intellect." তাই, অন্যান্য ভাষার সঙ্গে এই কলেজে বাঙলা জানার ও বাঙলা বই লেখার সূচনা হল উইলিয়ম কেরির অধ্যক্ষতায় (মে, ইং ১৮০১। ইং ১৮০৭ পর্যন্ত এই কলেজের প্রাধান্য ছিল; পরে বিলাতেই কোম্পানির রাইটারদের শিক্ষার

প্রধান ব্যবস্থা হয়)। এসব বই ইংরেজদের পড়ার জন্যেই লিখিত ও মুদ্রিত ; বইএর মূল্যও তাই বেশি ছিল। সাধারণ্যে সে সব বইএর প্রচার তাই সামান্যই হয়েছিল। তথাপি এরূপ ইংরেজ শাসকদের বাঙলা শেখার তাগিদেই বাঙলা দেশে বাঙলা গদ্যের ও শিক্ষামূলক বাঙলা গ্রন্থ রচনার সূত্রপাত হল। রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' (ইং ১৮০১), কেরির 'বাংলা ব্যাকরণ' (ইং ১৮০১) থেকে হরপ্রসাদ রায়ের 'পুরুষ পরীক্ষা' (ইং ১৮১৫) পর্যন্ত কালটাকে 'বাঙলা গদ্যের প্রথম যুগ' বলা অন্যায় নয়। কিন্তু সেটা বাঙালীর শিক্ষা-ব্যবস্থার কাল নয়, বাঙালীর পাঠের জন্য গ্রন্থ প্রণয়নেরও কাল নয়। ফোর্ট উইলিয়মের পণ্ডিতদের লেখা বই তখনকার বাঙালী বিশেষ পড়তেও পায় নি। এমন কি, ইং ১৮১৩ সালের নূতন সনদে কোম্পানি শিক্ষার জন্য যে এক লক্ষ টাকা বার্ষিক ব্যয় করতে স্বীকৃত হয়, ইং ১৮২৩এর পূর্বে সে উদ্দেশ্যে তা প্রয়োগের কোনো চেষ্টাই আরম্ভ হয় নি। ১৮২৩এ স্থাপিত হয় জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইন্‌স্ট্রাক্‌শন নামক সরকারী শিক্ষা-দপ্তর—সরকারের পক্ষ থেকে শিক্ষা বিষয়ে প্রথম প্রয়াস।

(২) কিন্তু বাঙালীর শিক্ষালাভের চেষ্টা বাঙালীই তার পূর্বে আরম্ভ করে দিয়েছে। অবশ্য তা ছিল প্রধানত ইংরেজী শিক্ষার চেষ্টা—দায়ে পড়ে ও ব্যবসায়ের তাগিদে। স্বীকার করা উচিত যে, তার পূর্বে অষ্টাদশ শতকের অন্তত শেষার্ধে দেশে প্রচলিত শিক্ষার দুর্দিন এসেছিল। সে সময়ে গ্রামের পাঠশালায় দাগা-বুলনো ও শুভঙ্করী চলত। দেশে দু'-দশজন নৈয়ায়িক স্মার্ত বা জ্যোতিষী ও বৈয়াকরণ পণ্ডিত নিশ্চয়ই ছিলেন। কিন্তু চতুষ্পাঠীতে সচরাচর বিদ্যার্জন যা হত তাও শোচনীয়। ব্রাহ্মণদের মধ্যেও সংস্কৃতচর্চা প্রায় উঠে যাচ্ছিল। আর বাঙলায় পণ্ডিতরা বানানে 'ষত্ব', 'ণত্ব'-এর কোন ধারই ধারতেন না।—এসব বিষয়ে সমসাময়িক প্রমাণের অভাব নেই (দ্রষ্টব্য, ডঃ সুশীলকুমার দে'র Bengali Literature, pp. 52-54)। বিষয়ী লোকেরা ফারসি পড়ত, এবং মোটামুটি তা ভালোই শিখত। ইংরেজের ভাগ্যোদয়ে কলকাতা অঞ্চলের চতুর লোকেরা নাকি ১৭৬৭ থেকেই ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা করে (পাদ্রি লঙ-এর The Hand-Book of Bengali Missions-এ উল্লেখিত—ডঃ দে'র বই, p. 51)। ভবানীপুরের জগমোহন বসুর স্কুলই আদিতে স্থাপিত হয়েছিল ১৭৯৩তে। বাঙালীরা ব্যবসা পত্রের জন্য ইংরেজ

মাস্টারদের নিকট ইংরেজী শিক্ষা করত ১৭৯৬তে। সে সব ইংরেজী-শেখার মজার দৃষ্টান্ত রাজনারায়ণ বসু দিয়েছেন। শেরবোর্ন কলেজ, ক্যালকাটা অ্যাকাডেমি, ধর্মতলা অ্যাকাডেমিতেও ভাগ্যবান্ ও বিষয়ী বাঙালী সন্তানরা ইংরেজী শিক্ষা লাভ করত।

(৩) তথাপি সে সময়ে শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করতে পারত ফিরিঙ্গি ছাড়া দু'চারজন বড় লোক ও চতুর ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর বাঙালী। কলকাতার মধ্যবিত্ত সন্তানরা আধুনিক শিক্ষালাভের যথার্থ সুযোগ পেল ১৮১৭তে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার কাল থেকে। ইংরেজী শিক্ষালাভ করেই মধ্যবিত্ত শ্রেণী প্রথম অভিজাতদের সমকক্ষ বলে গণ্য হল (যেমন, তারাচাঁদ চক্রবর্তী রসিককৃষ্ণ মল্লিক, প্যারীচাঁদ মিত্র, রাধানাথ শিকদার, রামগোপাল ঘোষ; কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি, পরে বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি)। অবশ্য ১৮৩০ পর্যন্ত কিম্বা ১৮৫০ পর্যন্ত রামমোহন, রাধাকান্ত দেব দ্বারকানাথই তাঁদের 'পেট্রন' বা নেতা। হিন্দু কলেজের প্রথম ও দ্বিতীয় ('ইয়ং বেঙ্গল') পর্যায়ের ছাত্রদের পরে মধুসূদন, ভূদেব, রাজনারায়ণ বসুর পূর্বেই বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি লেখকগণ সমাজে শীর্ষস্থানীয় হয়ে দাঁড়ান। রামগোপাল ঘোষ, হরিশ মুখুজ্জে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সর্বমান্য হন। অর্থাৎ তত্ত্ববোধিনীর প্রভাব কালে শিক্ষিত শ্রেণী এই ঔপনিবেশিক সমাজের প্রাধান্য আরম্ভ করেন —যতীন্দ্রমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁরাও হন সমাজের নূতন মুখপাত্র।

প্রধানত যে শিক্ষার মধ্য দিয়ে এই শিক্ষিত শ্রেণীর উদ্ভব তার বাহন ছিল ইংরেজী। হিন্দু কলেজ প্রভৃতিতে বাঙলা ভাষা প্রভৃতি শিক্ষার ব্যবস্থা থাকলেও ইংরেজীই ছিল বাহন; কার্যত বাঙলা কতকটা অবহেলিত হত। অবশ্য অল্প পরেই তার প্রতিবিধানও আরম্ভ হয়, বাঙলা শিক্ষার ওপরও গুরুত্ব দেওয়া হতে থাকে—স্কুল সোসাইটির পরিচালিত পটলডাঙায় ইস্কুলের মত শতখানেক পাঠশালায়। অন্যদিকেও বাঙলা ভাষার অনুশীলন আরম্ভ হয়—প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত 'গৌড়ীয় সমাজের' মত সভায়। কিন্তু প্রথম থেকেই ইংরেজী অপেক্ষা বাঙলার মাধ্যমে শিক্ষাদানের চেষ্টা যাঁরা করেন তাঁরা খ্রীষ্টান মিশনারি। কারণ, ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে তাঁদের প্রধান লক্ষ্যস্থল ছিল ভদ্রলোক বা মধ্যবিত্ত নয়, বরং অবজ্ঞাত সাধারণ নর-নারী।

(৪) ইং ১৮১৭ সালের ২০শে জানুয়ারি কুড়িজন ছাত্র নিয়ে হিন্দু কলেজের কাজ আরম্ভ হয়। এ কথা বার বার বলবার প্রয়োজন নেই যে, এদিন থেকেই বাঙালীর শিক্ষার মোড় ঘুরল, মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণীর জন্ম সূচিত হল. নূতন জীবনাদর্শের সাধনা আরম্ভ হল। এর পরে আরও কলেজ হয়—মিশনারিদেরও সেদিকে উদ্যোগ দেখা গেল। এদিকে ১৮২৩ থেকে হিন্দু কলেজে বিজ্ঞান শিক্ষার যন্ত্রপাতিও আসে; বিজ্ঞান শিক্ষার ফলও সহজে অনুমেয়। ১৮২৬এর মে মাস থেকে ১৮৩১, ২৫শে মার্চ পর্যন্ত ডিরোজিও ছিলেন এ স্কুলের শিক্ষক। বুর্জোয়া জীবনাদর্শের শ্রেষ্ঠ প্রতীক ডিরোজিও, বাঙলা দেশের 'ইয়ং বেঙ্গলের' তিনি মন্ত্রগুরু। তাঁরই প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হন সেদিনের হিন্দু কলেজের ছাত্র (রেভাঃ) কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়. রসিককৃষ্ণ মল্লিক, দক্ষিণানন্দ (দক্ষিণারঞ্জন) মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, শিবচন্দ্র দেব, মহেশচন্দ্র ঘোষ. প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার। ১৮৩০ থেকে ১৮৪৩ পর্যন্ত এঁরা বাঙালী সমাজকে মথিত করেন। তার পরেও ১৮৫৮ পর্যন্ত বাঙালী জীবনের বহু ক্ষেত্রে ডিরোজিওর শিষ্যরাই দিকপাল। ইউরোপের শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়ের সমতুল্য ছিল (ইং ১৮৩২) হিন্দু কলেজের ছাত্রদের সাহিত্যে ও বিজ্ঞানে অধিকার। রাজনারায়ণ বসু আত্মজীবনীতে সেদিনের হিন্দু কলেজের পাঠ্য বিষয়ের যে তালিকা দিয়েছেন তা' থেকে বুঝতে পারি—বিদ্যার কী প্রশস্ত বনিয়াদের উপর মাইকেল, ভূদেব, রাজনারায়ণ দাঁড়িয়েছিলেন। তাই, আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের এমন প্রশস্ত বনিয়াদ তাঁরা রচনা করতে পেরেছিলেন।

(৫) ১৮১৩র পরে খ্রীষ্টান মিশনারিরা কলকাতার চারিদিকে পাঠশালা স্থাপন করে—এ কথা পূর্বেই বলেছি। অবশ্য জন টমাস ও চার্ল'স গ্রান্টের (ইং ১৭৮৭র পর থেকে) খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের চেষ্টা.সার্থক সূচনায় পরিণত হয় উইলিয়ম কেরির আগমনে (১৭৯৩)। ওয়ার্ড, মার্শম্যান, এদেশে আসেন ১৭৯৯তে। শ্রীরামপুরে ব্যাপটিস্ট মিশন ও ছাপাখানা (১৭৯৯) যখন গড়ে উঠল, তখন কেরির ঘোরাফেরা শেষ হল (জানুয়ারি, ইং ১৮০০)। ১৮১৩ পর্যন্ত তাঁদের কিন্তু ধর্ম প্রচারে অধিকার ছিল না। ইং ১৮১৩এর পরে মিশনারিরা ধর্মগত ও রাজনৈতিক সংকীর্ণতা বশেই দেশীয় লোকদের ইংরেজী শিক্ষায় উৎসাহ দিতেন না। শাসক ইংরেজের বরাবরই এ দেশে শিক্ষাবিস্তারে

সংশয় ও আপত্তি ছিল। হিন্দু কলেজ স্থাপনের পরে অবশ্য শ্রীরামপুরের কলেজ (১৮১৮) ও বিশপস্ কলেজ (১৮২০, খ্রীষ্টানদের জন্য) এইরকম ইংরেজী উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠান হয়। আর ডাফ সাহেব এসে কলেজ খুললেন ১৮৩০এ। তাঁর প্রভাবে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় খ্রীষ্টান হন ইং ১৮৩৪এ, মাইকেল ১৮৪৩এ, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর আরও পরে। হয়তো 'মিশনারি গোঁড়ামির' ফলেই 'খ্রীষ্টানী বাঙলা' বাঙালীর বাঙলা হল না। বাঙলা বাইবেল বাঙালীর চিত্তকে স্পর্শও করল না, এবং খ্রীষ্টানী শিক্ষানীতি (বাঙলা তার বাহন হোক্ কি ইংরেজী তার বাহন হোক্) নয়া বাঙলার প্রস্তুতিতে বা সৃষ্টিতে বিশেষ কোন সহায়তা করতে পারল না। উল্টে বরং সেদিকে সহায়তা করল সেই শিক্ষা— যার বাহন মূলত ইংরেজী হলেও—যা পাশ্চাত্ত্য জীবনের ঐহিক দৃষ্টি, বৈজ্ঞানিক চেতনা ও মানবতাবাদের বার্তা নিয়ে এল। তারই প্রথম পীঠস্থান হিন্দু কলেজ। তারাচাঁদ চক্রবর্তীর মত ছাত্ররাই বাঙলা এবং সংস্কৃতেরও অনুশীলনে অগ্রগামী হন ;—রামমোহন-রাধাকান্তদেবের পরে 'ভারতবিদ্যা'র পুনরাবিষ্কারেও তাঁরাই কর্মী।

(৬) বাঙালীর জন্য ইংরেজী ও বাঙলা পাঠ্য রচনায় যে প্রতিষ্ঠান প্রথম গঠিত হয় তা হচ্ছে 'কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি' (১৮১৭); আর এ সমিতিরই পরিপূরকরূপে বাঙালীর পাঠশালা সংস্কার করে আদর্শ বিদ্যালয় গঠন করবার মানসে গঠিত হয় 'স্কুল সোসাইটি' (১৮১৭ থেকে ১৮৩৩)। রাজা রাধাকান্ত দেব দু'সমিতিরই একজন প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন। ডেভিড হেয়ার ছিলেন স্কুল সোসাইটি'রও তেমনি কর্মকর্তা। দু'জনাই আবার হিন্দু কলেজেরও পরিচালকদের মধ্যে নেতৃস্থানীয়। ডেভিড হেয়ার নিজে সিমলা স্কুল, আরপুলি পাঠশালা (১৮১৮-১৮১৯) ও (প্রথম দিকে) পটলডাঙা স্কুল চালাতেন। সমিতির স্কুল থেকে ছাত্ররা উত্তীর্ণ হয়ে হিন্দু কলেজে পড়তে যেত। হিন্দু কলেজে উৎকৃষ্ট ছাত্ররা আসত স্কুল সোসাইটির পরিচালিত পটলডাঙা স্কুল থেকে। স্কুল বুক সোসাইটি ইংরেজী, বাঙলা ও ফারসি তিন ভাষাতেই সাহিত্য, গণিত, ব্যাকরণ, ইতিহাস, ভূগোল, জ্যোতিষ ও বিজ্ঞানের বিবিধ বিষয়ের পাঠ্য পুস্তক রচিত ও প্রকাশিত করেন।

পটলডাঙার স্কুলের পরেই রামমোহন রায়ের অ্যাংলো-হিন্দু স্কুল ; জগৎমোহন বসুর ভবানীপুরের ইউনিয়ন স্কুল অবশ্য পুরাতনের নবায়ন। রামমোহন রায়ের

স্কুলে ইংরেজী শিক্ষার সঙ্গে নীতিশিক্ষা ও ধর্মশিক্ষার ওপর জোর দেওয়া হত। এর পরে (১৮২৯এ) স্থাপিত হয় গৌরমোহন আঢ্যের ওরিয়েন্টাল সেমিনারি। তার পরে স্থাপিত হয় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা (১৮৪০) ও হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয় (ইং ১৮৪৫)—খ্রীষ্টানীর বিরুদ্ধে হিন্দু শিক্ষিতদের তা প্রতিরোধ আয়োজন।

(৭) হিন্দু কলেজের পরে মিশনারিদের শ্রীরামপুর কলেজ (১৮১৮) ও বিশপ্‌স্ কলেজ (১৮২০), সরকার পরিচালিত সংস্কৃত কলেজ (১৮২৪)ও কলিকাতা মাদ্রাসায়ও (১৮২৯ থেকে) ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। (ডাফ্ সাহেবের জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনষ্টিটিউশন ১৮৩০এ ও ডাফের 'ফ্রি চার্চ কলেজ' স্থাপিত হয় ১৮৪৩এ।) ১৮৩৫এ অবশ্য সরকারী ও বেসরকারী স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠার ধূম পড়ে গেল ('বাংলার উচ্চ শিক্ষা'—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল পৃঃ ২৭)। মেকলের আধিপত্যে ইংরেজী শিক্ষার জয় তখন সুস্থির হয়। এমন কি ২০ বৎসর ধরে স্কুল কলেজে বাঙলা শিক্ষা রীতিমত বর্জিত ও অবহেলিত হল। কিন্তু কতটুকু সফল হল মেকলের প্রত্যাশা ? কতখানি হল ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙালী 'নকল ইংরেজ', আর কতখানি 'নতুন বাঙালী' ? চটি-চাদরপরা পণ্ডিত বিদ্যাসাগর হলেন শ্রেষ্ঠ বুর্জোয়া (তথাকথিত) 'পাশ্চাত্ত্য' শিক্ষাদর্শের ও মানবাদর্শের প্রধান সেনানী (দ্রষ্টব্য ইং ১৮৫৪তে হ্যালিডে'র মিনিটের সঙ্গে সংযুক্ত বিদ্যাসাগরের মন্তব্য, সা. সা. চ.)। সাহেবি পোশাক সাহেবি নাম নিয়ে, বাঙালী প্রাণ মধুসূদন বসলেন মধুচক্র রচনায়—'গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।' সংঘাত না রইল তা নয় ; কিন্তু ক্রমেই বোঝা গেল—বুর্জোয়া শিক্ষাদীক্ষা খ্রীষ্টান ধর্মের দান নয়, এমনকি, পাশ্চাত্ত্য জাতিদের একচেটিয়া সম্পত্তিও নয়। পৃথিবীর সকল মানুষেরই তাতে অধিকার আছে।

এ প্রসঙ্গেই এ সমস্ত শিক্ষা প্রয়াসের অন্তর্নিহিত দুর্বলতাও লক্ষণীয়। প্রথমত, যা কিছু বাঙালী গ্রহণ করেছে, গ্রহণ করেছে উপরতলায়, ও মূলত শিক্ষাদীক্ষার ক্ষেত্রে। তাতে ঔপনিবেশিক জীবনের বাস্তবক্ষেত্রে বাঙালীর বন্ধ্যাদশা স্থায়ী হয়ে থাকছে। এ গ্রহণ তাই মাটি থেকে রস গ্রহণ নয়, আকাশের সূর্যালোকের দিকে দু'বাহু মেলে দেওয়া। দ্বিতীয়ত, বাঙালী জীবনের এই আলোড়নের ত্রিসীমানায়ও বাঙালী মুসলমান নেই। 'হিন্দু কলেজ'

(হিন্দুদের আকৃষ্ট করার জন্য এ নাম দিয়েছিলেন হয়ত ডেভিড হেয়ার) থেকে একেবারে 'হিন্দুমেলা' পর্যন্ত (১৮৬৮) এই সুদীর্ঘ প্রয়াসের মধ্যে মুসলমান বাঙালীর স্থান কী, অগ্রগামী হিন্দু নেতারাও তা' তখন ভাবা প্রয়োজন মনে করেন নি। ওহাবী মনোভাবে ক্রম-কবলিত হয়ে মুসলমান মুখপাত্রেরা ও ভারতীয় সাধারণ মুসলমানগণ প্রতিবেশী হিন্দুর মতো আধুনিক শিক্ষাদীক্ষা গ্রহণ করলেন না। বাঙালী সংস্কৃতির দিক থেকে ব্যাপারটা neither progressive nor politic। এই যুগসন্ধির ক্ষণে এভাবে হিন্দু নেতাদের চক্ষেও মুসলমান মুখপাত্ররা এদেশে 'বিদেশী' ও এদেশের সংস্কৃতিতে উদাসীন বলেই প্রমাণিত হয়ে থাকছিলেন। ১৮২৯এ যখন মাদ্রাসায় ইংরেজী শিক্ষাদানের প্রস্তাব হয় তখন কলকাতার মুসলমানরা তাতে তীব্র আপত্তি জানান—অথচ সংস্কৃত কলেজে ইংরেজী শিক্ষা ছিল হিন্দুদেরও মনঃপূত। ১৮৫৪ এদেশের শিক্ষাজগতে স্মরণীয় বৎসর—ডিরেক্টরদের শিক্ষা 'ডেস্‌প্যাচ' (সম্ভবত জন স্টুয়ার্ট মিলের রচিত) বা বিধানপত্র সে বৎসর প্রস্তুত হয়,—তার নাম দেওয়া হয় 'Charter of Indian Education'; আর এরই ফলে ইং ১৮৫৭ সালের জানুয়ারিতে স্থাপিত হয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,—কিছু পরে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় ও বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়। প্রেসিডেন্সি কলেজ (১৫ই জুন) হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সকল ছাত্রের অধ্যাপনার কাজ শুরু করে। প্রথম বারের ১০১ জন ছাত্রের মধ্যে ২ জন ছিল মুসলমান। পরবর্তী কালে পৌঁছলে আমরা দেখব—মৌঃ (নবাব) আব্দুল লতিফ ১৮৭০এও দেখেছেন মুসলমান যে তিমিরে সেই তিমিরে। বাঙলার জাগরণে মুসলমানের জাগরণ হয় নি; বাঙলার প্রস্তুতি পর্বে তার প্রস্তুতি চলেছে বিপরীত দিকে—যুগশিক্ষা, যুগধর্ম, যুগাদর্শ ছেড়ে আরব-পরিবেশে উদ্ভূত ইস্‌লামের পুরাতন শিক্ষা, ধর্ম ও আদর্শের পথে।

(খ) **ধর্ম-সংঘাত**—'হিন্দু রাজত্ব', 'মুসলমান রাজত্ব' বললেও কেউ ইংরেজ আমলকে 'খ্রীষ্টান রাজত্ব' বলে না। কারণ, ধর্ম দিয়ে আধুনিক যুগে রাজ্যের লক্ষণ স্থির হয় না। খ্রীষ্টান ধর্মের সঙ্গে ভারতবাসীর পরিচয় হয়েছিল অনেক পূর্বে মালাবারে সিরীয় খ্রীষ্টানদের আগমনে। পর্তুগীসদের আগমনে পাশ্চাত্ত্য বিশেষ করে, ক্যাথলিক খ্রীষ্টধর্মেরও, একটা দিকের পরিচয় এদেশের অনেকেই লাভ করে। দু'চার জন দোম আন্তোনিও যা'ই থাকুন, হার্মাদের

ধর্ম আমাদের মন স্পর্শও করে নি। কিন্তু ইংরেজ কোম্পানি বাণিজ্য ও লুণ্ঠনেই বেশি আগ্রহান্বিত ছিল, ধর্মপ্রচারে নয়। বুর্জোয়া বুদ্ধির বশে বরং তারা ভয় করত—ধর্ম নিয়ে ঘাঁটাতে গেলে মুনাফাতেই ঘাটতি পড়বে। খ্রীষ্টধর্মের যে বিশেষ রূপ ইংরেজ উদ্ভাবিত করে তা হচ্ছে রিনাইসেন্স-রিফর্মেশনে ধোলাইকরা খ্রীষ্টধর্ম, পলাশীর পরেও তা রাজধর্ম হল না। কারণ, কোম্পানির ধর্ম হল মূলত মুনাফায় ফাঁপান বণিক্ ধর্ম। ভারতবর্ষে বণিক্ ইংরেজের অন্য ধর্মের বা নীতির কোনো বালাই-ই ছিল না। ব্যবসা ছাড়া দেশী বা বিলিতী মেয়েমানুষ, মদ, জুয়া, ডুয়েল আর যেন-তেন-প্রকারেণ লুণ্ঠনই ছিল কাজ। দেনার দায়ে তবু দেশী মহাজন ও বেনিয়ান-পোদ্দারের কাছে তাদের টিকি বাঁধা থাকত। হিন্দুর পূজা-পার্বণে তারা যোগ দিত, কালিঘাটেও পূজা দিত। আর জুয়াখেলা থেকে জুলুমবাজি চালাতে খ্রীষ্ট ও শয়তানের নামে সমানে শপথ কাটত।

(১) ধর্মপ্রচারের নামে প্রথম নামলেন খ্রীষ্টান মিশনারিরা। ইং ১৭৮০তে জন টমাস (১৭৫৭-১৮০১) প্রথম একাজে নামেন মালদহে মুনসি রামরাম বসুকে সহায় করে। রামরাম বসু আশা দিয়েছিলেন তিনিও খ্রীষ্টান হবেন। কিন্তু কায়স্থ সন্তান সেদিকে পা দিলেন না। মিশনারি চেষ্টা যথার্থ আরম্ভ হল ১৭৯৩ থেকে, অর্থাৎ উইলিয়ম কেরি (১৭৬১-১৮৩৪) যখন এদেশে এলেন তখন থেকে। কেরির জীবন বাঙলার একালের মিশনারি ইতিহাসের প্রথম অধ্যায়। কেরির জীবন বাঙলা গদ্যেরও প্রথম অধ্যায়। স্থায়ী আস্তানা গাড়বার সুযোগ না পেয়ে টমাস ও রামরাম বসুকে নিয়ে এই কর্মবীর বাঙলা দেশের নানা স্থানে প্রথম কয় বৎসর ঘুরে বেড়ান (১৭৯৩-৯৯)। জোশুয়া মার্শম্যান (১৭৬৮-১৮৩৭), উইলিয়ম ওয়ার্ড (১৭৬৯-১৮২৩) এ সময়ে (১৭৯৯) এসে পৌছন। শেষটা দিনেমারদের অধিকৃত শ্রীরামপুরে মিশনারিগোষ্ঠী স্থান পেলেন। শ্রীরামপুর মিশনের পত্তন হল (১৮০০)। কেরি, মার্শম্যান, ওয়ার্ড—তিনজন এখানে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারে গা ঢেলে দেন।—প্রথমেই মুদ্রিত ও প্রকাশিত হল 'মঙ্গল সমাচার মাতিউর রচিত'। রামরাম বসুকে আবার এঁরা হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের কাজে লাগালেন; পদ্যে ও গদ্যে পুস্তিকা প্রকাশিত হতে লাগল। ইং ১৮০১ সালে কৃষ্ণ পাল নামে একজন হিন্দু কেরির নিকট খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়। এ কালের প্রথম খ্রীষ্টান এই কৃষ্ণ পাল।

ইং ১৮১৩র পরে মিশনারিরা লাইসেন্স নিয়ে ধর্মপ্রচারের অধিকার পেলেন। স্বয়ং কোম্পানিও 'কলকাতার বিশপ' প্রভৃতি যাজকাচার্যের পদ সৃষ্টি করে খ্রীষ্টান ধর্মকে কতকটা রাজধর্মের মর্যাদা দিল। এদিকে তখন রামমোহন-শ্রীরামপুরমিশন রাধাকান্তদেবের ধর্ম-বিচার চল্‌ত। ১৮৩৩এর পরে ডাফ্‌ সাহেব নবশিক্ষিত হিন্দুকে খ্রীষ্টধর্মে আকৃষ্ট করবার জন্য তুমুল উৎসাহে লাগলেন। কারণ হিন্দু কলেজে ইংরেজী শিক্ষা প্রসারিত হচ্ছে, 'ইয়ং বেঙ্গল' বিদ্রোহে মাথা খাড়া করে উঠছে। ক্রমে ডাফ্‌ সফল হলেন—কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় লালবিহারী দে, মধুসূদন দত্ত, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরের মত সুসন্তানদের হিন্দু সমাজ হারাল। ফলে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতিও নতুন করে সংগঠিত হতে লাগল। একটি কথা লক্ষণীয়—হিন্দুদের নিকট মিশনারিদের প্রচার চললেও মুসলমানদের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারে তাঁরা তত আগ্রহ তখনো দেখান নি—হয়তো তা কঠিন বলে। হয়তো তা কোম্পানির পক্ষে বিপজ্জনকও হত বলে। হিন্দুরা বহুযুগ ধরে অন্য ধর্মের আক্রমণকে বিনা রক্তপাতে প্রতিরোধ করতে অভ্যস্ত। ছ'শ' বৎসরেও তারা নিজ ধর্ম ত্যাগ করে নি। ভিন্নধর্মীর রাজত্বে বাস করে, এমন কি তাদের রাষ্ট্র শাসনে সহায়ক হয়েও, তারা হিন্দু সংস্কৃতি সংগঠিত করতে জানে। অষ্টাদশ শতকের অধঃপতনে অবশ্য এই হিন্দু সমাজের উচ্চস্তরে ধর্মের ও নীতির বন্ধন শিথিল হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু স্বয়ংসম্পূর্ণ পল্লীসমাজের সাধারণ নর-নারীর মূল ধর্মবোধ শত কুসংস্কারের তলায়ও সুদৃঢ়ই থেকে গিয়েছে। অসম্ভব তাদের সহন-শক্তি, অদ্ভুত তাদের রক্ষণ-শক্তিও। লক্ষ লক্ষ পুস্তিকা বিতরণ করে ও প্রায় ৮০ খানা পুস্তিকা লিখে কেরি, মার্শম্যান, ওয়ার্ড সেই হিন্দু-জনসমাজকে তাই বিচলিত করতে পারেন নি। সমাজের শিক্ষিত স্তর বিচলিত হল মিশনারির পুস্তিকা প্রচারে নয়, পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও জীবনদর্শনের ফলে।

(২) হিন্দুসমাজে আলোড়ন জাগল। কিন্তু খ্রীষ্টান মিশনারিরা ছাড়া কেউ নিম্নস্তরের নিকট পৌছতে চান নি। হিন্দুদের এক সংস্কারকামী শাখার নেতা যেমন রামমোহন রায়, রক্ষণশীলতার নেতা তেমনি শিক্ষাব্রতী রাজা রাধাকান্ত দেব। ১৮১৫ সনে রামমোহন রায় 'বেদান্ত গ্রন্থ' ও 'বেদান্তসার' প্রকাশ করে এবং 'আত্মীয় সভা' স্থাপন করে প্রথম প্রচলিত হিন্দুধর্মের বহু-দেবতাবাদ ও সাকারোপাসনার বিরুদ্ধে নিজের মত প্রচারে নামেন। তাঁর

মত প্রচারের জন্য তিনি প্রধানত চার প্রকার পথ অবলম্বন করেন—(১) পুস্তক ও পত্রিকা প্রকাশ, (২) কথোপকথন ও আলোচনা, (৩) সভা স্থাপন, (৪) বিদ্যালয় স্থাপন (দ্রঃ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—রামমোহন. সা. সা. চ)। প্রচার আরম্ভ হতেই (১৮১৫) তিনি রক্ষণশীল সমাজ-কর্তাদের বিরাগভাজন হন ; এজন্য হিন্দু কলেজের (১৮১৭) পরিচালকমণ্ডলী থেকেও তাঁকে দূরে থাকতে হয়। অবশ্য এর পরেই তিনি সামাজিক ও শিক্ষার সংস্কারের আন্দোলনে অগ্রসর হয়ে যান। হিন্দু সমাজের আভ্যন্তরীণ ধর্ম আলোচনায় প্রথম সংঘাত বাধালেন রামমোহন রায়। ১৮১৫র 'আত্মীয় সভা'র পরে, ইং ১৮২১এ বিদেশীয় ধাঁচের 'ইউনিটেরিয়ান্ কমিটি' (অ্যাডাম-এর সহযোগে) স্থাপিত হয়, এবং শেষে ইং ১৮২৮এ (২০শে আগস্ট) স্থাপিত হল দেশীয় ধাঁচের 'ব্রহ্ম মন্দির'—লোকে যাকে সে সময়ে বল্‌ত 'ব্রহ্মসভা।'

(৩) ১৮২০ নাগাদ রামমোহন তাঁর The Precepts of Jesus ও An Appeal to the Christian Public in Defence of the Precepts of Jesus প্রকাশিত করেন। তার পরেই ইংরেজি ও বাঙলায় রামমোহন 'ব্রাহ্মণ সেবধি' (১৮২১ ?) পত্র ও 'ব্রাহ্মণ মিশনারি সংবাদ' প্রকাশ ও প্রচার করে মিশনারিদের বিরুদ্ধে একেশ্বরবাদী হিন্দুধর্মের প্রতিবাদ উত্থাপন করলেন। বন্ধু অ্যাডামকে তিনি পূর্বেই খ্রীষ্টানদের বিরুদ্ধে Unitarian মতবাদের সপক্ষে এনেছিলেন। Unitarian ধর্মমত প্রচার করে খ্রীষ্টানদের সঙ্গেও হিন্দু সংস্কারবাদীদের সংঘাত বাধালেন রামমোহন।

(৪) এ ছাড়া একটা বড় রকমের সংঘাত বাধে যখন হিন্দু কলেজের ডিরোজিও'র (১৮০৯-১৮৩১) শিষ্যদল মুক্তকণ্ঠে শুধু হিন্দু ধর্মেই নিজেদের অনাস্থা ঘোষণা করলেন না, কার্যত প্রায় সমস্ত ধর্মেই অনাস্থা প্রকাশ করলেন। Tom Paineএর Age of Reason ও ফরাসী বিপ্লবের Religion of Humanityর তাঁরাই এদেশে অগ্রদূত। তবে হিন্দু সমাজের মানুষ বলে হিন্দু-ধর্মের বিরুদ্ধেই তাঁদের প্রত্যক্ষ আক্রমণ। 'ইয়ং বেঙ্গলের' এই বিদ্রোহের প্রেরণাদাতা হিসাবে ডিরোজিও হিন্দু কলেজ থেকে বিতাড়িত হলেন। এঁদের প্রধান উৎসাহদাতা ডেভিড হেয়ার চাকুরে ছিলেন না বলে কেউ তাঁকে স্পর্শ করতে পারল না। কিন্তু নেতারা তাঁকে মানপত্র দিলেন না (১৮৩০)।

১৮৩১এ ডেভিড হেয়ারকে যে মানপত্র দিলেন দক্ষিণানন্দ বা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক প্রভৃতি ৫৩ জন ছাত্র। খ্রীষ্টানরা মৃত্যুর পরেও (১৮৪২) ডেভিড হেয়ারকে খ্রীষ্টান সমাধি-ক্ষেত্রে স্থান দিল না। কারণ তিনি খ্রীষ্টধর্মে আস্থা রাখতেন না। ভালোই হল। 'তাই ছাত্রপল্লী মাঝে বিরাজিছ তুমি, ছাত্রের দেবতা!'

দেশীয়দের মধ্যে 'ইয়ং বেঙ্গল' বা 'ডিরোজিয়ান দের প্রধান পরিচালক হন তারাচাঁদ চক্রবর্তী। তিনি হিন্দু কলেজের প্রথম একজন ছাত্র, আর রামমোহনের 'ব্রাহ্মসমাজের' সম্পাদক। কিন্তু রামমোহন তখন নেই, 'ব্রাহ্মসমাজ' নিস্তেজ; তারাচাঁদ চক্রবর্তী সক্রিয় রইলেন সংশয়বাদী 'ইয়ং বেঙ্গলদের' নিয়ে। এজন্য সে সময়ে এই তরুণদের একটা নাম দেওয়া হয় 'চক্রবর্তী ফ্যাকশান' বা 'চক্রবর্তী চক্র' বলে (দ্রঃ যোগেশচন্দ্র বাগল—উঃ শঃ বাঙলা)। কথাটা শুধু তারাচাঁদ চক্রবর্তীর সংস্কার-প্রতিজ্ঞার প্রমাণ নয়, যে দলের নায়ক তাঁর মত পুরুষ তাদেরও সততার ও প্রগতিবাদিতারও প্রমাণ। 'ইয়ং বেঙ্গলের' নামে সত্য মিথ্যা অনেক অপবাদ রটানো হয়েছে। আগুন সময়ে সময়ে দগ্ধ করে, তথাপি তা আগুন। 'ইয়ং বেঙ্গল'ও তেমনি আগুন।

মনে হয় ডিরোজিও-ডেভিড হেয়ারের শিষ্য 'ইয়ং বেঙ্গলে'র মধ্যে দু-ধরনের মানুষ ছিলেন—একদল রামগোপাল ঘোষের মত যা কিছু হিন্দু তা ঘৃণা করতেন আর ছিলেন সাহেবীভাবের পক্ষপাতী। এঁদেরই সহযাত্রী 'পারসিকিউটেড'-প্রণেতা কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। অথচ পাদ্রি হয়েও তিনি বাঙলা রচনা ও ভারতীয় সংস্কৃতির অক্লান্ত প্রচারক। তিনিই সকলের অগ্রণী; কিন্তু তিনি ডিরোজিওর ঠিক ছাত্র নন, তবে শ্রেষ্ঠ শিষ্য। তারপরেই তখনকার দিনে অগ্রগণ্য ছিলেন সূর্যকান্ত ঠাকুরের দৌহিত্র দক্ষিণানন্দ বা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় যিনি পরে বর্ধমানের তেজচন্দ্রের বিধবা কনিষ্ঠা রাণী বসন্তকুমারীকে 'সিভিল ম্যারেজ অ্যাক্ট' অনুসারে বিবাহ (১৮৪৮?) করেন, অর্থাৎ (শিবনাথ শাস্ত্রীকে তিনি যেমন বলেছিলেন) একই কালে জাত্যন্তরে বিবাহ, বিধবা বিবাহ ও সিভিল ম্যারেজ তিনি সম্পন্ন করেন। প্রধানত সেজন্য বাঙলা ছেড়ে লক্ষ্ণৌতে তিনি গিয়ে বসবাস করেন, এবং সেখানে সিপাহী যুদ্ধের সময়ে ইংরেজের সহায়তা করায় হয়ে ওঠেন 'রাজা দক্ষিণারঞ্জন।' বেথুন স্কুলের মত বহু নবযুগের প্রতিষ্ঠানের পিছনে ছিল তাঁর উৎসাহ ও

সাহায্য। বাঙলা দেশ তাঁকে হারালেও তিনি কিন্তু হিন্দু সমাজ ত্যাগ করেন নি। অন্ত দলের মানুষদের মধ্যে নিশ্চয়ই গণ্য প্যারীচাঁদ মিত্র, রসিককৃষ্ণ মল্লিক প্রমুখ স্থির-চিত্ত সংস্কারকগণ। ধর্মবিষয়ে বিদ্রোহ বৃদ্ধি না করে তাঁরা শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারেই বেশি মন দেন। রামতনু লাহিড়ী এঁদের সমধর্মী হলেও নিজেই এক আদর্শনিষ্ঠ ভক্তিসুন্দর পুরুষ। পরবর্তীকালে বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন মনীষা প্রকাশিত হয়।

(৫) সতীদাহ সমর্থনেই 'ধর্মসভা' (১৮৩০) দানা বেঁধে ওঠে। পাদ্রি ডাফ্ও সে সময়ে খ্রীষ্টধর্মের দিকে (১৮৩০) যুবক বাঙলার অগ্রণীদের প্রবলভাবে আকর্ষণ করলেন—কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, পরে লালবিহারী দে, মধুসূদন দত্ত ও জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করলে নিশ্চয়ই তাঁদের বন্ধু ও আত্মীয়বর্গও বিদ্রোহ-পথ থেকে দূরে সরে যাওয়ার কথাই চিন্তা করে থাকবেন। 'ইয়ং বেঙ্গলে'র ধর্ম-বিষয়ে বিরূপতার পরিবর্তে ধর্মক্ষেত্রে রামমোহনের ধারাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর উদ্যোগী হন,—রামমোহনের জ্ঞানার্জনের ঐতিহ্যভার গ্রহণ করেন অক্ষয়কুমার দত্ত ও বিদ্যাসাগর, আর তাঁর ধর্মপিপাসার সদুত্তর খোঁজেন দেবেন্দ্রনাথ—খ্রীষ্টধর্মের বিরুদ্ধে 'ধর্মসভা'র নেতাদের মত তিনিও চাইছিলেন প্রতিরোধ।

ডিরোজিওর পরে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 'ইয়ং বেঙ্গলে'র ইতিহাসের নায়ক হয়ে পড়েন। দরিদ্র ব্রাহ্মণের সন্তান কৃষ্ণমোহন মাতুলালয়ে থেকে পড়তেন। একদিন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপস্থিতিতে সেই গৃহে বন্ধুরা একত্র হয়ে মাংসাহার করে গোরুর (?) হাড় প্রভৃতি প্রতিবেশী ব্রাহ্মণের গৃহে নিক্ষেপ করল, আর চীৎকার করে উঠল, "গোমাংস! গোমাংস!" না হলে যেন তাদের বিদ্রোহী মন শান্তি পায় না! পথে খাঁটি ব্রাহ্মণ বা পুরাতনপন্থীদের দেখলে তারা তখন বলে উঠত—"গোরু খাবি? গোরু খাবি?" কৃষ্ণমোহন কিন্তু তখন গৃহে ছিলেন না, তা সত্ত্বেও এই অপরাধেই তিনি গৃহ থেকে বিতাড়িত হন। তাঁর আত্মকথায় তিনি লিখেছেন, "হিন্দুধর্মের প্রতি বিরুদ্ধাচরণের মত খ্রীষ্টধর্মের বিরোধিতাও তাঁদের অনুরূপ স্পষ্ট ছিল। এ কাহিনীর বিষয়বস্তু (কৃষ্ণমোহন) কয়েক রাত্রি বহু বন্ধু সমভিব্যাহারে কলিকাতার রাজপথে বিচরণ করিয়াছিলেন। উদ্দেশ্য গস্পেল বা যীশুর বাণী প্রচারের ভাণ করিয়া, বাংলা ভুল উচ্চারণ এবং বাংলা ভাষার শব্দ ও বাক্যাংশগুলির ভুল প্রয়োগ

অনুকরণ করিয়া মিশনারিদের লোকচক্ষে হাস্যাস্পদ ও হেয় প্রতিপন্ন করা।" সমাজ-বিতাড়িত কৃষ্ণমোহন অদম্য তেজে বৎসরখানেক ভেসে বেড়ান। শেষে ডাফের প্ররোচনায় খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন, আর শিক্ষিত যুবকদের (যথা মধুসূদন, জ্ঞানেন্দ্রমোহন প্রভৃতিকে) খ্রীষ্টান করবার জন্য নিরন্তর চেষ্টা করতে থাকেন। একথা ঠিক যে, 'ইয়ং বেঙ্গলে'র প্রধান লক্ষ্য ধর্ম জিজ্ঞাসা ছিল না, বরং ছিল সত্য-জিজ্ঞাসা ('enquiry') ও জ্ঞানপিপাসা ('জ্ঞানান্বেষণ') ; 'Enquirer' ও 'জ্ঞানান্বেষণ' ছিল এই বিদ্রোহীদের কাগজের নাম, অন্য পত্র 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর'। সভাসমিতি গঠন, সংবাদপত্র পরিচালনা প্রভৃতি দ্বারা শিক্ষা ও সমাজক্ষেত্রে তাঁরা বিপ্লব ঘটাতে চেয়েছিলেন। সেদিন 'ধর্ম' বলতে সাধারণতঃ আচার-ধর্মই বোঝাত। তাই 'ধর্মসভা'র (ইং ১৮৩০) সনাতনীরা এঁদের বিরুদ্ধে যে প্রবল চীৎকার তোলেন তাতে ক্রোধ ছিল বেশি, যুক্তি ছিল কম। এজন্যই ইয়ং বেঙ্গলও 'ধর্মসভা'র নাম দেয় 'গুড়ুম সভা'। উদ্দীপনার বশে মদ্য-পান ও নিষিদ্ধ আহারে ইয়ং বেঙ্গল উৎকট বাড়াবাড়ি করতেন। আর দুঃসাহসের বশে, সত্য মিথ্যা যত অভিযোগ অন্যেরা করত, তা তুচ্ছ করতেন। মা কালীকে 'গুড মর্নিং ম্যাডাম' কোনো ছেলে বলে থাকলে ('সংবাদ প্রভাকর', ইং ১৮৩১) নিশ্চয়ই বোঝা যায় তার সুবুদ্ধি না থাকলেও রঙ্গবোধ আছে। 'সমাচার চন্দ্রিকা'র পাতায় (যথা, ১৮৩০ ইং ৬ই নভেম্বর ; ১৮৩১, ২৬শে এপ্রিল ; ১৮৩১, ৯ই মে ইত্যাদি) পত্রসমূহের অনেক কথা—এই 'ধর্মসভা'র গোঁড়াদের পরিকল্পিত প্রচারের জন্য উদ্ভাবিত ও লিখিত বলে মনে হয়। 'ইয়ং বেঙ্গল' তুচ্ছ করলেও সংস্কারপন্থী 'সমাচারদর্পণে'র উত্তরদাতারা সে সবের উত্তর দিতে কার্পণ্য করেন নি।

(গ) **সমাজ-সংস্কার :** ধর্ম-সংঘাত ও সমাজ-সংঘাত তখন অবিমিশ্রিত ভাবেই জড়িত ছিল। তাই হিন্দুর প্রতিমা-পূজা এবং বহু-দেববাদ ও জন্মান্তর-বাদের তর্কে ধর্মালোচনা শেষ হত না। ব্যক্তিগত আচার-আচরণ ও কুসংস্কারের তর্ক-বিতর্কেই সে আসর বেশি জমত। কেরির মত পাদ্রীরা প্রথম থেকেই কৃষ্ণ ও খৃষ্টের তুলনা করে আন্দোলন শুরু করেন। কিন্তু হিন্দুর কুসংস্কারের বিরুদ্ধে শুধু তাঁরাই অভিযান চালান নি। গঙ্গাসাগরে সন্তান নিক্ষেপ সরকারই বন্ধ করে। সতীদাহের বিরুদ্ধেও ওয়েলেস্‌লির সময় থেকেই কড়াকড়ি শুরু হয়। সহমরণের বিরুদ্ধে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের মত পণ্ডিতদের অভিমত আগেই

সংগৃহীত হয়েছিল, সে আন্দোলন ক্রমে প্রবল হয়ে উঠল। একটু পরেই রামমোহন রায়ও তখনকার সংস্কারবাদী নেতাদের সঙ্গে সে আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন.—অমনি বাংলায় ও ইংরেজিতে তাঁর কলম চলল (খ্রীঃ ১৮২৯-১৮৩০ অব্দ)। সতীদাহ হিন্দুধর্মের অঙ্গ বলে একবার সে প্রথার সমর্থনে দাঁড়ায় রাজা রাধাকান্ত দেবকে সম্মুখে রেখে হিন্দু রক্ষণশীলেরা। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর লর্ড বেণ্টিঙ্ক এই প্রথা আইন-বিরুদ্ধ বলে ঘোষণা করেন। অমনি (১৮৩০, ১৭ই জানুয়ারি) প্রতিবাদের জন্য 'ধর্মসভা' গঠিত হল। বেণ্টিঙ্কের ঘোষণার বিরুদ্ধে বিলাতে আন্দোলন করবার জন্য 'ধর্মসভা' একজন সাহেব মুখপাত্রকে (মিঃ বেথী) পাঠাচ্ছিলেন। সে জাহাজ পথেই ডুবল—বিধবাদাহের মুখপাত্র বেথী জলে ডুবে মরলেন। এদিকে রামমোহন প্রভৃতিও লর্ড বেণ্টিঙ্ককে ধন্যবাদ দিয়ে মানপত্র দান করেন।

রামমোহনের কালে (ইং ১৮১৫-১৮৩০) সতীদাহ আন্দোলনই অবশ্য সর্বাপেক্ষা বেশি আলোড়ন সৃষ্টি করে। কিন্তু সমাজ-সংস্কারের আন্দোলন শুধু তাতেই সীমাবদ্ধ থাকে নি। 'সমাচার-দর্পণ' সংস্কারকামীদের মুখপত্র হয়। কৌলীন্য প্রথার বিরুদ্ধে পত্রাদি ১৮৩০-৩১ সনের মধ্যে 'সমাচার-দর্পণ', 'জ্ঞানান্বেষণে' প্রকাশিত হতে থাকে—১৮৩৫-এর ('দর্পণে' প্রকাশিত) 'চুঁচুড়া নিবাসী স্ত্রীগণের পত্র' যদি সত্যই স্ত্রীগণের লিখিত হয় তাহলে তা নিশ্চয়ই সংস্কার আন্দোলনের অদ্ভুত প্রসারের পরিচায়ক। অবশ্য বহু বিবাহ এই সময় থেকেই বাঙলার নূতন নাটকেরও আক্রমণের বিষয় হয়ে উঠছে। তবে এই ইং ১৮৩১-১৮৪৩ বা 'ইয়ং বেঙ্গলে'র উন্মাদনার দিনে ধর্ম-সংস্কার অপেক্ষা সমাজ-সংস্কারেই সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হচ্ছিল। 'ইয়ং বেঙ্গল শুধু দু'একটি কুসংস্কার দূর করতে বা বহু বিবাহ রোধ করতে চান নি, স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে 'মানুষের অধিকার' তাঁরা দাবী করেছেন, আর এমন তেজে আর কেউ এদেশে তা দাবী করে নি। এর পরেই বিধবা বিবাহ অনুমোদিত ও আইনসঙ্গত করবার জন্য কর্মক্ষেত্রে নামলেন বিদ্যাসাগর। আর তা আইন-সঙ্গত (১৮৫৬) করেই তিনি নিবৃত্ত হলেন না,—বিধবা-বিবাহ প্রচলিত করতেও প্রবৃত্ত হলেন। পুস্তিকা, সংবাদপত্র, সভা-সমিতি ছাড়িয়ে তা ছড়ার গানেরও বিষয় হয়ে ওঠে।

একটা কথা উল্লেখযোগ্য—সমাজ-সংস্কারের আন্দোলনের একটা প্রধান

আশ্রয় ছিল মুদ্রাযন্ত্র ও সংবাদপত্র, আর দ্বিতীয় আশ্রয় ছিল রঙ্গমঞ্চ। বাঙলার রঙ্গমঞ্চ উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জাগতে থাকে (ইং ১৮৫৬-৫৭)—সমাজ-সংস্কারের প্রেরণা তার পূর্বেই নাটকের এক প্রধান আশ্রয় হয়। যেমন, ১৮৫৪তেই রামনারায়ণের 'কুলীনকুলসর্বস্ব' রচিত হয়।

বলা বাহুল্য, 'ইয়ং বেঙ্গলে'র রামগোপাল ঘোষ, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় শুধু সংস্কারে তৃপ্ত হবার মত লোক ছিলেন না। তাঁরা বিদ্রোহী, 'টম পেন'-পড়া যুবক। প্যারীচাঁদ মিত্র, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রামতনু লাহিড়ীর মত স্থিরচিত্ত ধীরগামী সংস্কারক তাঁরা সকলে নন। বিদ্যাসাগর-অক্ষয়কুমারের মত আত্মস্থ পুরুষও তাঁরা হতে পারেন নি। শুধু ধর্ম ও সমাজের বিধি-নিয়ম কেন, তাঁরা প্রাচীন ও মধ্যযুগের সমস্ত নীতিবোধ ও মূল্যবোধকে উড়িয়ে দিয়ে তার স্থলে Age of Reason ও Rights of Man প্রতিষ্ঠা করবার জন্য অধীর হয়ে উঠেছিলেন। এই দুঃসাহসের সেদিন প্রয়োজন ছিল।

(ঘ) **নীতির সংঘর্ষ—মূল্যবোধের পরিবর্তন :** মধ্যযুগের নীতিবোধ ও মূল্যমান যে টিকছে না, তা তো ভারতচন্দ্রের যুগেই বোঝা যায়। কিন্তু নূতন মূল্যমান আমরা নিজে থেকে পাই নি। কোম্পানির 'নাবুবেরা' ও বেনিয়ান মুৎসুদ্দিরাও বুর্জোয়া নীতিবোধ (ময়্যাল সেন্স) ও বুর্জোয়া মূল্যমান (Standard of Values) প্রতিষ্ঠিত করতে পারে নি। সে জিনিসের ধারণা জন্মাতে থাকে ইংরেজি শিক্ষার ও ইংরেজ-চরিত্রের সঙ্গে ভদ্রলোক শ্রেণীর যথার্থ পরিচয়ে। রামমোহন রায় ও রাধাকান্ত দেবই এই সত্যের সন্ধান প্রথম পেয়েছিলেন। অবশ্য ইংরেজের অপরাজেয় সংগঠন শক্তি—যুদ্ধে, রাজ্যশাসনে, বিশেষ করে সম্প্রসারিত শিল্প-বিপ্লবে তার অতুলনীয় কৃতিত্ব, দেখেও একভাবে এ শিক্ষা পাওয়া যেত। এমন ইংরেজ-চরিত্রও এ দেশে ছিলেন যাঁর কাছে মাথা নত করে নিজেকেই উন্নত মনে হয়—যেমন তার উইলিয়ম জোন্‌স্ বা উইলকিন্সের মত বিদ্যানুরাগী, কেরি-মার্শম্যান-ওয়ার্ডের মত আদর্শে উৎসর্গীকৃত প্রাণ, আর ডেভিড হেয়ার, জেমস লঙ্ ও বেথুনের মত শিক্ষাব্রতী। কিন্তু নতুন জীবনাদর্শের জন্য যা অক্ষয় প্রেরণার উৎস নিশ্চয়ই তা জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডার। ইংরেজী শিক্ষার চাবিকাঠি দিয়েই সে ভাণ্ডার খোলা যেত। এদিক দিয়ে ডিরোজিও চিরস্মরণীয়।

নীতিবোধের দিক থেকেও প্রথম পর্বখণ্ডের পনেরো বৎসর (ইং ১৮০০-১৮১৫) খ্রীষ্টান মিশনারিদেরই কাল—তাঁরা 'খ্রীশ্চান মর‍্যালস্' বলে এই নতুন নীতিবোধকেই প্রচার করেন।

বুর্জোয়া মূল্যমানের সঙ্গে খ্রীষ্টের অবশ্য কোনো মূলগত সম্পর্ক নেই। ইংরেজ সমাজে তা প্রথম উদ্ভূত হলেও এই বুর্জোয়া মূল্যমান ইংরেজেরও একচেটিয়া সম্পদ নয়। কারণ, অনেক খ্রীষ্টান দেশ আছে বুর্জোয়া সমাজ-বিন্যাস যেখানে ঘটে নি, বুর্জোয়া জীবনদর্শনও গৃহীত হয় নি। আবার ইংরেজ ছাড়াও অন্য এরূপ জাতি আছে যারা নিজের ভাষায় ও সাহিত্যে বুর্জোয়া আদর্শকে রূপদান করেছে। অবশ্য, উনিশ শতকে ইংরেজের কাছ থেকে ধার-করা দৃষ্টি নিয়েই আমরা পৃথিবী দেখতে বাধ্য হয়েছি।—ঔপনিবেশিকতার তাও একটা অভিশাপ। তাই মনে করছি ইংরেজী শিক্ষা আর বুর্জোয়া জীবনদর্শন বুঝি এক ও অভিন্ন জিনিস, আর খ্রীষ্টান ধর্মনীতি ও বুর্জোয়া নীতি বুঝি একই জিনিসের নাম। এমন কি, একথাও ভেবেছি যে ইংরেজের অধীনতা দীর্ঘস্থায়ী না হলে বুঝি আমাদের সামাজিক ও মানসিক উন্নয়নও সুসম্ভব হবে না, এবং জাতীয় জাগরণও ব্যাহত হবে।

আশ্চর্য কথা এই যে, খ্রীষ্টধর্ম ও বুর্জোয়া নীতিবোধ সম্বন্ধে এ ভুল রামমোহন রায় বা রাধাকান্ত দেব, দুই প্রথম ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙালী প্রধানদের জন্মায় নি। দুইজনাই প্রাচীন সংস্কৃত জ্ঞানভাণ্ডার সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। অবশ্য রামমোহনই এই দ্বিতীয় পর্বখণ্ডের নেতা—তাঁর সহযোগী দ্বারকানাথ, তারাচাঁদ, প্রসন্নকুমার প্রভৃতি। 'কলিকাতা রাজবাটি'র গৌরব রাজা রাধাকান্ত কুল-মর্যাদার দাবীতেই রক্ষণশীল দলের নেতৃত্বভার গ্রহণ করেন। তাহলেও হিন্দুকলেজ, স্কুল সোসাইটি, এবং স্ত্রীশিক্ষা, বিশেষ করে বাঙলা শিক্ষার প্রচলন, প্রভৃতি প্রত্যেকটি কল্যাণ-কর্মে তিনিই নায়ক—সংস্কৃত শব্দকল্পদ্রুমের (ইং ১৮২২-১৮৫৮) সংকলয়িতারূপে তিনি দেশীয় ধারায় সংস্কৃত চর্চারও পথপ্রদর্শক পণ্ডিত। রুশিয়ার সেণ্ট পিটর্সবুর্গ বিজ্ঞান অ্যাকাডেমির তিনিই ছিলেন একমাত্র সম্মানিত ভারতীয় সদস্য। আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক যোগাযোগের দিক থেকেও এ তথ্যটি স্মরণীয়।

বুর্জোয়া নীতিবোধকে জাতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে খাপ খাইয়ে গ্রহণ করা রামমোহনের জীবনের সাধনা। আমাদের সাধারণ ভাষায়—এবং ভ্রান্ত ভাষায়

—আমরা একেই বলি 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের সমন্বয়'। এ জন্তই রামমোহন যুগ-দ্রষ্টা—তাঁর এই সাধনাই ভারতের এ যুগের শ্রেষ্ঠ পুরুষদের সাধনা। যাই হোক, রামমোহনের পরের দিকের কয়েক বৎসরের যুক্তি-বিচারে ও প্রয়াসে (১৮১৫-৩১) নতুন নীতিবোধ স্পষ্ট হয়ে ওঠে—যথা, শাস্ত্র অপেক্ষা যুক্তি বড় ; অধ্যাত্মবোধ সামাজিক আচার-নিয়মের বাধ্য নয়, 'মানুষের অধিকার' সর্বদেশেই অনস্বীকার্য।

রামমোহন 'ধর্মসংস্থাপনার্থায়' আসেন নি, ভক্ত সাধুসন্তও ছিলেন না ; কিন্তু পরমার্থ চিন্তাকে তিনি মহামূল্যবান মনে করতেন। এই ধর্মগত ভাব-বাদিতা তাঁর মধ্যে দৃঢ় ছিল। কিন্তু রামমোহনের যুগেই মানুষের অধিকারের এই বুর্জোয়া ঘোষণা রামমোহনের অধ্যাত্মতত্ত্ব থেকে মুক্ত হতে আরম্ভ করে। হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও (ইং ১৮০৯-১৮৩১এর ২৬শে ডিসেম্বর) হিন্দু কলেজে মাত্র ৫ বৎসর শিক্ষকতা করেন (ইং ১৮২৬, মে—১৮৩১, এপ্রিল)। সে শিক্ষা পুঁথির শিক্ষা নয়, সত্যজিজ্ঞাসায় দীক্ষা। এ দীক্ষার মূলমন্ত্র 'Doubt everything'। তাঁর পত্রে তিনি তা ব্যক্ত করেছেন (দ্রষ্টব্য : যোগেশচন্দ্র বাগলের বঙ্গানুবাদ,—'উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা' হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও, পৃঃ ১২৭) :

"আমি ছেলেদের শিক্ষার ভার লইয়া তাহাদের (ছাত্রদের) মন হইতে সঙ্কীর্ণতা ও গোঁড়ামি দূর করিতে তৎপর হইলাম। আমি এক একটি বিষয় লইয়া তাহার সপক্ষে ও বিপক্ষে কি কি যুক্তি থাকা সম্ভব, তাহা বুঝাইয়া দিতাম। এ বিষয়ে মনীষী বেকনই আমার আদর্শ।···মনে একটি সন্দেহের পরে সন্দেহের উদয় হইবে, ফলে সকল বিষয়েই অবিশ্বাস জন্মিবে।"

নাস্তিকতা ও আস্তিকতা দু' বিষয়েই তিনি সন্দেহসঙ্কুল জিজ্ঞাসায় সমান উৎসাহ দিতেন। কলেজের পরে এভাবে তাঁর নেতৃত্বে ছাত্রদের আলোচনা-সভা গড়ে ওঠে—'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন বা ইনস্টিটিউশন।' সেখানে the young lions of the Academy roared out, week after week, 'Down with Hinduism! Down with Orthodoxy!' (রেভাঃ লালবিহারী দে'র লেখা আলেকজাণ্ডার ডাফ্-এর স্মৃতিকথা দ্রষ্টব্য)। 'পার্থেনন' নামে ইংরেজি সাপ্তাহিক এই নর-শার্দূলেরা সম্পাদিত করতেন। তাতে 'ইয়ং বেঙ্গলে'র বিদ্রোহস্ফুলিঙ্গ দেখে হিন্দু নেতারা চমকিত হলেন। ১৮৩০এ নবাগত

খ্রীষ্টান মিশনারি ডাফ্ সাহেবও ভয়ে বিস্ময়ে ভারতবর্ষে ফরাসী এন্‌সাইক্লোপীডিস্টদের এই সংশয়বাদী বংশধরদের দেখেন।—বেদান্তবাদী ইউনিটেরিয়ান্ রামমোহনের বিতর্ক-পদ্ধতি ছাড়িয়ে 'হিন্দু কলেজে'র ডিরোজিওর যুগ এগিয়ে যাচ্ছিল বাস্তববাদের দিকে—বিদ্রোহের পথে। সত্য ও নির্ভীকতা হল তাঁদের মন্ত্র। যখন মেকলে বাঙালী চরিত্রের কলঙ্কের নিদর্শন দেখে ক্ষুব্ধ হচ্ছিলেন, তখনি 'হিন্দু কলেজের ছেলে মিথ্যা বলে না'—একথা প্রবাদবাক্য হয়ে দাঁড়ায়। আর কোনো যুগে কোনো দেশের ছাত্রদলের সম্বন্ধে এমন কথা বলা চল্‌ত কি? চিন্তা করলে মেকলেও মানতেন বাঙলার সেই 'ইয়ং বেঙ্গল' ইতিহাসের এক অদ্ভুত প্রকাশ।

ডিরোজিওর অকাল-মৃত্যুতে বাঙলা দেশ তার প্রিয়তম এই বিদ্রোহী সন্তানকে হারায়। কিন্তু সে বিদ্রোহ পরিচালনা করে চলেন তাঁরা শিষ্যরা। ইং ১৮৩১এই তা আরম্ভ হয়। সংবাদপত্র পরিচালনায়, পুস্তিকা রচনায়, শিক্ষাবিস্তারে, বিতর্কে, আলোচনায়, রাজনৈতিক ও সামাজিক সংস্কারান্দোলনে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিককে নিয়ে দক্ষিণানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, রাধানাথ শিকদার, রামতনু লাহিড়ী, শিবচন্দ্র দেব, রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ ডিরোজিও-শিষ্যরা এই তৃতীয় খণ্ডকালে (ইং ১৮৩১-১৮৪৩) যুক্তি ও মানবাধিকারের দীপ্ত বাণী ঘোষণা করেন। কার্যতঃ তাঁরা সাফল্য অর্জন করেন কিন্তু চতুর্থ পর্বে ১৮৪৩ থেকে ১৮৫৮এর সময়ে। তবে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, কতকাংশে দক্ষিণানন্দ মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষও হিন্দু-সমাজ থেকে ক্রমে বিচ্ছিন্ন হন। তাঁদের অনুগামী না হলেও অপরেরাও তাঁদের মত বুর্জোয়া নীতিবোধে প্রবুদ্ধ। তাই, 'ব্র্যাণ্ডি ও বইয়ের বিপ্লব' প্রবাহিত হয়। নূতন নীতিবোধের উন্মাদনায় মদ্যপান ও অমেধ্য মাংসাহার অভ্যাস ও কর্তব্য হয়ে ওঠে। হিউমের 'এসে' তাঁরা মুখস্থ করেছেন, পেন্-এর 'এজ অব রিজন্' ও 'রাইটস্ অব ম্যান' জাহাজ থেকে নামতে না নামতেই প্রায় লুঠ হয়ে যায়। কৃষ্ণমোহনের পত্রিকায় আগুন ছুটল ইংরেজিতে—" 'Hail, Freedom, hail!' rang through impassioned sentences." কিন্তু বন্ধুদের উগ্রতায়, বিদ্রোহের উন্মাদনায় ও মত্ততায় বাড়াবাড়ি না হওয়াই আশ্চর্য। কৃষ্ণমোহন স্বগৃহ থেকে যখন বিতাড়িত হলেন, তখনো বন্ধুত্যাগ বা নতি স্বীকার করলেন না। রোমানদের মত তাঁদের নির্ভীক কণ্ঠ—রোমানদের মতই তাঁরা অনমনীয়।

কারণ, "A people can never be reformed without noise and confusion." সভা-সমিতি ও সংবাদপত্র সেই confusion বা কোলাহলে মুখরিত হয়ে উঠল। 'ধর্মসভা' ও 'সমাচার চন্দ্রিকা'র হতাশ পিতারা দুর্বিনীত ছেলেদের সুগতির আর পথ দেখলেন না। যখন আলেকজাণ্ডার ডাফ্ হিন্দু শিক্ষিতদের খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করতে লাগলেন তখন খ্রীষ্টান-ধর্মের আক্রমণের বিরুদ্ধেই অবশেষে ব্রাহ্ম-সমাজের দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ধর্মসভার রাধাকান্ত দেব একত্র হলেন (১৮৪৫)। 'হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠিত হল ; ভূদেব মুখোপাধ্যায় হলেন তার প্রথম অধ্যক্ষ। ১৮৪৭-৪৮এ হিন্দু কলেজের আরও কিছু ছাত্র ও শিক্ষক খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। হয়তো এ সবের প্রতিক্রিয়ায় রসিককৃষ্ণ মল্লিক, প্যারীচাঁদ মিত্র, রাধানাথ শিকদারের মত ডিরোজিওর শিষ্যদের (ইং ১৮৪৩-এর সময় থেকে) সুস্থ সংস্কারচেতনা সংহত হয় ; রামতনু লাহিড়ী, শিবচন্দ্র দেবদের ধর্মজিজ্ঞাসা জাগ্রত হয়। রামগোপাল ঘোষ রাজনীতিতে ও কৃষ্ণমোহন শিক্ষা ও সমাজের বহু ক্ষেত্রে ক্রমে সুস্থ কর্মশক্তির পরিচয় দেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর স্বদেশাভিমান ও ধর্মবোধ নিয়ে রামমোহনের ভিত্তিতে তাঁর জীবনাদর্শকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার আয়োজন করতে লাগেন 'তত্ত্ববোধিনী সভায়' (ইং ১৮৩৯)। রামমোহনের জ্ঞানবাদী অধ্যাত্মতত্ত্ব, দেবেন্দ্রনাথের সপ্রেম অধ্যাত্ম-নিবেদনে ও রাজনারায়ণ বসুর হৃদয়াবেগে অভিষিক্ত হয়ে শিক্ষিত সমাজে প্রবল আকর্ষণশক্তি লাভ করল।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার যুগেও (১৮৪৩ থেকে) যুক্তিবাদ কিন্তু অধ্যাত্মবাদের দ্বারা সমাচ্ছন্ন হল না। অক্ষয়কুমার দত্ত ও বিদ্যাসাগর সেই Age of Reason-এরই দৃঢ়চিত্ত প্রবক্তা। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু অবশ্য অধ্যাত্মরাগে রঞ্জিত। কোন্ নীতিবোধ যে বিদ্যাসাগরকে পরিচালিত করেছে তাঁর লেখার মতই তাঁর কর্মেও তা প্রকট। যুক্তির সঙ্গে পৌরুষ, কর্তব্যনিষ্ঠার সঙ্গে মানব-মমতা—নূতন 'মূল্যবোধের এই জীবন্ত বিগ্রহরূপে বিদ্যাসাগর উনবিংশ শতাব্দীর বাস্তববাদী আদর্শের শ্রেষ্ঠ পুরুষ হয়ে আছেন।

জেনে বা না জেনে, বাঙালী বুদ্ধিজীবীরা এই পরিবর্তিত নীতিবোধ ও মূল্যবোধেরই অভাব দেখেছিলেন সিপাহী যুদ্ধে। আর তাতে বুর্জোয়া বিপ্লবের আবশ্যকীয় সংগঠন শক্তির ও নেতৃত্বের চিহ্নও ছিল না, বরং আপাত-দৃষ্টিতে সামন্ত নেতাদেরই প্রাধান্য ছিল। না হলে অসাধারণ দেশপ্রীতি, বিদেশীর

শাসকের বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ ও দুর্দমনীয় সাহসিকতা—এসব ১৮৫৭এর বিদ্রোহে যথেষ্ট ছিল। কিন্তু বাঙলার সমসাময়িক সাহিত্যে, বিশেষ করে লোকগীতে, সিপাহীযুদ্ধের মত এত বড় বিপর্যয়ের কোনো উল্লেখ প্রায় নেই।

(ঙ) **প্রতিষ্ঠান সংগঠন**—প্রত্যেক যুগই সেই যুগের উপযোগী প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করতে করতে আপনাকে প্রত্যক্ষ ও প্রতিষ্ঠিত করে নেয়। ঔপনিবেশিক পরিবেশেও সেরূপ প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে—শাসকদের অনুকরণে ও নিজেদের প্রয়োজনে। আধুনিক শিক্ষার প্রতিষ্ঠান গঠনে দেশবাসীই প্রথম উদ্যোগী হয়। কোম্পানি বাস্তব ক্ষেত্রে সামাজিক ও প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান দাঁড় করায়। শাসন বিভাগ, রাজস্ব বিভাগ প্রভৃতির অনেক পরে কোম্পানি শিক্ষালয় ও শিক্ষা-সংগঠনে হাত দেয় (ইং ১৮২৩)—শিক্ষা ব্যাপারে গঠন করে 'জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইন্‌স্ট্রাক্‌শান'। ইং ১৮৪২এ বঙ্গ-প্রদেশে তার নামকরণ হয় 'কাউন্সিল অব এডুকেশন' ও তার অধীনে গঠিত হয় 'লোকাল কমিটি'। অবশ্য ইং ১৮৩৫ থেকে প্রতি জেলায় জেলা স্কুল প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। ইং ১৮৫৪এর উডের ডেস্‌প্যাচের পরে ইং ১৮৫৫তে স্থাপিত হয় ডিপার্টমেণ্ট অব পাবলিক ইন্‌স্ট্রাকশান; এবং উচ্চ শিক্ষা, মধ্য শিক্ষা ও প্রাথমিক শিক্ষা এই ত্রিধারায় তখন শিক্ষাব্যবস্থা আরম্ভ হয়। ইং ১৮৫৭ সনের ২৮শে জানুয়ারি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হল। তার প্রথম কমিটিতে বাঙালী সদস্য ছিলেন প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ, রমাপ্রসাদ রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

মানসিক ক্ষেত্রের প্রধান একদিককার প্রতিষ্ঠান হল শিক্ষালয় ও শিক্ষা-সমিতি, এবং প্রকাশন-সমিতি। বেসরকারী ইংরেজরা ছিল প্রথম এ সবে পথপ্রদর্শক, কিন্তু ক্রমেই দেশীয় প্রধানরাও তাতে অগ্রসর হন। ইংরেজি ভাষা ছিল মুখ্য বাহন, কিন্তু হিন্দু কলেজ প্রভৃতি বাঙালী প্রতিষ্ঠানে ৮ বৎসর পর্যন্ত বাঙলাতেই শিক্ষা দেওয়া হত। মেকলের ব্যবস্থার (১৮৩৫) পরে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা প্রায় উঠে যেতে লাগল। উডের ডেসপ্যাচে (ইং ১৮৫৪) মাতৃভাষা চর্চার দিকে জোর দেওয়া হয়। তথাপি শিক্ষা ব্যাপারে বাঙলা ইংরেজির পিছনেই পড়ে যেতে থাকে। বাঙলা শিক্ষার আয়োজনও যা তখন হ'ত, হ'ত পিছনে পিছনে।

কিন্তু শিক্ষাই সব নয়। সেই সঙ্গেই জন্ম নেয় সাহিত্য সভা, আলোচনা

সভা, আন্দোলনের সভা, ডেপুটেশন, এবং বিশেষ করে সংবাদপত্র যার নাম 'ফোর্থ এস্টেট'। এসব সভা সমিতি বুর্জোয়া যুগের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান। পুরোপুরি বুর্জোয়া সামাজিক ব্যবস্থা না থাকলেও বুর্জোয়া শিক্ষা ও জীবনাদর্শ ক্রমে এই ধরণের প্রতিষ্ঠান কলকাতায় তৈরী করে ফেলল। পাশ্চাত্যাদর্শের স্কুল, পাবলিক লাইব্রেরী, এমন কি থিয়েটারও প্রভাব বিস্তার করল। এ আন্দোলনের প্রধান প্রধান দিক ও প্রধান প্রধান প্রতিষ্ঠান কি ?

(১) **সাময়িক পত্র ঃ** সংবাদপত্রের কথাই প্রথম স্মরণীয়। কারণ, এ কালের প্রস্তুতি, বিশেষ করে, বাঙলা সাহিত্যের প্রস্তুতি, সংবাদপত্রকে আশ্রয় করেই অনেকাংশে বিস্তার লাভ করে। বাঙালীর পরিচালিত ইংরেজি সংবাদ-পত্রের কথাও তাই একেবারে বাদ দেওয়া যায় না। কারণ, ভাব-বিপর্যয় তাতেই বেশি পরিস্ফুট হয়—অধিকাংশ কৃতী পুরুষের পক্ষে ইংরেজিই ছিল তখন মুখ্য ভাষা, বাঙলা গৌণ।

গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের 'বেঙ্গল গেজেটি', না, শ্রীরামপুরের 'সমাচার দর্পণ', প্রথম বাঙলা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র কোন্‌টি, তা এক্ষেত্রে বিচারের বিষয় নয়। যে আয়োজনে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য ও বাঙালী সমাজ বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হয়েছে তা 'সমাচার দর্পণ'। অন্তত ইং ১৮১৮ অব্দের ২৩শে মে থেকে ১৮৪১ পর্যন্ত তার প্রথম পর্যায়ের কালে 'সমাচার দর্পণ'ই প্রধান বাঙলা সংবাদপত্র। মার্শম্যান সাহেবের নেতৃত্বে বাঙালী পণ্ডিতেরা তা সম্পাদন করতেন (দ্রষ্টব্য : ব্রজেন্দ্রনাথ—সং-সে-কঃ ১ম. ভূমিকা)। মাসিক পত্রের দিক থেকে শ্রীরামপুরের তথ্যপূর্ণ মাসিক 'দিগ্‌দর্শন' তার পূর্বেই (এপ্রিল, ১৮১৮) প্রকাশিত হয়। ইংরেজি 'ফ্রেণ্ড অব্‌ ইণ্ডিয়া'ও শ্রীরামপুর মিশনের ঐ বৎসরের কীর্তি। অতএব এ দিকে মিশনারি নেতৃত্ব সর্বস্বীকার্য।

এর পরে বাঙলার সংবাদপত্রের জগতে আরও প্রায় ২৮খানি সংবাদপত্র আবির্ভূত হয়—অনেকগুলিই অল্পকাল মধ্যেই বিলুপ্ত হয়। কিন্তু ১৮২১ অব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর প্রথম রামমোহন রায় প্রভৃতি হিন্দু নেতাদের পরিপোষণে প্রকাশিত হয় হিন্দুদের মুখপত্র 'সম্বাদ কৌমুদী'। ১৮২২ অব্দের ৫ই মার্চ ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদকতায় প্রকাশিত হয় হিন্দু রক্ষণশীলদের মুখপত্র 'সম্বাদ চন্দ্রিকা'। রামমোহন রায় ও দ্বারকানাথ ঠাকুরের উদ্যোগে নীলমণি হালদারের সম্পাদনায় 'বঙ্গদূত' ও ইংরেজি Bengal Herald

১৮২৯-এ প্রকাশিত হয়—(Colonisation-এর সমর্থন তাতে ছিল)। 'বঙ্গদূত' বাঙলায় প্রথম বুর্জোয়া প্রগতির বাহন। পরে এল স্বনামধন্য ঈশ্বর গুপ্তের সংবাদ প্রভাকর' (২৮শে জানুয়ারি, ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দ) 'ইয়ং বেঙ্গলে'র 'জ্ঞানান্বেষণ' এবং ১৮৩৫এর ১০ই জুন, প্রথম সাহিত্য মাসিক পত্র 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়'. আর শেষে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' (১৮৪৩), 'সম্বাদ ভাস্কর' (১৮৪৮),'সোমপ্রকাশ' (১৮৫৮)—এসব নাম বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। কিন্তু শিক্ষিত শ্রেণীর ভাবলোক গঠনের দিক থেকে যে সব বাঙলা সাময়িক পত্র ও সংবাদপত্র উল্লেখযোগ্য তার মধ্যে 'বঙ্গদূতে'র পরে ১৮৩১এর (১৮ই জুন প্রথম প্রকাশিত) দক্ষিণানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদিত 'জ্ঞানান্বেষণ'কে বিশিষ্ট স্থান দিতে হবে। 'জ্ঞানান্বেষণ' অবশ্য বাঙলা-ইংরেজি কাগজ। 'ইয়ং বেঙ্গলে'র বুর্জোয়া নীতিবোধ, রাজনীতিবোধ এমন কি ব্যবসায় ক্ষেত্রে ও ব্যবহারিক জীবনে দেশের পশ্চাদ্‌বর্তিতা সম্বন্ধে 'জ্ঞানান্বেষণ যে সচেতনতার পরিচয় দেয় তা রামমোহন-বিদ্যাসাগরেও তত স্পষ্ট নয়। তবে ভাব-সংগঠক হিসাবে প্রধান স্থান দিতে হয় 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'কে, এবং বাঙলা সাহিত্যচর্চার ও 'কলেজীয় কবিতাযুদ্ধের ক্ষেত্র হিসাবে ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর'কে। পঞ্চম কিন্তু প্যারীচাঁদ মিত্র-রাধানাথ শিকদারের ক্ষুদ্র 'মাসিক পত্রিকা'; তা অনন্যসাধারণ সহজবোধ্য বাঙলা গদ্যের আসর। আর 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'কে ছেড়ে দিলে এরূপ ইংরেজী সংবাদপত্রের মধ্যে বিশেষ স্মরণীয় 'পার্থিনন' : অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের আলোচনা সভার মুখপত্র. সম্ভবতঃ ১৮২৭-১৮২৮-এর জিনিস). তারপরেই ১৮৩১-এর (জুলাইতে প্রথম প্রকাশিত) কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের Enquirer, যার নামেই ডিরোজিওর বীজ মন্ত্রের পরিচয় রয়েছে.— আর যার উদ্দেশ্য ঘোষিত হয় 'Having thus launched our bark under the denomination of *Enquirer*, we set sail in quest of truth and happiness.' এই ঘোষণায়। 'ধর্মসভা'র সঙ্গে এরই সংগ্রাম বাধল : (দ্রষ্টব্য : বিনয় ঘোষের উদ্ধৃতিসমূহ. বিশ্বভারতী, ১২ ৩)—

"The bigots are up with their fulmination. The heat of the *Gurum Sabha* is violent"—ইত্যাদি। "Let the liberals' voice be like that of the Roman—a Roman knows not only to act but to suffer."

এ সঙ্গেই উল্লেখযোগ্য হিন্দু কলেজের প্রথম ছাত্র ও রামমোহনের তরুণ সহযোগী প্রসন্নকুমার ঠাকুরের 'Reformer' (১৮৩৪-১৮৩৫)। বাঙলা ভাষার ও সাহিত্যের সপক্ষে 'রিফর্মার' প্রচার করেছে। 'রিফর্মারে'র পাতায় প্রথম স্বাধীনতার স্বপ্নের ও রাজদ্রোহের ক্ষীণ আভাসও আবিষ্কার করা যায়—১৮৩৪-এর দুটি প্রবন্ধে (দ্রঃ যোগেশচন্দ্র বাগল—প্রসন্নকুমার ঠাকুর, বিশ্বভারতী)। বিশেষ করে রামগোপাল ঘোষের সম্পাদিত (তারাচাঁদ চক্রবর্তী, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতির লেখায় পুষ্ট) ১৮৪২-১৮৪৩ (নবেম্বর), Bengal Spectator-এর নামও পূর্বে করেছি। ১৮১৬এ প্রকাশিত কাশীপ্রসাদ ঘোষের Hindu Intelligencer পরবর্তী Hindu Patriot-এর অগ্রদূত। সিপাহী যুদ্ধের বিদ্রোহের সময়ে ও তৎকালীন নীল বিদ্রোহের দিনে হরিশ মুখুজ্জে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' এ বাঙালী শিক্ষিতের ক্রমপরিপুষ্ট (লিবার‍্যাল্) রাজনৈতিক চেতনার ও দেশপ্রীতির অপূর্ব পরিচয় দেন।

(খ) **সভা-সমিতি:** ভাব-সংগঠনের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠান ইংরেজদের বণিক-সভা ও সাহিত্য-সভা প্রভৃতি অনেক দিন থেকেই ছিল ; কিছু কিছু দেশীয় পদস্থ লোকও তাতে ক্রমে স্থান লাভ করে। রুস্তমজী কাওয়াসজী ও দ্বারকানাথ ঠাকুর ইংরেজ বণিকের শক্তিকেন্দ্র 'বেঙ্গল চেম্বার অব্ কমার্সে'র' সদস্য ছিলেন (যোগেশচন্দ্র বাগল—উঃ শঃ বাঃ)। এশিয়াটিক সোসাইটি (ইং ১৮২৯ পর্যন্ত ভারতীয়দের স্থান দেয় নি), কেরির Agricultural and Horticultural Society প্রভৃতি সাংস্কৃতিক সমিতির কথাও অবিস্মরণীয়।

রামমোহন রায়ের 'আত্মীয় সভা'ই হয়ত বাঙালীর প্রথম সংগঠিত সভা। তাতে বিশেষভাবে তাঁর ধর্মমতের আলোচনা হত। পরবর্তী 'উপাসনা-সভা' (১৮২৮) Unitarian Committee ও ব্রহ্ম-সমাজে (১৮২৯) তা পরিষ্কার হয়। কিন্তু 'আত্মীয়-সভা'য় জাতিভেদ, অসবর্ণ বিবাহ প্রভৃতি বিষয়েও আলোচনা হত। সনাতনীদের 'ধর্মসভা'ও শুধু ধর্মালোচনার সভা নয়, সতীদাহ সমর্থনের আন্দোলনেই তার জন্ম। বলা বাহুল্য, তার পূর্বেই জনমত প্রকাশের অন্য সব পথ আবিষ্কৃত হয়েছে—যেমন, আবেদন-নিবেদন ও টাউন হলে সভা। কিন্তু স্পষ্টরূপে আলোচনা সভা স্থাপিত হয় হিন্দু স্কুলের অন্যতম প্রথম ছাত্র প্রসন্নকুমার ঠাকুরের উদ্যোগে 'গৌড়ীয় সমাজের' প্রতিষ্ঠায় (১৮২৩ সনের ২৩শে মার্চ)। মিশনারিদের আক্রমণে ও নিজেদের প্রাচীন শাস্ত্র সম্বন্ধে অজ্ঞতা দূর

করবার জন্য এ সমিতিতে হিন্দু সমাজের গোঁড়া ও উদার মতাবলম্বীরা অনেকেই একত্রিত হন। সতীদাহ, 'অ্যাঙলিসিস্ট বনাম ওরিয়েণ্টালিস্ট' প্রভৃতি অনিবার্য দ্বন্দ্বের কারণসমূহ তখনও প্রকট হয় নি। বাঙলা ভাষার মধ্য দিয়ে মৌলিক রচনার ও অনুবাদ সাহিত্য ও বিজ্ঞানের প্রচার 'গৌড়ীয় সমাজের' উদ্দেশ্য ছিল। বেশিদিন না চললেও এ 'সমাজ' ব্যর্থ হয় নি'। (দ্রঃ যোগেশচন্দ্র বাগলের প্রবন্ধ: প্রসন্নকুমার ঠাকুর, বিশ্বভারতী পত্রিকা, ৭।৩)। তারপর 'ডিরোজিও'র পর্ব—'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন' বা ইন্স্টিটিউশন (—১৮২৮ সনে আরম্ভ? যোগেশচন্দ্র বাগল, উঃ শঃ বাঃ—পৃঃ ১২৭,—তাতে "সপ্তাহে সপ্তাহে কাব্যদর্শনাদি আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম ও সমাজমূলক নানা প্রশ্ন, যথা—স্বদেশপ্রেম, পাপপুণ্য, সত্যবাদিতা, পৌত্তলিকতা, ঈশ্বরের অস্তিত্ব, নাস্তিক্যবাদ প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতা হইত।" "...it was...more like the Academies of Plato or the Lyceum of Aristotle" (লালবিহারী দে'র ভাষা, বিনয় ঘোষের উদ্ধৃতি—বিঃ ভাঃ ১২।২)। আবার মনে করতে পারি, "The young lions of the Academy roared out, week after week, 'Down with Hinduism! Down with Orthodoxy'!"

তারপর, New societies started up with utmost rapidity... Indeed the spirit of discussion became a perfect mania—এই হল নবাগত (১৮৩০) পাদ্রি আলেকজাণ্ডার ডাফ্-এর কথা। নতুন সমিতি হু-হু করে স্থাপিত হচ্ছে। বলতে হয়, আলোচনা যেন ওদের একটা দুরারোগ্য রোগ হয়ে উঠছে—এবং এ কালেও তা আমাদের যায় নি। এই নিছক ঐহিক শিক্ষা (purely secular education) পাদ্রি সাহেবকে দুঃখিতও করেছিল। এজন্য রামমোহনও হয়ত 'অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান হিন্দু অ্যাসোসিয়েশন' (১৮৩০) স্থাপনে সায় দিয়েছিলেন। যা'হোক, এ সকল আলোচনার প্রধান লক্ষণ ছিল মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা। এ সব সভা-সমিতি সবাইকার দানেই পরিপুষ্ট হয়। দু-একটির কথা তবু অবিস্মরণীয়—যেমন, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পরিচালিত ১৮৩২ সনের 'সর্বতত্ত্বদীপিকা-সভা', তারাচাদ চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে পরিচালিত 'ইয়ং বেঙ্গলে'র বিবিধ ও বিচিত্র আলোচনার 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা' (Society for the Acquisition of General

Knowledge, ১৮৩৮-এ স্থাপিত) যেখানে রিচার্ডসনকে (১৮৪৩) ক্ষমা চাইতে হয়। আর সর্বাধিক সার্থক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তত্ত্ববোধিনী-সভা (১৮৩৯এর ৬ই অক্টোবর স্থাপিত), কালীপ্রসন্ন সিংহের 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা' (ইং ১৮৫৩) এবং ইংরেজ-বাঙালীর একযোগে প্রতিষ্ঠিত (১৮৫১) ও পরিচালিত 'বেথুন সোসাইটি (দ্রঃ সাঃ পঃ পত্রিকা, ১৩৬৩, ১ম—৪র্থ সংখ্যা)।

মাত্র দশজন সভ্য নিয়ে তত্ত্ববোধিনীর সূচনা, দু বৎসরে সভ্য-সংখ্যা ৫০০ ছাড়িয়ে যায়, ক্রমে তা ৮০০তে ওঠে। একই কালে এর মধ্যে এসে সমবেত হন অক্ষয়কুমার দত্তের মত নিরঙ্কুশ জ্ঞানোপাসকেরা, এবং দেবেন্দ্রনাথের অনুগত রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতির মত স্বদেশভক্ত অধ্যাত্মবাদীরা। 'ইয়ং বেঙ্গলের বিদ্রোহের মধ্যে যে আত্মবিস্মৃতি ছিল তাতেই তাঁদের বিদ্রোহ ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। তাঁরা অনেকাংশে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর জাতির প্রাণকেন্দ্রের সঙ্গে শিক্ষিত নেতৃবর্গের এই বিচ্ছিন্নতা দূর করলেন। কিন্তু তাকে একটা অধ্যাত্ম-আদর্শের সঙ্গেও তিনি বেঁধে দিলেন। পরবর্তী-কালে তাঁর সেই ভাবুকতার মধ্য দিয়ে বাঙলা সাহিত্যে ভাবুকতায় সমৃদ্ধ সাহিত্য জন্মাল, তা ঠিক। কিন্তু বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার, প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদারের স্পষ্ট বস্তুনিষ্ঠ চিন্তার ধারাও কতকটা এ অধ্যাত্ম আদর্শে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, তাতেও ভুল নেই।

'বেথুন সোসাইটি' একটু পরে (১৮৫১) স্থাপিত হয়, তখন শিক্ষিত চেতনা রূপলাভ করছে। বিদ্যাসাগর, রঙ্গলাল এখানে প্রবন্ধ পাঠ করেন। সংস্কৃতি ক্ষেত্রে সমিতির দান কোনো কোনো দিকে অভিনব ; আর ১৮৫৯ থেকে 'জাগরণের' দিনেও নবোদ্যমে এই সোসাইটি অগ্রবর্তী হয়। বিজ্ঞানের আলোচনা ছিল তার একটা প্রধান কাজ। পাদ্রি জেমস্ লঙ্-এর উদ্যোগে সমাজ-বিজ্ঞানের আলোচনারও সূত্রপাত হয় এখানে। ইং ১৮৫৭-৫৮ পর্যন্ত 'বেথুন সোসাইটি'র অগ্রগণ্য কর্মীদের মধ্যে মার্কিন একেশ্বরবাদী পাদ্রি সি. এচ্. এ ড্যাল, জেম্স হিউম, ও চেভার্স প্রমুখ বিদেশীয়দের সঙ্গে পাই বিদ্যাসাগর, প্যারীচাঁদ মিত্র, কিশোরীচাঁদ মিত্র, ডাঃ গুডিভ্ চক্রবর্তী, রামচন্দ্র মিত্র, নবীনকৃষ্ণ বসু, প্রমুখ দেশীয়দের (১৮৫৯এ ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারও প্রবন্ধ পাঠ করেন)। বাঙলা সাহিত্যে এঁদের কারও কারও নাম নেই, কিন্তু বাঙালী মানসে দান রয়েছে। তাই পরবর্তী (সিপাহী যুদ্ধের শেষে ও নীল-

বিদ্রোহের সময়ের) একটি ঘটনা এখানেই উল্লেখ করছি—ইং ১৮৫৯-৬০এর সদস্য তারাপ্রসাদ চক্রবর্তীর কথা.— তিনি ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের জামাতা, পরে গুণবান্ বাঙালীর মতই ডিপুটিপদ পান। কিন্তু বেথুন সোসাইটির সভায় সেবার তিনিই সর্বপ্রথম এই মর্মে রাজনৈতিক উক্তি করেন যে, ইংরেজ ভারতবর্ষ ত্যাগ না করলে কি ইংরেজ, কি ভারতবাসী কারো মঙ্গল হবে না। (দ্রষ্টব্য যোগেশচন্দ্র বাগল, 'বেথুন সোসাইটি', সাঃ পঃ পত্রিকা ১৩৬৪, ৪র্থ সংখ্যা)।

জাতীয় চেতনা যে কতটা অগ্রসর হয়েছে তার প্রমাণ 'বেঙ্গল-ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়া সোসাইটি' নামে প্রথম রাজনৈতিক সমিতির প্রতিষ্ঠা (১৮৪৩)। এটি শুধু আলোচনা সভাই নয়, শাসন ও রাজনৈতিক প্রশ্নের আলোচনার জন্য সংঘবদ্ধ আন্দোলনেরও সভা। তৃতীয় দশকেই সতীদাহ-প্রশ্ন, অ্যাঙলিসিস্ট বনাম ওরিয়েণ্টালিস্টএর বিতর্ক, শেষে ১৮৩৩ সনের সনদ পরিবর্তন-কালীন নানা রাজনৈতিক সংস্কারমূলক প্রস্তাব অবলম্বন করে এদেশের 'পাব্লিক লাইফ' ও রাজনৈতিক চেতনা অগ্রসর হয়েছিল। ১৮৪০ সনে দ্বারকানাথ ঠাকুর বিলাত থেকে পার্লামেণ্টের সভ্য ভারতবন্ধু মিঃ জর্জ টমসনকে এদেশে এই রাজনৈতিক সংগঠন স্থাপিত করবার জন্য নিয়ে আসেন। 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা'য় প্রথম টমসন সাহেব এ বিষয়ে বাঙালী নেতাদের সঙ্গে আলাপ করেন। তাতে বিলাতে প্রতিষ্ঠিত 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি'র মত সংস্থা গঠনের প্রস্তাব স্থির হয়। ১৮৪৩, ২০এ এপ্রিল তারাচাঁদ চক্রবর্তী সে প্রস্তাব উত্থাপন করেন, তারপর সোসাইটি গঠিত হয়। প্রস্তাবে সমিতি গঠনের উদ্দেশ্য বলা হয়—দেশের অবস্থা, আইন-কানুন প্রভৃতি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশ, শান্তিপূর্ণ ও আইন-সঙ্গত উপায় (means of peaceable and lawful character) গ্রহণ করে দেশবাসীর সর্বশ্রেণীর মঙ্গল সাধন, তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার ও স্বার্থবৃদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে বিশেষ অগ্রসর না হলেও এ সমিতিই পরে 'ল্যাণ্ড-হোল্ডাস্' অ্যাসোসিয়েশনে'র সঙ্গে মিশে 'বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসো-সিয়েশনে' (১৮৫১, ২৯শে অক্টোবর) পরিণত হয়। তার কিছু পূর্বেই অবশ্য খ্রীষ্টান আক্রমণে প্রগতিবাদী ও রক্ষণশীল হিন্দুরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলেন। রাধাকান্ত দেব নব-শোধিত 'বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদক হন। এটি প্রধানত জমিদার ও সম্ভ্রান্তগণের প্রতিষ্ঠান। কিন্তু রাজনৈতিক সংগঠনের ইতিহাসে এই সোসাইটি

দেশীয় লোকের প্রথম সংগঠন; জাতীয় মেলার (১৮৬৭) বিশ বৎসর, ও জাতীয় কংগ্রেসের ৪০ বৎসর পূর্বে এর জন্ম।

১৮৪০ থেকে ১৮৫০এর মধ্যেই তাই দেখতে পাই বাস্তব ও ভাব-জীবনের পরিবর্তন সুস্পষ্ট হয়েছে। ১৮৪৯এ বেথুন সাহেব চারটি প্রস্তাব উত্থাপন করে মফঃস্বলের বিচারালয়ে ইংরেজদের বিচারের অনুমতি দিতে চেয়েছিলেন। তার বিরুদ্ধে সাহেবরা তীব্র বিক্ষোভ দেখায়। এ প্রস্তাবসমূহের তারাই নাম দেয় 'ব্ল্যাক অ্যাক্‌ট্‌স্‌।' রামগোপাল ঘোষের নেতৃত্বে বাঙালীরাও উল্টো দিকে প্রস্তাব সমর্থনে অগ্রসর হয়। সাহেবরাই অবশ্য জয়ী হয়, কিন্তু বাঙালীর রাজনৈতিক চেতনা এ সূত্রে আরও বৃদ্ধি পায়। এর পরে একদিকে ডালহৌসির রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সংগঠন, অন্যদিকে বিদ্যাসাগরের শিক্ষা-সমাজ-সংস্কার। ১৮৫৩এর সনদ পরিবর্তনের সময়ে বাঙালীরা যে দাবি তুলল তা বিশেষ তাৎপর্যময়—যথা, নীল ও লবণে কোম্পানির একচেটিয়া ব্যবসায়ের অবসান, দেশীয় শিল্পের উৎসাহদান, ভারতীয়দের উচ্চপদে নিয়োগ এবং ভারতশাসনের জন্য ভারতীয়-সংখ্যাধিক্যযুক্ত আইন সভা নিয়োগ। তারপরে এল শিক্ষা ডেস্‌প্যাচ (১৮৫৪); ১৮৫৭এর জানুয়ারিতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হল। এ সবে মিলে বাঙালী শিক্ষিতের লিবার‍্যল্‌ রাজনৈতিক চেতনাই পরিপুষ্ট হয়।

১৮৫৭এর মার্চ মাসের ২৯শে যখন ব্যারাকপুরের সিপাহীরা বিদ্রোহ করল—মঙ্গল পাণ্ডে বীরের মত প্রাণ দিল—তখন তা এই বাঙালী শিক্ষিতদের দৃষ্টিতেও পড়ে নি। সিপাহী বিদ্রোহের আগুন অবশ্য মে মাসে জ্বলে উঠল। বাঙালী শিক্ষিত শ্রেণীর পক্ষে তখনও প্রধান কর্তব্য মনে হয়েছে—আত্মপ্রস্তুতি—বুর্জোয়া জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসার, জাতীয় ঐক্য, সংঘবদ্ধ প্রতিবাদ, সাধ্যায়ত্ত সংস্কারের জন্য আন্দোলন (Fight for limited objectives), যেমন,—সিপাহীদের প্রতি পরবর্তী অত্যাচারের প্রতিবাদ, নীলকরের অত্যাচারের প্রতিরোধ। সহানুভূতিশীলদের দৃষ্টিতেও সিপাহী বিদ্রোহ ছিল অকাল বোধন। সাহিত্য-রচনা, নাট্যাভিনয়, কোনো জিনিসেই তাঁরা বিক্ষিপ্ত মানসের পরিচয় দেন নি। বাঙালীর সমগ্র চিত্ত তখন সৃষ্টির প্রেরণায় উন্মুখ—তার জীবন-পিপাসা প্রকাশ-বেদনায় থর থর কম্পমান।

ইং ১৮০০ থেকে ১৮৫৭, বাঙলার ইতিহাসের এই কালটির দিকে এখন সমগ্রভাবে একবার তাকিয়ে দেখলে পূর্ব পূর্ব যুগের তুলনায় বাঙালী জীবন যে কত গতিমান, কত পরিবর্তমান হয়ে উঠেছে তা বুঝতে পারি। আধুনিক কালের প্রধান যুগলক্ষণ এই গতি। কাল যতই এগিয়ে চলে সেই গতির মাত্রা ততই (tempo) ক্ষিপ্রতর হয়। ততই জটিল ও বিচিত্র ঘটনা ও ভাবধারায় জীবন ঐশ্বর্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে। এই দীর্ঘকালের মধ্যে সেই ঔপনিবেশিক পরিবেশও কেবলই পরিবর্তিত হয়ে চলেছে—রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে, এবং শিক্ষা-সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের ক্ষেত্রেও তা স্পষ্ট। ১৮০০ থেকে ১৮১৫ এই কালে—ইংরেজ আধিপত্যে একরাজ্য-বন্ধনে ভারত আবদ্ধ হচ্ছে, শিল্প-বিপ্লবে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা নূতনতর হচ্ছে, সনদ বদল হয়ে নতুন ধনিকশক্তি স্বীকৃতি লাভ করছে। তথাপি মনে হয় সে কাল মন্দ-স্রোত। তারপর রামমোহনের পর্বায়—সংঘাতের আরম্ভ, যন্ত্রের আগমন, শহুরে মধ্যবিত্তের ও শিক্ষিত শ্রেণীর জন্ম। তৃতীয় পর্যায়ে 'ইয়ং বেঙ্গলে'র উন্মাদনার মুখে দেশ যখন টলমল তখনই অন্তদিকে কয়লা, চা প্রভৃতি ব্যবসায়ের গোড়াপত্তন হচ্ছে, যার ফলে রুস্তমজী কাওয়াসজী, দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতির ভাগ্যাকাশও আচ্ছন্ন হতে বাধ্য; চাকরির পথেই বরং মধ্যবিত্তের নতুন প্রতিষ্ঠা লাভ হচ্ছে, 'সংবাদ-প্রভাকরে'র পাতায় গুপ্ত কবির দেশীয় স্বাদেশিকতা আত্মপ্রকাশ করছে। তারপরে এল 'তত্ত্ববোধিনী'র পালা—বিদ্যাসাগরের কাল। তা'ই আবার ডালহৌসির যুগ, শিক্ষার যুগ, যন্ত্রযানের যুগ, নব্য ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের গোড়াপত্তনের যুগ, আর বিদ্যাসাগরের মানবতার যুগ। সকলের দানে বাঙলা গদ্য জয়লাভ করছে, বাঙলা পদ্য পথ খুঁজছে, বাঙলা নাটক প্রতিভাকে আহ্বান করবার জন্ম উদ্‌গ্রীব—এক কথায় বাঙালী সমাজ ও বাঙলা সাহিত্য সৃষ্টির জন্ম প্রস্তুত।'

সমগ্রভাবে এ পর্বের সর্বপ্রধান সাহিত্যকর্ম তাই—বাঙলা গদ্যের উদ্ভাবনা। কেরির আমল থেকে বিদ্যাসাগরের প্রথম যুগ পর্যন্ত দীর্ঘকালের মধ্যে বাঙলা গদ্য ক্রমে দাঁড়িয়ে যায়। গদ্যেও সৃষ্টির কার্য আরম্ভ হয়—ব্যঙ্গ রচনা ও উপন্যাসের উন্মেষ তার নিদর্শন। অবশ্য বাঙলা নাটকেরও অভিনয় বৃদ্ধি পায়। এ পর্বেই নাটক প্রণয়ন আরম্ভ হয়, কিন্তু তার যথার্থ প্রতিষ্ঠা হয় পরবর্তী পর্বে—দীনবন্ধু-মাইকেলের দানে। সাহিত্যে সৃষ্টির সর্বাপেক্ষা বড় নিদর্শন

কাব্য—বাঙলা কাব্যের সম্বন্ধেও একথা সত্য। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্ত থেকে মধুসূদন (১৮৬০-৬১) ঐতিহ্যের পরিণতি মাত্র নয় ; মধুসূদন এক বৈপ্লবিক বিকাশ। রঙ্গলাল প্রতিভাহীন। ঈশ্বর গুপ্ত এই শিক্ষিতদের বাঙলা রচনায় প্রেরণা দিয়ে একটা সেতুবন্ধনের কাজ সমাধা করেছেন। তাঁর নিজের দানের মূল্য বোঝা যায় একথা মনে রাখলে যে, গতানুগতিক ধারার সাহিত্য—কবিওয়ালা, তর্জা, খেউড় প্রভৃতি তাঁর কালেও পরিমাণে সামান্ত ছিল না।

কিন্তু প্রস্তুতি পর্বের সাহিত্যের প্রধান কৃতিত্ব সৃষ্টিতে নয়—নূতন জীবনযাত্রার জন্য জাতিকে প্রস্তুত করাতে, নূতন জীবনদর্শন প্রতিষ্ঠা করাতে, আর নূতন সাহিত্যাদর্শ আবিষ্কার করাতে। সে যুগের সাহিত্যের কাজ এই—এ কথা মনে রাখা প্রয়োজন। রস-বিচারে তার অনেকটাই সাহিত্য নয়, কিন্তু জীবন-বিচারে তাকে শিক্ষা ও ভাব-সংঘাতের সাহিত্য বলাও প্রয়োজন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গদ্য সাহিত্যের গোড়াপত্তন

(খ্রীঃ ১৮০০—খ্রীঃ ১৮৫৭)

মলিয়েরের নাটকের চরিত্র হঠাৎ আবিষ্কার করে অবাক হয়ে গেল – চিরদিনই সে গদ্যে কথা বলেছে। উনিশ শতকে পৌছে বাঙালীরও এই রকম বিস্ময়ের কারণ ঘটল – চিরদিনই সে কথা বলেছে গদ্যে আর লিখেছে পদ্যে। অন্তত আটশ' বা ন'শ' বছর ধরে এইরূপ চলেছে। দশম বা একাদশ শতকের চর্যাপদের দিন থেকে একেবারে ইং ১৮০১ অব্দের 'রাজা প্রতাপ আদিত্য চরিত্রে'র পূর্বক্ষণ পর্যন্ত বাঙলা সাহিত্য হচ্ছে বাঙলা পদ্য— বিশেষ করে পদ ও পাঁচালী। কিন্তু তাতে যে কি বিস্ময়কর সূক্ষ্ম আলোচনাও সম্ভব তার প্রমাণ কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

প্রায় সব সাহিত্যেই দেখি পদ্য আগে, গদ্য পরে। মনের মত কথা ও মনে রাখবার মত কথা সুর দিয়ে, ছন্দ দিয়ে ও মিল দিয়ে বলাই ছিল রীতি, নইলে তা বললেও স্মৃতিতে জীইয়ে রাখা যায় না। আর লেখা তো কথাকে জীইয়ে রাখবারই একটা কৌশল। লিখিত কথা ছন্দে ও মিল দিয়ে বলাই ছিল নিয়ম—অবশ্য মন্ত্র হলে ভিন্ন কথা, তা চিরবন্দনীয়।

অনেক ভাষার থেকে বাঙলায় যে গদ্য বিলম্বে জন্মাল তার একটা কারণ বাঙলা পয়ারের সহজ নমনীয়তা ও প্রকাশ-ক্ষমতা। 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'ই তার প্রমাণ। হয়ত এজন্যই বাঙলা গদ্যের অন্ধকার যুগ এত দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে। এবং আরও আশ্চর্যের কথা এই যে, সাগরপারের পাশ্চাত্ত্য জাতিরা এসে সুচতুরা ধাত্রীর মত গদ্যকে জননী-জঠর থেকে মুক্তি না দিলে হয়ত বাঙলা সাহিত্যের কোল সে তখনও আলো করত না। এ কথাটা অবশ্য উলটিয়েও বলা যায়—পাশ্চাত্ত্য জাতিদের আগমন ও বিস্তারের সঙ্গে আধুনিক যুগের আরম্ভ হল আর তাই গদ্যের প্রয়োজনও ক্রমেই বেশি ক'রে অনুভূত হল। কারণ, আধুনিক কাল ও তার জটিল জীবনযাত্রার দাবী গদ্য ছাড়া শুধু পদ্যে পূরণ করা যায় না। আধুনিক কাল না আসা পর্যন্ত গদ্যের আবশ্যকতা অনিবার্য হয়ে ওঠেনি। না হলে সংস্কৃত গদ্য বাঙালী লেখকদের

সম্মুখেই ছিল, উপনিষৎ ও নানা বিষয়ের ভাষ্যটীকা প্রভৃতির কথা ছেড়ে দিলেও সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যের কাদম্বরী, দশকুমারচরিত, বা হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্রে ব্যবহৃত গদ্য নামক ভাষাশৈলীর সঙ্গে তাঁরা পরিচিত ছিলেন। ফারসী, আরবী গদ্যের সঙ্গেও তাঁদের পরিচয় না ছিল তা নয়। দলিল দস্তাবেজ ছাড়া সাধারণ চিঠিপত্রও নিশ্চয়ই গদ্যে লেখা হত, তার প্রমাণও রয়েছে। বাঙালী বৈষ্ণবেরা তাঁদের নিবন্ধেও কিছু কিছু ভাঙা গদ্য ব্যবহার করেছেন। তবু পর্তুগীস পাদ্রীরাই প্রথম প্রয়োজনের তাগিদে বুঝলেন—খ্রীষ্টধর্মের কথা এদেশের লোককে বুঝিয়ে বলতে হলে লোকের কথাবার্তার রীতিতে গদ্যেই তা বলা দরকার। কিন্তু পর্তুগীসরাও বাঙালীর মনে গদ্যের এই প্রয়োজনবোধ জাগাতে পারেনি। আধুনিক যুগের বিচিত্র জীবনস্রোতের বাহন হয়ে এদেশে পর্তুগীসরা আসেনি। তা হয়ে এল ইংরেজ, যার সাহিত্যে গদ্যের প্রয়োজন পদ্যের ঐশ্বর্যের মতই তার পূর্বে সুপ্রমাণিত হয়ে গিয়েছে। জীবন-যাত্রায় যে আলোড়ন তারা তুলল, তারই প্রয়োজনে গদ্য-সাহিত্যের উদ্ভব (ইং ১৮০০ থেকে ১৮১৫র মধ্যে)। তার পরে যুগ-জীবনের সেই তাগিদ মেটাতে মেটাতে বাঙালীরও প্রস্তুতি চলল, বাঙলা গদ্যেরও প্রস্তুতি চলল (ইং ১৮১৫-১৮৫৭)। ক্রমে আমাদের আত্মপরিচয়ে সুনিশ্চিত হল গদ্যেরও ক্রমবিকাশ (ইং ১৮৭২ অব্দে 'বঙ্গদর্শন'-এর কাল থেকে)— এই হল উনিশ শতকের বাঙলা গদ্যের ইতিহাস।

॥ ১ ॥ বাঙলা গদ্যের অন্ধকার যুগ

কাল-নিশ্চয়তা এ-দেশের বহুক্ষেত্রেই দুঃসাধ্য, এমন কি, পুঁথিপত্রের প্রমাণও প্রায়ই অপরীক্ষিত। এই সহজ সত্য মনে রেখেই বলা যায়—(১) প্রথম বাঙলা গদ্যের নমুনা বোধ হয় ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে (১৪৭৭ শকাব্দে) অহোমরাজ স্বর্গনারায়ণকে (=স্বর্গদেব ?) কোচবিহারের মহারাজা নরনারায়ণের লেখা পত্র। 'স্বর্গনারায়ণ' (১৫৬০ শকাব্দ) যদি 'স্বর্গদেব' না হন, তা হলে এ পত্রের তারিখের (১৪৭৭ শকাব্দ) সঙ্গে প্রায় একশত বৎসরের গরমিল ঘটে, আর পত্রের প্রামাণিকতায়ও সন্দেহ থেকে যায়। তবু পত্রের তারিখ অনুযায়ী খ্রীঃ ১৫৫৫ অব্দের বাঙলা গদ্যের নিদর্শনরূপে এখনও একে মেনে নেওয়া হয়। তার ভাষা থেকে এ কথাও বোঝা যায় সাধু ভাষা'র প্রচলনই সর্বস্বীকৃত।

(ক) **চিঠিপত্র দলিল-দস্তাবেজের গদ্য:** শিরোনামায় সংস্কৃত সম্ভাষণাদির পরে মহারাজা নরনারায়ণের লিখিত এই প্রাথমিক বাঙলা গদ্যের নমুনা এই রকম :—

লেখনং কাযঞ্চ। এথা আমার কুশল। তোমার কুশল নিরন্তরে বাঞ্ছা করি। অখন তোমার আমার সন্তোষ সম্পাদক পত্রাপত্রি গতায়াত হইলে উত্তরানুকুল প্রীতির বীজ অঙ্কুরিত হইতে রহে। তোমার আমার কর্ত্তব্যে বার্দ্ধতাক পাই পুষ্পিত ফলিত হইবেক। আমরা সেই উদ্যোগত আছি। ইত্যাদি।

সন্দেহ নিরসন হয় না। তবে পরের শতাব্দীতে অহোম রাজাদের একাধিক চিঠি পাওয়া যায়। তা অবশ্য পুরনো অসমিয়া ভাষা। কিন্তু পুরনো অসমিয়া ('কামরূপিয়া') আমাদের উত্তরবঙ্গের বাঙলা ভাষার সঙ্গে প্রায় অভিন্ন। সে সব চিঠির ভাষার রূপ এ চিঠির ভাষারূপের সগোত্র। কোচবিহার, কাছাড়ের রাজভাষাও ছিল বাঙলা।

যে-লেখা সম্বন্ধে সন্দেহ নেই তা হচ্ছে ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ঢাকা অঞ্চলের উপভাষায় লেখা একখানি চুক্তিপত্র। ব্রিটিশ মিউজিয়ামের বাঙলা কাগজপত্রের মধ্যে তা পেয়ে শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৩২৯এর (১৯২২) 'বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা'য় (তৃতীয় সংখ্যায়) তার ফটোগ্রাফ প্রকাশ করেন। তাতে জানি—সোনারগাঁয়ের দু'জন সাহেবের (গই ও গারবেল) আড়তের দালালি নিচ্ছে কৃষ্ণদাস ও নরসিংহদাস। উপভাষার নমুনা (ও-কার স্থলে উ-কার) হলেও বোঝা যায় বাঙলা গদ্যের সাধুরূপ ঠিক হয়ে আছে। এর তুলনায় প্রায় ৭৫ বৎসর পরেকার লিখিত (১৭৭৮ খ্রীঃ অব্দের) মহারাজ নন্দকুমারের পত্র (পুত্র গুরুদাসের নিকট) অধিক গুরুতর, কিন্তু তখনকার বাঙলা গদ্যের নমুনা দুর্লভ নয়,—চিঠিপত্রের বাঙলা গদ্যে তখন প্রায়ই পাই ফারসী শব্দের ছড়াছড়ি। বরং তার পূর্বে ১৭৩১ খ্রীঃ অব্দের (বাং ১১৩৮ সালের) গৌড়ীয় মোহান্তগণের লিখিত 'ইস্তফাপত্র' ও জয়পুরের প্রেরিত সভাপণ্ডিত কৃষ্ণদেব ভট্টাচার্যের 'অজয়পত্র' বৈষ্ণব-ইতিহাসের গুরুতর জিনিস (এ পত্রটি অবশ্য পাঠ্য। 'বঙ্গসাহিত্য পরিচয়', পৃঃ ১৬৩৮-৪৩ দ্রষ্টব্য)। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া না পরকীয়া, এ বিচারে জয়পুরের স্বকীয়াবাদের পণ্ডিতেরা পরাজিত হয়ে বাঙলার পরকীয়াবাদের পণ্ডিতদের কাছে এই পরাজয়-পত্র লিখে দিয়েছিলেন। এই পত্র নানাদিক থেকেই ইতিহাসের একটি মুখ্য দলিল।

(খ) **নিবন্ধাদির গদ্য :** এই সব চিঠিপত্র দলিল-দস্তাবেজের ভাষা থেকে বৈষ্ণব নিবন্ধকারদের লিখিত ভাষা স্বতন্ত্র, কিন্তু তাই বলে তাতে বাঙলা গদ্যের যথার্থ রূপ অধিক প্রতীয়মান, এমন নয়। পণ্ডিতী বিচারের প্রশ্নোত্তরের বা সহজিয়া সাধনার সাঙ্কেতিক ভাষার ছাঁদ সে সবে স্পষ্ট। তার মধ্যে প্রাচীনতম নিদর্শন বলে ধরা হয় রূপগোস্বামীর 'কারিকা'। প্রামাণিক বলা যায় নরোত্তম দাস লিখিত 'দেহকড়চা' নামক নিবন্ধের (১৬৮১-৮২ খ্রীষ্টাব্দ; দ্রঃ সুকুমার সেন, বাঃ সাঃ গদ্য) গদ্য। নমুনা :—

"তুমি কে। আমি জীব। তুমি কোন্ জীব। আমি তটস্থ জীব। থাকেন কোথা। ভাণ্ডে। ভাণ্ড কিরূপ হইল। তত্ত্বস্থ হৈতে।" ইত্যাদি।

এ হচ্ছে প্রশ্নোত্তরের ভাষা। কড়চা বা নিবন্ধের ভাষা প্রায়ই এই এক ছাঁদের।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে গদ্য রচনার নানা নিদর্শন পাওয়া যায়। সহজিয়া নিবন্ধ, শূন্য পুরাণের (?) গদ্য ভাগ, ও কবিরাজী পাতড়া থেকে ন্যায়-জ্যোতিষের নিবন্ধ পর্যন্ত বহু ধরণের নমুনা দুর্লভ নয়। এ সবের কোথাও কোথাও যথার্থ বাঙলা গদ্যেরও সূত্রপাত দেখতে পাই। যেমন, 'ভাষাপরিচ্ছেদের' অনুবাদের (১৭৭৪-৭৫ খ্রীষ্টাব্দের) পুঁথির প্রারম্ভে :

"গৌতম মুনির শিষ্য সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন আমাদিগের মুক্তি কি করিলে হয় তাহা কৃপা করিয়া বলহ। তাহাতে গৌতম উত্তর করিতেছেন। তাবৎ পদার্থ জানিলেই মুক্তি হয়। তাহাতে শিষ্যেরা সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন। পদার্থ কতো।.........ইত্যাদি।"

এও অবশ্য প্রশ্নোত্তরে দর্শনের কথা। পঁচিশ বৎসর পরে কেরি বা ৪০ বৎসর পরে রামমোহন এ বিষয়ে যেরূপ বাঙলা লিখেছিলেন তার অপেক্ষা এ বাঙলা নিকৃষ্ট নয়। অবশ্য কালানুক্রমে ধরতে গেলে 'ভাষাপরিচ্ছেদে'রও ৩০ বৎসর পূর্বে পর্তুগীসরা বাঙলা গদ্য লিখছিলেন এবং তাই পুঁথির বাইরে মুদ্রিত ও প্রকাশিত বাঙলা ভাষার প্রথম নিদর্শন। আরও বড় কথা, পলাশীর ত্রিশ বৎসর পূর্বে (১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দে) 'সাহিত্যিক গদ্যে'রও আভাস মিলে।

(গ) **গল্পের গদ্য :** 'নিবন্ধ'-সাহিত্যের মধ্যেই কথাবার্তার রেশ শুনতে পাই। কিন্তু ভাগ্যক্রমে একটি গল্পের নিদর্শন বাঙলা গদ্যে বেঁচে আছে। ১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দে রচিত '৺মহারাজ বিক্রমাদিত্য চরিত্র' নামক গদ্য গল্পের নমুনাটি এই জন্য বিশেষ মূল্যবান (এটিও ব্রিটিশ মিউজিয়ম থেকে শ্রীযুক্ত

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় নকল করে আনেন)। এটি গল্পগুণে যাই হোক্ জাতিতে সাহিত্য। প্রথম দুটি বাক্য উদ্ধৃত করছি (বন্ধনীতে ছেদ অবশ্য আমরাই দিচ্ছি পাঠকের পক্ষে বোঝবার সুবিধা হবে বলে) :

"মোং ভোজ্জপুর (।) শ্রীযুক্ত ভোজরাজা (।) তাহার কন্যা শ্রীমতি মৌনাবতি (।) সোড়ব বরিস্থা (।) বড সুন্দরি (।) মুখ চন্দ্র তুল্য (।) কেষ মেঘের রঙ্গ (।) চক্ষু আকর্ন্ন পর্য্যন্ত (।) যুঙ্গ্য ভ্রূর ধনুকের নেয়ায় (।) ওষ্ঠ রক্তিমে বর্ন্ন হস্ত পদ্মের মৃণাল (।) স্তন দাড়িম্ব ফল (।) রূপলাবণ্য বিদ্যুৎছটা (।) তার তুলনা আর নাঞী (।) এমন সুন্দরি কন্যার বিবাহ হয় নাঞী। কন্যা পন করিয়াছে (।) রাত্রের মধ্যে জে কথা কহাইতে পারিবেক তাহাকে আমি বিভা করিব।..."

ভাষা নিশ্চয়ই বাঙলা, কিন্তু সাহিত্যাদর্শ সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্র সম্মত। বাঙলা গদ্যের দিক থেকে বলা যায়—উনিশ শতকেও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের আবির্ভাবের পূর্বে এরূপ গদ্য লেখা কম কথা নয়। এ লেখাকেই তাই বাঙলা গদ্য সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন বলতে পারি। সাহিত্য না হলেও সাহিত্যধর্মী এই প্রথম গদ্য।

অতএব দেখছি দলিল-পত্রের প্রয়োজনের গদ্য ছেড়ে যুক্তির গদ্য (যেমন, ভাষাপরিচ্ছেদের) ও সরস গদ্য (যেমন, এই বিক্রমাদিত্য চরিত্রের)—সাহিত্যের দুই রীতির গদ্য বাঙালী নিজেই অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে আবিষ্কার করছিল।

(ঘ) **পর্তুগীসদের গদ্য-চর্চা** : কিন্তু এসব লেখা পুঁথিতেই নিবদ্ধ। সচেতন গদ্য-চর্চায় ও গদ্য-ব্যবহারের কৃতিত্ব পর্তুগীস্ পাদ্রি ও তাঁদের শিষ্যদের, তা মানতেই হবে। বিশেষ করে, মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে তাঁরাই অন্ধকার যুগের অন্তকাল ঘোষণা করেছিলেন। রোমান হরফে বাঙলা গ্রন্থ মুদ্রিত করে গদ্যকে তাঁরা স্থিরত্ব দিতে ও বহুল প্রচারিত করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু পর্তুগীজ্রী বাঙলা গদ্যের উদ্ভবক্ষেত্র পূর্ব ও মধ্য বাঙলা, তাই পর্তুগীসরা বাঙলা গদ্যের প্রতিষ্ঠিত সাধুরূপ সর্বত্র রক্ষা করতে পারেননি। উপভাষার উপলাঘাতে ও বিদেশী বাক্যরীতিতে তাঁদের লিখিত গদ্য পড়তে গেলে বারে বারে ঠেকে যেতে হয়। তা ছাড়া, তাঁদের মুদ্রিত বাংলা বই রোমান্ হরফে মুদ্রিত। বাঙলা হরফে বাঙলা লেখা মুদ্রিত না হতে (খ্রীঃ ১৭৭৮ ও খ্রীঃ ১৭৮৩) বাংলা গদ্যের অন্ধকার যুগের অবসান হয়েছে, তা বলা যায় না। পর্তুগীস রাজ্যের মতই পর্তুগীস গদ্যও অতীত ইতিহাসের বস্তু—বাঙালীজীবনে তা প্রভাব বিস্তার করেনি। বাঙলা গদ্যের ইতিহাসে সেই চিহ্ন এখন অনেক সময় খুঁজেও পাওয়া

যায় না। যেমন, (১) খ্রীঃ ১৬৮৩ অব্দের পূর্বে লেখা পাদ্রি সাস্তচি, গোমেশ ও সরয়বা নামক তিন জনের লিখিত বাঙলা শব্দ তালিকা, ব্যাকরণ, খ্রীষ্টীয় প্রার্থনা, খ্রীষ্টশাস্ত্র প্রভৃতি ; (২) সোনারগাঁয়ের শ্রীপুরের জেসুইট্ পাদ্রি ফেরনান্দেস্-এর ১৫৯৯এর পূর্বে লিখিত খ্রীষ্টধর্মের ব্যাখ্যান প্রসঙ্গ ; (৩) খ্রীঃ ১৫৯৯ অব্দে লিখিত সোসার খ্রীষ্টীয় প্রশ্নোত্তরের গ্রন্থ, এবং (৪) খ্রীঃ ১৭২৩এর পূর্বে পাদ্রি বের্‌বিয়েরের ক্ষুদ্র খ্রীষ্টীয় প্রশ্নোত্তর পুস্তিকা ;—চিঠিপত্র থেকে এসবের কথা এখন শুধু জানা যায়, নিদর্শন পাওয়া যায় না।

ইতিহাসের হাতে পৌঁচেছে মাত্র খানদুই পর্তুগীস গ্রন্থ : (১) দোম আন্তোনিওর 'ব্রাহ্মণ-রোমান্ ক্যাথোলিক সংবাদ' সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পাদে লিখিত হয়ে থাকবে (ডঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন ঐ নামে মূল পুঁথির অধিকাংশ সম্পাদন করেছেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তা ইং ১৯৩৭এ প্রকাশ করেছেন। তার 'প্রস্তাবনা'ও দ্রষ্টব্য)। গ্রন্থের লেখক বাঙালী : ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দের দিকে ভূষণার এক জমিদার-পুত্রকে মগ দস্যুরা অপহরণ করে। আগস্তিন সম্প্রদায়ের এক পর্তুগীস পাদ্রি তাকে টাকা দিয়ে ক্রয় করেন এবং খ্রীষ্ট ধর্মে দীক্ষিত ও শিক্ষিত করেন। এই ভূষণার জমিদার পুত্রেরই নাম দোম আন্তোনিও। তিনি খ্রীষ্টধর্মের বড় প্রচারক হন, প্রায় ত্রিশ হাজার লোক নাকি তাঁর প্রভাবে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে। এই গ্রন্থ তাঁরই রচনা। যেন একজন খ্রীষ্টান পাদ্রির ও ব্রাহ্মণের মধ্যে ধর্মের বিচার হচ্ছে, গ্রন্থটি এভাবে লেখা। প্রশ্নোত্তরে খ্রীষ্টধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করাই এর উদ্দেশ্য। ভাষার মধ্যে বাঙলার উপভাষার চিহ্ন প্রচুর। পর্তুগীসরা এ গ্রন্থ পরেও মুদ্রিত করেছিল বলে শোনা যায়। ভাষার সংক্ষিপ্ত নমুনা হিসাবে এইটুকু নেওয়া যাক্—প্রশ্নোত্তরের ভাষা মামুলি, কাটা কাটা, কাহিনীর ভাষাই নিচ্ছি।

"আর রামের দুই পুত্র লব আর কুশ সঙ্গে রামের বিস্তর যুর্দ্ধ করিলেন পুত্র না চিনিয়া। শেষ মুনিদিয়া (=মুনি আসিয়া ?) পরাজয় (=পরিচয়) করিয়া দিল" ইত্যাদি।

(২) 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' খ্রীঃ ১৭৪৩ অব্দে রোমান্ অক্ষরে লিস্‌বন শহর থেকে মুদ্রিত হয় ('রঞ্জন প্রকাশালয় থেকে ১৩৪৬ বঙ্গাব্দে তা বাঙলা অক্ষরে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে)। এখানাও প্রশ্নোত্তর ছলে খ্রীষ্টধর্মের ব্যাখ্যা—তবে গুরু-শিষ্যের সংবাদ। গ্রন্থখানা ঢাকার ভাওয়াল পরগণার পর্তুগীস পাদ্রি মানোএল-দ-আস্‌সুম্প্‌সাম্-এর রচিত। ভাওয়াল পরগণার

কোন দেশীয় লোকের হাত সে রচনায় ছিল—লেখায় সেই উপভাষার ছাপ আছে. আরবী-ফারসী শব্দও প্রচুর। তাছাড়া, পর্তুগীস থেকে অনুবাদের ছাপও যথেষ্ট প্রকট। তবু তা পড়া চলে; খানিকটা কৌতূহল চরিতার্থ হয়, কৌতুকও লাভ করা যায়। সেদিনের পাদ্রি আস্‌সুম্প্‌সাম্‌-কে প্রশংসা করতে হয়, তিনি 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' ছাড়াও পর্তুগীস ভাষায় একখানা বাঙলা ব্যাকরণ (কঃ বিঃ সম্পাদিত ও পুনর্মুদ্রিত) ও বাঙলা শব্দকোষ সংকলন করেছিলেন।

পাদ্রিদের এ ধরণেরই আরও দু'একখানা বই—রেস্তো ডি সেল্‌ভেস্ত্রো বা ডি সুজা রচিত প্রশ্নোত্তরমালা' ও 'প্রার্থনামালা'র কথাও শোনা যায়। এই পাদ্রি সাহেব কলকাতা ব্যাণ্ডেলের বাসিন্দা। বই পাওয়া গেলে দেখা যেত—হয়ত পূর্ববঙ্গের উপভাষার ছাপ নেই। তবে 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'ই পর্তুগীস রচনার প্রসিদ্ধ নমুনা। তাতে প্রশ্নোত্তরের মধ্যে মধ্যে ছোটখাটো ধর্মতত্ত্ব ও ভগবৎকৃপার গল্পও অনেক আছে। যেমন. 'তাত্রেল-এর শেষদিককার গল্পটি নিই—মোটামুটি এটি ভাষার ভালো নমুনা :

সিদ্ধা লিউক্রিদো বনবাসী-সকলের প্রধান আছিলেন। তিনি পাদ্রি-সকলকে লইয়া সঙ্গে, প্রতিদিন ধর্মঘরে ধ্যান করিতেন। ধ্যান করিয়া সাধুয়ে আপনার চৌকিতে বসিতেন। পাদ্রি সকলে এক এক করিয়া আসিয়া তাহান আশীর্বাদ লইত। একদিন সাধুয়ে অসুস্থ হইয়া ঘরে রহিলেন, ধর্মঘরে গেলেন না। এহা দেখিয়া ভূতে সাধুর ধরাণ লইল এবং সাধুর স্থানে বসিল। পাদ্রি-সকলে বড় পাদ্রির ধরাণ দেখিয়া, ভূত না চিনিয়া, ভূতের আশীর্বাদ লইতে লাগিল। এহার মধ্যে এক পাদ্রি সাধুর ঘরে থাকিয়া আসিল, আর বড় পাদ্রি ধর্মঘরে দেখিয়া কহিল: ঠাকুর এহা কি? তুমি এখানে আছ, এবং ধর্মঘরে? এহা কি মতে হইতে পারে? এহা শুনিয়া সাধুয়ে ভূতের বাজি চিনিয়া গেলেন ধর্মঘরে। দুয়ারসকল মেলিয়া দুয়ারে দুয়ারে আঙ্গুল দিয়া ক্রুশ ক্রুশ করিলেন। পরে এক বেত দিয়া ভূতেরে মারিতে লাগিলেন, এবং ভূতে পালাইতে লাগিল।

গদ্যের নমুনা হলেও এসব লেখা সাহিত্যের নমুনা নয়।

(৩) **ইংরেজের আয়োজন—বনিয়াদ-আবিষ্কার :** বাঙলা ভাষাকে মুদ্রাযন্ত্রের বৈপ্লবিক সহায়তা-দান পর্তুগীসদের কৃতিত্ব নয়, সে কৃতিত্ব ইংরেজের। ভারতবর্ষে তামিল অক্ষরে প্রথম বই মুদ্রিত হয় মালায়ালাম ভাষায় খ্রীঃ ১৫৭৭ অব্দে। তাও ক্যাথোলিক ধর্মের বই। স্পেন দেশের এক পাদ্রি মহাশয়ের

উদ্যোগে তা ঘটে। বাঙলা অক্ষরে বাঙলা লেখা (পুরো বই নয়) ছাপা আরম্ভ হল প্রায় ২০০ বৎসর পরে—ইং ১৭৭৮এ হালহেড-এর বাঙলা ব্যাকরণ খ্রীষ্টশাস্ত্র প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রণীত হয়। সুতরাং "১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দকেই আমরা বাঙলা-গদ্যের ঐতিহাসিক যুগের আরম্ভ বৎসর বলিব", (সজনীকান্ত দাস, বাঙলা গদ্যের প্রথম যুগ)—এ মত সত্য। বিদ্যাজগতে মুদ্রাযন্ত্র বিপ্লব ঘটায়। তবে গদ্যের 'আরম্ভ' যথার্থরূপে হয় খ্রীঃ ১৮০১ অব্দে। তাই খ্রীঃ ১৭৭৮ থেকে খ্রীঃ ১৮০০ পর্যন্ত কালটিকে 'আরম্ভ' অপেক্ষাও 'আয়োজন-কাল' বলাই শ্রেয়ঃ। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে হালহেডের গ্রামারে বাঙলা গদ্য-রচনার আরম্ভ হয়নি; তবে বাঙলা মুদ্রণে গদ্যের সেই দীর্ঘ 'অন্ধকার-যুগ' শেষ হল তাতে সন্দেহ নেই।

বাণিজ্যের প্রয়োজনে ও রাজ্যশাসনের নিয়মে কোম্পানির উদ্যোগী পুরুষেরা পূর্বেই বাঙলা শিখছিলেন, তার প্রমাণ রয়েছে। নাথানিয়েল ব্রাসি হালহেড এই শিক্ষায় সাহায্য করবার জন্যই A Grammar of the Bengali Language বা 'বাঙলা ব্যাকরণ' রচনা করেন (১৭৭৬ ইং)। তার মুদ্রণ-ব্যবস্থার জন্য হেস্টিংস অনুরুদ্ধ হন। চার্লস উইলকিন্‌স্-এর এ-দিকে অভিজ্ঞতা ছিল। তিনি ও হালহেড দুজনেই হুগলীর লোক। উইলকিন্‌স্ (পরে স্যর চার্লস উইলকিন্‌স্ ১৭৫০-১৮৩৬) স্মরণীয় পুরুষ। তিনি সংস্কৃত শিক্ষা করেন, আর ইংরেজিতে 'ভগবদ্‌গীতা' অনুবাদ করেন; তা ১৮৮৫ অব্দে লণ্ডনে মুদ্রিত হয়। প্রাচ্যবিদ্যার প্রথম পীঠস্থান কলকাতার 'এশিয়াটিক সোসাইটি' (খ্রীঃ ১৭৮১) প্রতিষ্ঠায়ও উইলকিন্‌স্ স্যর চার্লস জোন্সের সহযোগী ছিলেন। হেস্টিংসের কথায় উইলকিন্‌স্ বাঙলা অক্ষর কাটাতে হাত দিলেন, আর এ কাজে তিনি পঞ্চানন কর্মকারকে সহকারী করে নিলেন (পরে পঞ্চানন ও তাঁর জামাতা মনোহর হরফ কাটার দক্ষ কারিগররূপে শ্রীরামপুরের মিশনের জন্য এ দেশের বহু ভাষার অক্ষর প্রস্তুত করে দেন)। ছেনী-কাটা ছাঁচে ধাতুদ্রব্য ঢালাই করে প্রথম বাঙলা হরফ তৈরী হল, আর তাতে খ্রীঃ ১৭৭৮ অব্দে হালহেডের ইংরেজিতে লেখা পূর্বোক্ত 'ব্যাকরণে' দৃষ্টান্তস্বরূপ কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীদাসী মহাভারত ও ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর থেকে কিছু অংশ বাঙলা অক্ষরে মুদ্রিত হল। সম্পূর্ণ গ্রন্থ বাঙলায় রচিত নয় মৌলিক ও ধারাবাহিক রচনাও তাতে নেই। অর্থাৎ বাঙলা গদ্যের যথার্থ নমুনা নেই।

মুদ্রিত আকারে সে প্রয়াস বিলম্বিত হল। রাজকার্যে আইন-কানুনের বাঙলা অনুবাদই ইংরেজের প্রথম প্রয়োজন হয়, আর সঙ্গে সঙ্গে তাই প্রয়োজন হয় বাঙলা ব্যাকরণ, অভিধান ও শব্দকোষের। এসব সাহিত্য নয়, সাহিত্যের আশ্রয়ভূমি। হালহেডের বাঙলা ব্যাকরণের পরে ইং ১৭৮৫ অব্দে জোনাথান ডানকান-এর (Jonathan Duncan, 1756-1811) দেওয়ানী কার্যবিধির অনুবাদ মুদ্রিত হয়। ছয় বৎসর পরে ১৭৯১ অব্দে মুদ্রিত হয় তৃতীয় নিদর্শন —এডমনস্টোন্-এর (Neil Benjamin Edmunstone, 1765-1841) ফৌজদারী কার্যবিধির অনুবাদ—এ ভাষা 'ফারসী-ঘেঁষা'। তারপর, ১৭৯৩এ প্রকাশিত হয় ফরস্টার-এর (Henry Pitts Forster) 'কর্ণওয়ালিসী কোড্'-এর অনুবাদ ও ১৭৯৯ অব্দে তাঁর শব্দকোষের (সংক্ষেপে যা Vocabulary বলে উল্লেখিত হয়) প্রথম ভাগ; এই শব্দকোষের দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয় একেবারে খ্রীঃ ১৮০২ অব্দে। আরও দু-একজন এ ধরণের ইংরেজ রচয়িতা আছেন আপ্‌জন্ ও মিলার (সঃ কাঃ দাঃ 'বাঙলা গদ্যের প্রথম যুগ')। কিন্তু ইং ১৭৭৮ থেকে ইং ১৮০০ অব্দ পর্যন্ত কালের মধ্যে দুটি নামই এজন্য স্মরণীয়- একটি হালহেড, অন্যটি ফরস্টার (দ্রষ্টব্য ডঃ সু. দে'র ইংরাজিতে লেখা ১৯ শতক)।

হালহেড ও ফর্‌স্টারেরও মৌলিক বাঙলা রচনা প্রায় কিছুই নেই। কিন্তু এই আইন-কানুনের অনুবাদে ভাষার বিষয়ে তাঁরা যথেষ্ট অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। বাঙলা ভাষা তাঁদের মুগ্ধ করেছিল। বাঙলার চিঠিপত্রে তখন ফারসীর দৃঢ় প্রভাব, আইন আদালতে তো ফারসীরই রাজত্ব। এঁরা ইংরেজ শাসক বলেই বেশ বুঝলেন বাঙলার আইন-আদালতে বাঙলা চলাই স্বাভাবিক, ফারসী সেখানে একটা কৃত্রিম বাড়াবাড়ি। অবশ্য ইং ১৮৩৮ সনের পূর্বে বাঙলা এ অধিকার লাভ করেনি। দ্বিতীয়তঃ, ইংরেজি আইনের বাঙলা অনুবাদেও ফারসী-আরবীর দিকে না ঝুঁকে এই ইংরেজ অনুবাদকেরা ঝুঁকেছেন সংস্কৃতের দিকে। এর অর্থটা একটু অনুধাবনযোগ্য।

ভাষার রূপ ও রীতি সাধারণতঃ বিষয়ানুগ হয়। কিন্তু আইন-সম্পর্কিত বিষয়েও ইংরেজ লেখকেরা ফারসী-ঘেঁষা না হয়ে সংস্কৃত-ঘেঁষা হতে গেলেন কেন? তার কারণ, এই বিদেশী লেখকেরা একটা মূল সত্য ধরতে পেরেছিলেন —প্রাচীন ও মধ্যযুগের মধ্য দিয়ে বাঙালী ও বাঙলা ভাষা যে ভাবে বিকশিত

হয়েছে তাতে বাঙলার পক্ষে সংস্কৃতের শব্দভাণ্ডার ও ঐতিহ্য যতটা আপনার হয়ে উঠেছে, ফারসী-আরবীর ভাণ্ডার তা হয়নি (ফারসীর তুলনায় সংস্কৃত এ প্রাধান্য কি করে অর্জন করল তা এ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে আলোচিত হয়েছে)। এ উপলব্ধি দৌলত কাজী ও আলাওলের হয়েছিল। আর, জোর করেও যে আলাওলের উল্টো পথে গিয়ে সাহিত্য-সৃষ্টি করা যায় না, তার প্রমাণ অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধ থেকে 'মুসলমানী বাঙলার' কবিরা নিজেরাই জমিয়ে রেখে গিয়েছেন। অনেকগুলি কারণ সমাবেশে শৌরসেনী অপভ্রংশের বংশে 'হিন্দ্‌বী' (হিন্দোস্তানী) উদ্ভূত হয়েছে। উত্তর ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে মুস্‌লিম রাজশক্তির আরবী-ফারসীবাহিত সাংস্কৃতিক রীতিনিয়ম অঙ্গীভূত হয়ে যায়; দীর্ঘদিনে ফারসী-আরবীর ঐতিহ্য 'হিন্দোস্তানী' ভাষায় সংস্কৃত ঐতিহ্য অপেক্ষা অধিকতর প্রাধান্য লাভ করেছে। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে হিন্দু-মুসলমান গুণী ও মানী লোকেরা প্রায় চারশ বছর ধরে এ রকম মিশাল ভাষার (হিন্দ্‌বীর) চর্চা করে তাকে একটা সুমার্জিত ও স্বচ্ছন্দ রূপ দান করতে পেরেছেন: কিন্তু বাঙলা দেশে এরূপ কোন কারণই ঘটেনি—অষ্টাদশ শতকের নবাবী আমলে ফারসীর প্রভাব এসেছিল, কিন্তু তার শক্তি ও স্থায়িত্ব বেশি হয়নি। হয়ত বিদেশী বলেই হালহেড-ফর্স্টারের—বা অন্যান্য ইংরেজ মনস্বীদের—ফারসীর প্রতি অকারণ বিরাগ বা অহেতুক মোহ জন্মেনি। এঁরা বাঙলা ভাষারই সৌন্দর্য ও সম্ভাবনা বুঝে দেখেছিলেন। পর্তুগীজী বাঙলা ভাষার উপর তখন যতটা ফারসী-আরবী চেপে বসেছিল, হালহেড ও ফর্‌স্টারের বিচারে তাও মনে হয়েছে উৎপীড়ন। সে পীড়া থেকে বাঙলাকে মুক্ত করে তার স্বচ্ছন্দ প্রকাশ সম্ভব করবার জন্য তাঁরাই তখন আরও বেশি করে সংস্কৃত ভাষার শরণ নিলেন। পরে কেরি এই ধারণা ও উপলব্ধির প্রধান প্রবক্তা হন। এদিক থেকে এঁরা উনিশ শতকের বাঙলা ভাষার একটা বিরাট লক্ষণেরই প্রথম দৃষ্টান্তস্থল। সে লক্ষণের নাম 'সংস্কৃতীকরণ বা Sanskritisation। মধ্যযুগে বাঙলা ভাষায় দু'বার এই স্রোত আসে, আর উনিশ শতকে তা আবার (তৃতীয় বার) প্রবলভাবে প্রবাহিত হয়ে যায় (দ্রঃ ODBL)। এসব সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কার্যকারণে বাঙালী মুসলমানও বাঙলা ভাষার মোড় হিন্দোস্তানীর মত ফারসী-আরবীর দিকে ঘোরাতে পারেন নি,—হয়ত মোড় ঘোরানো সম্ভব ছিল না। কিন্তু উনিশ শতকের

মুসলমানের বাঙলা সাহিত্যের প্রতি ঔদাসীন্য পরবর্তী কালে তাঁকে এই বাঙলার বিকাশধারা সম্বন্ধেও সন্দিহান করে তুলল—তাঁদের সন্দেহ হল বাঙলা ভাষার আকৃতি ও প্রকৃতি বুঝি বাঙালী হিন্দুর অভিসন্ধি-অনুযায়ী বিকাশলাভ করেছে। অথচ কার্যতঃ সবচেয়ে গোঁড়ারাই কেউ কেউ (যেমন মৌঃ আক্রাম খাঁ) তখনও নিজেদের লেখায় সবচেয়ে বেশি সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করতেন। কারণ, ভাষার প্রকৃতি না মেনে তাঁরা পারেন নি।

ফর্স্টার আর একটি কাজও করেন—তিনি বাঙলা বানানকেও সংস্কৃতের নিয়মানুবর্তী করে তুলতে থাকেন। পূর্বযুগে বাঙলা বানানের বাপ-মা ছিল না। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের বানান দেখলে আজও লজ্জা পেতে হয়। বানানে সংস্কৃতানুযায়ী এই বিশুদ্ধি—একটু কড়া রকমের বিশুদ্ধিই—ধীরে ধীরে বাঙলা ভাষায় স্বাভাবিক নিয়ম বলে গ্রাহ্য হয়—ইংরেজের এসব ব্যাকরণ-অভিধানের প্রকাশে ও প্রচারে বিশেষ করে মুদ্রাযন্ত্রের অনমনীয় শৃঙ্খলা-শক্তির জন্য। বাঙলা পাঠ্যপুস্তক এই বিশুদ্ধ বানান-পদ্ধতিকে একেবারে শৈশব থেকে ছাত্রদের মনে গেঁথে দিতে থাকে।

মৌলিক রচনা না থাকলেও বাঙলা গদ্যের মূল প্রকৃতি সম্বন্ধে এই ইংরেজদের স্থির বোধ জন্মেছিল। আর এঁদের পরে কেরি এসে সে আয়োজন সুদৃঢ় করে দিলেন। কিন্তু তার পূর্বে আর একটি আকস্মিক আবির্ভাবের কথা বলতে হয়।—রাজ্যচালনাও নয় ধর্মপ্রচারও নয়, নিতান্তই লোকচিত্ত বিনোদনের জন্য একজন বিদেশী কলকাতায় ২৫ নং ডুমতলায় (এখনকার এজরা স্ট্রীটে) হঠাৎ বাঙালীকে দিয়ে বাঙলা ভাষায় লিখিয়ে দু খানা বাঙলা প্রহসনের অভিনয় করিয়ে গেলেন (খ্রীঃ ১৭৯৫ ও ১৭৯৬)। বই দু খানার নাম ইংরেজিতে পাওয়া যায়—The Disguise ও Love is the Best Doctor। গেরাসিম লেবেদেফ্ (Gerasim Lebedov) জাতিতে রুশ, কিন্তু আধুনিক বাঙলা রঙ্গমঞ্চের তিনি আদি পুরুষ; পরে তা আলোচ্য। সে প্রহসন দু'খানি মুদ্রিত হলে বা টিকে থাকলে হয়ত বাঙলা ভাষার প্রথম চলিত গদ্যের ও সাহিত্যিক গদ্যের নিদর্শন পাওয়া যেত। কিন্তু সেই দুটি প্রহসনের নামই মাত্র বিস্মৃতির অতল থেকে এখন উদ্ধার করা হয়েছে। লেবেদেফ্ ইংরেজিতে হিন্দীভাষার ব্যাকরণ প্রকাশ করেছিলেন। তিনি রাশিয়াতে নিজের সঙ্গে যে বাঙলা 'বিদ্যাসুন্দর' নিয়ে যান তাতে তাঁর লিপ্যন্তর

চেষ্টাও দেখা যায়। এসব সুরক্ষিত জিনিসের প্রতিলিপি এখন সুলভ হয়েছে। খ্রীষ্টধর্মের প্রচার ও শাসন-ব্যপদেশে ছাড়াও ইউরোপীয় জাতিদের একজন খাপছাড়া মানুষ আমাদের ভাষায় এভাবে নাম রেখে গিয়েছেন।

॥ ২ ॥ বাঙলা গদ্যের প্রথম পর্ব

খ্রীঃ ১৮০০ অব্দে শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন (১০ জানুয়ারি) ও শ্রীরামপুর মিশনের প্রেসের কাজ (মার্চ মাসে) আরম্ভ হয়। 'মঙ্গল সমাচার মাতিউর রচিত মুদ্রিত হতে থাকে। এই প্রেস থেকে শুধু খ্রীষ্টীয় প্রচারপুস্তক-মুদ্রণই হত না, কৃত্তিবাসী রামায়ণ (১৮০১) ও কাশীদাসী মহাভারত (১৮০২) প্রথম মুদ্রিত করে বাঙালী আপামর জনসাধারণের জীবনে শ্রীরামপুর প্রেস যে দান জুগিয়েছেন, শ্রীরামপুর মিশনের কাজ সে তুলনায় সামান্য। প্রায় এই বৎসরই (ইং ১৮০০) কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। কিছুদিন পরেই (১৮০১এর ১লা মে) শ্রীরামপুর মিশনের উইলিয়ম কেরির উপরেই কলেজের বাঙলা বিভাগের ভার অর্পণ করা হয়। এই কলেজের বাঙলা পাঠ্যপুস্তক রচনার দায়িত্ব, শ্রীরামপুর মিশনের বাইবেল ও খ্রীষ্টধর্মবিষয়ক পুস্তক-পুস্তিকা রচনার নেতৃত্ব এবং সাধারণভাবে বাঙলা গ্রন্থ মুদ্রণের কাজ—মুখ্যতঃ কেরি, ও গৌণতঃ তাঁর সহকারীদের উপর পড়ে। বাঙলা গদ্যের এই প্রথম পর্বকে তাই 'ফোর্ট উইলিয়মের পর্ব বা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ-শ্রীরামপুর মিশনের পর্ব' কিংবা সাধারণভাবে 'কেরির পর্ব' বললেও ভুল হয় না।

(ক) **শ্রীরামপুর মিশন**ঃ শ্রীরামপুর ব্যাপ্‌টিস্ট মিশনের উদ্যোগে উইলিয়ম কেরির পরেই উল্লেখযোগ্য মার্শম্যান ও ওয়ার্ড-এর নাম। পরবর্তীকালে কেরি ও মার্শম্যানের মতই হেয়ার, কলভিন্ ও পামার-এর নামও বাঙালীর স্মরণীয় হয়ে ওঠে। 'সেকাল ও একালে' রাজনারায়ণ বসু এই প্রচলিত শ্লোকটি উদ্ধৃত করেছেন:

হেয়ার কল্বিন্ পামারশ্চ কেরী মার্শমনস্তথা।
পঞ্চ গোরা স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনং॥

এ শ্লোক বাঙালীরও গৌরবের কথা, কেরি মার্শম্যান প্রভৃতি মনস্বীদেরও গৌরবের কথা। কারণ দীপঙ্কর, কুমারজীব প্রভৃতির থেকে তাঁরা কম নমস্য নন। তবে শ্রীরামপুর মিশনের সঙ্গে পরবর্তী তিনজনের সম্পর্ক ছিল না।

বরং তার সঙ্গে সম্পর্ক বেশি ছিল ওয়ার্ড-এর এবং কেরির মিশনারি প্রয়াসের অগ্রণী ও সহযোগী টমাস-এর।

জন টমাস (খ্রীঃ ১৭৫৭-১৮০১) বাঙলায় প্রথম আসেন জাহাজের ডাক্তার হয়ে খ্রীঃ ১৭৮৩ অব্দে। অস্থিরচিত্ত এই ডাক্তার হিন্দুদের মধ্যে 'গসপেল' প্রচারের সংকল্প নিয়ে ১৭৮৭তে পাদ্রি হন। তাঁর প্রথম কৃতিত্ব—দেশীয় ভাষা ও হিন্দু ধর্মশাস্ত্র শিক্ষার জন্য তিনি রামরাম বসুকে (১৭৮৭ ইং) মুন্সি হিসাবে সংগ্রহ করলেন। টমাসের পরিচয়েই রামরাম বসু পরে কেরির মুন্সি হন। টমাস একজনকেও খ্রীষ্টান করতে পারেননি। অবশ্য এই ক্ষ্যাপা সাহেবকে খ্রীষ্টান হবার আশ্বাস দিয়ে রামরাম বসু বরাবরই দু'পয়সা কামাই করতেন। টমাসের দ্বিতীয় কৃতিত্ব—সস্ত্রীক উইলিয়ম কেরিকে বিলেত থেকে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে খ্রীঃ ১৭৯৩ অব্দে বাঙলায় নিয়ে আসা। তখন কেরি ও রামরাম বসুর যোগাযোগ ঘটল। মিশনের কাজ (১৮০০) আরম্ভ হতে না হতেই টমাস উন্মাদ হয়ে যান। কৃষ্ণ পাল নামক একজন হিন্দু প্রথম কেরির নিকট খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করলে টমাস তা দেখে আনন্দে আর মাথা ঠিক রাখতে পারলেন না। উন্মাদ অবস্থায় দিনাজপুরে শীঘ্রই টমাস মারা যান।

উইলিয়ম কেরির যোগ্যতম সহকর্মী যশুয়া মার্শম্যান (খ্রীঃ ১৭৬৮—খ্রীঃ ১৮৩৭)। তিনিও প্রথমে ধর্মচর্চার সঙ্গে সামান্য তন্তুবায়ের জীবিকাবলম্বন করতেই বাধ্য হন। কিন্তু বিদ্যানুরাগের ফলে ক্রমে স্কুলের শিক্ষক হন। ভারতবর্ষে আসার আগেই তিনি ল্যাটিন, গ্রীক, হিব্রু, সিরিয়াক্ প্রভৃতি ভাষা, শিক্ষা করছিলেন। এদেশে এসে যা করেন, তা এই থেকে বোঝা যাবে—তিনি শ্রীরামপুর মিশনের শিক্ষা বিভাগের কর্তা হন, 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'র সম্পাদনার ভার নেন ও রামমোহনের সঙ্গে বিতর্ক তিনিই চালান, সংস্কৃত রামায়ণের ইংরেজি অনুবাদেও তিনিই কেরিকে সাহায্য করেন। চীনা ভাষায় বাইবেল অনুবাদ, ব্যাকরণ ও অভিধান রচনা তাঁর প্রধান কীর্তি। একবার দেশে গেলেও মার্শম্যান তাঁর কর্মক্ষেত্র শ্রীরামপুরেই জীবন অতিবাহিত করেন।

উইলিয়াম ওয়ার্ড (১৭৬৯-১৮২৩) ছাপাখানার কাজ নিয়ে কর্মজীবন আরম্ভ করেন; ক্রমে সংবাদপত্র সম্পাদনায় অভিজ্ঞ হন। প্রধানতঃ বাইবেল মুদ্রণের পুণ্য আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তিনি এদেশে আসেন। শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের তিনিই ছিলেন প্রধান তত্ত্বাবধায়ক। ছোটখাটো বই ছাড়া হিন্দুদের রীতিনীতির

উপর তাঁর চার-ভল্যুমে লেখা ইংরেজি গ্রন্থ আছে। খ্রীঃ ১৮২৩ অব্দে শ্রীরামপুরেই তাঁর মৃত্যু হয়।

কেরি ও রামরাম বসুর কীর্তিই বিশেষ করে বাঙলা সাহিত্যের গদ্যের ইতিহাসের অন্তর্গত। শ্রীরামপুর মিশনের সম্বন্ধে সাধারণভাবে তবু এইটুকু স্মরণীয়—ইঃ ১৮০১এ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কাজ আরম্ভ হবার পূর্বেই (১৮০১, ফেব্রুয়ারি) এখানে প্রথম 'বাইবেলে'র অনূদিত প্রথমাংশ (নিউ টেস্টামেন্ট) মুদ্রিত হয়। মঙ্গল সমাচার মতিউর রচিত—Gospel of St. Matthews (ইং ১৮০০, ৭ই ফেব্রুয়ারি) মূল গ্রীক থেকে অনূদিত। তার পরে ক্রমাগত বহু সংস্করণ মুদ্রিত হয় ও তার সংস্কার চলে। যথারীতি সম্পূর্ণ বাইবেলও ('ধর্মপুস্তক') মুদ্রিত (১৮০৮ খ্রীঃ) হয়। কেরির মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে তার সংস্কার চলেছিল। এ ছাড়া খ্রীষ্টধর্ম সম্বন্ধীয় বহু পুস্তিকা প্রণীত ও বিতরিত হয়। পদ্যে, প্রচলিত পাঁচালী রীতিতেও তা লিখিত হয়েছিল। এসব কাজে রামরাম বসু ছিলেন মিশনারিদের সহায়। ১৮১৮-এর পূর্বেই এইভাবে প্রায় ৮০ খানা পুস্তিকা রচিত হয় ও প্রায় ৭ লক্ষ কপির বিতরণও চলে। তাছাড়া, নানা পত্রপত্রিকা পরিচালনা ও জ্ঞানগর্ভ নিবন্ধ, পুস্তক ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন পরে মিশনের কৃতী পরিচালকদের কাজ হয়ে ওঠে। প্রচার ছাড়া এসব অনেক জিনিসেরই অবশ্য মূল্য সামান্য। মিশনের মূল প্রয়াস বাইবেল সম্বন্ধেও একথা সত্য (খ্রীঃ ১৮৩৯এ লণ্ডন থেকে রোমান্ অক্ষরে মুদ্রিত ইয়েটস-এর বাইবেল অনুবাদ অবশ্য তা নয়)। বহু সংস্করণে শ্রীরামপুরের বাইবেল সংশোধিত হয়েছে, কিন্তু ভাষা স্বচ্ছন্দ বা মার্জিত হয়নি। হয়ত মূলানুগতাই ছিল কেরি প্রমুখ অনুবাদকদের প্রধান লক্ষ্য। না হলে কেরির ভাষা-বোধ ছিল, তা অন্যত্র দেখতে পাই। ইংরেজি বাইবেল ইংরেজি সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। বাঙলা বাইবেল দুর্ভাগ্যক্রমে হাস্যকর। তা 'শাস্ত্র' হয়ে ওঠাতে 'খ্রীষ্টানী বাঙলাও' একটা পরিহাসের বিষয় হয়েছে। সত্যই যদি বাইবেল স্বচ্ছন্দ বাঙলায় অনূদিত হত তাহলে বাঙলা লেখকের ভাব-জগতের মধ্যে হয়ত যীশুর উক্ত কথা, বা গল্প ও ধারণা এমন বেমানান ঠেকত না। কারণ, আরবদের 'আরব্য রজনীর' মত, য়িহুদীদের ওল্ড টেস্টামেন্টও পৃথিবীর একখানা মহৎ গ্রন্থ, আর যীশুর কাহিনী সরল ও সরস অপূর্ব ভাব-সম্পদ। সে রস খাঁটি বাঙলায় পরিবেশিত হলে সাহিত্য হত।

(খ) **ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের দান (ইং ১৮০১) :** ধারাবাহিক বাঙলায় গদ্য রচনার সূত্রপাত হয় কলেজ অব ফোর্ট উইলিয়ম-এ। কিন্তু শুধু বাঙলা রচনার নয়—হিন্দী প্রভৃতি আধুনিক ভাষার রচনারও প্রথম সংগঠিত কেন্দ্র কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ। বাঙলা-বিভাগ সংগঠিত করতে বরং কয়েক মাস বিলম্ব হয়েছিল। কিন্তু খ্রীঃ ১৮০০ অব্দের ১৮ই আগস্ট কলেজের কাজ আরম্ভ হতেই হিন্দুস্থানী ও ফারসী এবং আরবী ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা হয়—গ্রীক লাতিন ইংরেজিও ছিল ; এবং ইতিহাস আইন, জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষার ব্যবস্থাও ছিল। বাঙলা-বিভাগের দায়িত্ব নিতে উইলিয়ম কেরি আহূত হন খ্রীঃ ১৮০১ অব্দে। সদ্য-প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামপুর মিশনের বাইবেলের প্রথম পুস্তিকা তখন সবেমাত্র প্রকাশিত হয়েছে। উইলিয়ম কেরি ১৮০১এর মে মাসে কলেজে যোগদান করলেন। এইখানে রামরাম বসুকে তিনি নিয়ে এলেন, এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতদের লেখার কাজে নিযুক্ত করলেন। বাঙলার জন্ম প্রধান পণ্ডিত নিযুক্ত হন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, মাসিক বেতন (সেদিনের · ২০০৲ টাকা। আরও সাতজন পণ্ডিত ছিলেন। একজন রামরাম বসু, বেতন পেতেন মাসিক ৪০৲ টাকা। ইংরেজ ছাত্রদের পড়াতে গিয়ে কেরি দেখলেন গদ্য বই বাঙলায় নেই। কেরির নেতৃত্বে এঁরাই বাঙলা গদ্যে পাঠ্যপুস্তক রচনায় ব্রতী হলেন। অবশ্য খ্রীঃ ১৮০৬তে ইংলণ্ডের হিল্‌স্‌বারিতে কোম্পানি এরূপ কর্মচারীদের জন্য এ ধরনের কলেজ স্থাপন করে তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। তাতে কলকাতার কলেজের গুরুত্ব কমতে থাকে। কিন্তু বাঙলা রচনার ক্ষেত্রে অন্ততঃ খ্রীঃ ১৮১৫ পর্যন্ত এই কলেজের বাঙলা বিভাগই শুধু সক্রিয় ছিল। অতএব, সে পর্বের বাঙলা সাহিত্য ফোর্ট উইলিয়ম কলেজেরই দানে পরিপালিত। কলেজ অবশ্য গুরুত্ব হারিয়ে ক্রমশঃ ম্লান হয়ে পড়ে। তবু শেষ দিকে বিদ্যাসাগর এ কলেজের বাঙলার অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। খ্রীঃ ১৮৫৪-তে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ একেবারে বিলুপ্ত হয়। কলেজের পণ্ডিতদের লেখা দিয়েই কলেজ আমাদের স্মৃতিতে আজ জীবিত আছে।

দু'টি কথা সে প্রসঙ্গেই স্মরণীয় :—পণ্ডিতেরা বই লিখছিলেন ইংলণ্ডে শিক্ষাপ্রাপ্ত সাহেব কর্মচারীদের দেশীয় ভাষা ও রীতিনীতির সঙ্গে পরিচিত করাবার জন্য,—সাহিত্য সৃষ্টির জন্যও নয়, দেশীয় ছাত্রদের পাঠের জন্যও নয়। দ্বিতীয়তঃ, এসব বই এই কারণে দুর্মূল্য হত ; দেশীয় সাধারণ লোক তা কিনতও

না. পড়তও না। কিন্তু তা বলে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রভৃতির কাজ অজ্ঞাত ছিল না। এসব গদ্য নমুনা পরবর্তী পাঠ্য পুস্তকে বারবার সংকলিত হয়েছে।

ফোর্ট উইলিয়মের পর্বে খ্রীঃ ১৮০১ থেকে খ্রীঃ ১৮১৫ এই সময়ের মধ্যে ৮ জন লেখক ১৩ খানি বাঙলা গদ্য পুস্তক লিখেছিলেন। তার মধ্যে বিশেষ আলোচ্য :

কেরি রচিত	১। 'কথোপকথন' (খ্রীঃ ১৮০১)
	২। 'ইতিহাসমালা' (১৮১২)
রামরাম বসু রচিত	৩। রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র (১৮০১)
	৪। লিপিমালা (১৮০২)
গোলকনাথ শর্মা রচিত	৫। হিতোপদেশ (১৮০২)
মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার রচিত	৬। বত্রিশ সিংহাসন (১৮০২)
	৭। হিতোপদেশ (১৮০৮)
	৮। রাজাবলি (১৮০৮)
	৯। প্রবোধচন্দ্রিকা (১৮৩৩)
তারিণীচরণ মিত্র রচিত	১০। ওরিয়েন্টাল ফেবুলিস্ট (১৮০৩)
রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় রচিত	১১। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং(১৮০৫)
চণ্ডীচরণ মুন্শী রচিত	১২। তোতা ইতিহাস (১৮০৫)
হরপ্রসাদ রায় রচিত	১৩। পুরুষ পরীক্ষা (১৮১৫)

(উইলিয়ম কেরি ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ বিষয়ে সজনীকান্ত দাসের প্রবন্ধ সংকলন 'বাঙলা গদ্যের প্রথম যুগ'-এ বহু তথ্য উল্লেখিত ও আলোচিত হয়েছে। তা কৌতূহলী পাঠকের অবশ্য দ্রষ্টব্য।)

উইলিয়ম কেরি (১৭৬১-১৮৩৪)

কেরির কাজের তুলনা নেই। সে কাজের জন্য বাঙালী কেন, ভারতবাসী মাত্রই কৃতজ্ঞ। কিন্তু তাঁর নিজস্ব রচনার থেকে অনেক বেশি মহত্তর তাঁর আয়োজন। কারণ কেরির নামে বাঙলা পাঠ্যপুস্তক মাত্র দু'খানা প্রকাশিত হয়—'কথোপকথন' ও 'ইতিহাসমালা'। তাতেও কতটা কেরির নিজের রচনা আছে, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না। অবশ্য বাইবেলের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া কেরির যা রচনা তা ঠিক বাঙলা গদ্যের অন্তর্গত নয়,—যেমন ইংরেজিতে লেখা 'বাঙলা ব্যাকরণ' (খ্রীঃ ১৮০১) ও

কেরির অসামান্য কীর্তি বাঙলা-ইংরেজি অভিধান (খ্রীঃ ১৮১৫-১৮২৫)। শুধু বাঙলা নয়, সংস্কৃত, মারাঠী, পাঞ্জাবী, কানাড়ী প্রভৃতি ভাষারও ব্যাকরণ, অভিধান প্রভৃতি কেরিরই নেতৃত্বে পণ্ডিতেরা রচনা করেন। শ্রীরামপুর মিশন থেকে 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ' (১৮০১), 'কাশীদাসী মহাভারত' (১৮০২), বিষ্ণুশর্মার হিতোপদেশ ও বাল্মীকির রামায়ণও প্রকাশিত হয়। কেরি শুধু মিশনের অধিনেতা নন, এসব কর্মেরও সম্পাদক। কেরির ইংরেজি রচনা, বিশেষ করে কৃষি ও উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁর গবেষণাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। সাধারণ-ভাবে দেশে প্রকৃতি-বিজ্ঞানের বিষয়ে অনুসন্ধিৎসা জাগাবার চেষ্টা কেরির লেখায় ও তাঁর উদ্যোগে অনুষ্ঠানে আরম্ভ হয়—অবশ্য 'এসিয়াটিক সোসাইটি' সে বিষয়ে আগেই অগ্রণী হয়েছিল। আসলে কেরির বুদ্ধি ছিল বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি, এদেশে যার প্রয়োজন ছিল সমধিক।

উইলিয়ম কেরির জন্ম ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে; তাঁর পিতা এড্‌মণ্ড কেরি ছিলেন তন্তুবায়। কিন্তু তন্তুবায় হলেও বিলাতে লেখাপড়া শেখা যায়, তিনিও লেখাপড়া শেখেন। পরে তাই তিনি স্থানীয় অবৈতনিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা ও গির্জার প্যারিসের কেরানির বা মুহুরির কাজ পান। তাতে পুত্রের জ্ঞান-স্পৃহাও জাগ্রত হয়ে থাকবে, পিতৃ-সংস্পর্শেই উইলিয়ম কেরি প্রাকৃত বিদ্যার দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তিনি উদ্‌বুদ্ধ হয়েছিলেন কলম্বসের জীবনী পাঠে। তবু দরিদ্র পরিবারের ইংরেজ বালকের মত ১২ বৎসর বয়সে তাঁকে জীবিকার্জনের পথ দেখতে হয়। প্রথম যান কৃষিকর্মে,—তাঁর পূর্বাপর আকর্ষণ কৃষিবিজ্ঞানে। পরে তিনি শিক্ষানবীশ হলেন জুতোশেলাইয়ের কাজে। তবু গ্রামের এক তন্তুবায়-পণ্ডিতের কাছ থেকে লাতিন ও গ্রীক শিখতেও তাঁর বাধা হয়নি। ধর্ম বিষয়ে তখন আকর্ষণ জাগলেও সংসর্গদোষে তাঁর চরিত্র বরং এ সময়ে কলুষিত হয়। ক্রমে ধর্মযাজকদের সঙ্গ লাভ করে তা তিনি কাটিয়ে ওঠেন। কেরি বিবাহ করেছিলেন, পুত্র হল, অভাবও আছে; জুতোশেলাইয়ের সঙ্গে কেরি তবু গ্রীক-লাতিনের মতই শিখে ফেললেন ফরাসি, ইতালিয়ান, ডাচ প্রভৃতি ভাষা। বুঝতে পারি কেরির ভাষা শিক্ষার স্বাভাবিক ক্ষমতা ছিল। তাঁর পরিশ্রম ও নিষ্ঠারও তুলনা নেই। এর পরে তিনি ১৭৮৯তে যথানিয়মে পাদ্রি হলেন। তারপর ভারতে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারে উৎসাহী জন টমাস প্রভৃতির সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। ধর্মের উৎসাহের সঙ্গে ঐ চরিত্রগুণ নিয়ে পুত্র-কলত্র প্রভৃতি

সহ কেরি খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যেই কলকাতায় এলেন (খ্রীঃ ১৭৯৩)। তখন তাঁর বয়স ৩২ বৎসর। জীবনের বাকি ৪১ বৎসর এদেশেই তাঁর কর্মময় জীবন উৎসর্গ করে কেরি শ্রীরামপুরে দেহত্যাগ করেন খ্রীঃ ১৮৩৪ অব্দে। তবু কেরির প্রথম ৭ বৎসরের প্রচার ও মিশনের চেষ্টা মসৃণ হয়নি। রামরাম বসুকে মুন্সি হিসাবে পেয়ে তিনি বাঙলা, হিন্দুস্থানী, ফারসী, সংস্কৃত শিক্ষা করেছিলেন। কিন্তু রামরাম বসুর চরিত্রহীনতার জন্য খ্রীঃ ১৭৯৬তে তাঁকে বিদায় দিতেও হয়। অন্য দিকে কোম্পানি দুটি জিনিসকে প্রজাদের আপত্তির ভয়ে ও নিজেদের কুশাসনের জন্য প্রশ্রয় দিতে তখন অসম্মত ছিলেন—একটি শিক্ষা, অন্যটি মিশনারিদের ধর্মপ্রচার। তাই প্রথম দিকে সপরিবারে কেরি কলকাতা, ব্যাণ্ডেল, নদীয়া, সুন্দরবন অঞ্চলে ভেসে বেড়ান। পরে (১৭৯৪) মালদহে মদনাবাটির নীলকুঠীর তত্ত্বাবধায়ক হয়ে একটু মাথা গুঁজবার স্থান লাভ করলেন। অভাবে, হতাশায় কেরির স্ত্রী প্রায় উন্মাদ হয়ে যান, একটি পুত্র কালগ্রাসে পতিত হল, তবু কেরির ভাষা-শিক্ষা ও আত্মপ্রস্তুতির সংকল্প টল্‌ল না—বাইবেল দেশীয় ভাষায় প্রকাশ করতে হবে ; ব্যাকরণ, শব্দকোষ স্থির করে সেই চল্‌তি ভাষাকে আয়ত্ত করে সংহত করে না তুললে নয়। সঙ্গে সঙ্গে দেশের গাছপালা জীবজন্তু, মানুষের রীতি-নীতি সব তিনি লক্ষ্য করছেন। এই প্রস্তুতিই সার্থক হল যখন শ্রীরামপুর মিশনের উদ্যোগ কার্যকর হল (১০।১।১৮০০ ইং)। শ্রীরামপুর তখনও ডেনমার্কের অধীন। সেখান থেকে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করতে বাধা নেই। ব্যাপটিস্ট মিশন সেখানে তাই কেন্দ্র স্থাপনের সুযোগ পেল। ১৭৯৮তে বাঙলা মুদ্রণের জন্য মুদ্রাযন্ত্রও পাওয়া গেল। মার্শম্যান, ওয়ার্ড প্রভৃতি ততদিনে এসে পৌঁচেছেন (১৭৯৯, অক্টোবর)। কেরি এসে তাঁদের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন (১৮০০, জানুয়ারি)।

এর পরে অবশ্য কেরির সহায়-সংস্থানের অভাব হয়নি। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কাজে তিনি প্রথমে ৫০০৲ টাকা মাসিক বেতন পেতেন। কিন্তু শোক-দুঃখ ও দুর্বিপাক বারবার কেরির ভাগ্যে জুটেছে—সাময়িকভাবে অভাবও (১৮৩১) এসেছে। তাছাড়া দুবার স্ত্রী-বিয়োগ ঘটেছে ; ফেলিক্স কেরির মত উপযুক্ত পুত্রকেও (১৮২২এ) হারিয়েছেন ; বহু পরিশ্রমের 'ইউনিভার্সাল ডিক্‌শনারি' বা ভারতীয় ১৩টি প্রধান ভাষার সর্বশব্দকোষ আগুনে পুড়ে গেল (১৮১২), আর তা পুনরায় সংকলন করতে পারেননি—

চোখের জল ফেলেছেন। খ্রীষ্টধর্ম প্রচার, বাঙলা গদ্যের পথ নির্মাণ, 'দিগ্‌দর্শন', 'সমাচার দর্পণ' ও 'ফ্রেণ্ডস অব ইণ্ডিয়া' প্রকাশে মার্শম্যানের সহযোগিতা, ভারতীয় বহু ভাষার গদ্যের ভিত্তিস্থাপন, এসব ছাড়াও খ্রীঃ ১৮১৫র পরে কেরির কাজের অভাব ছিল না। স্কুল বুক সোসাইটি প্রভৃতি প্রায় প্রত্যেকটি সমিতির সঙ্গেই তিনি সংযুক্ত ছিলেন। তা ছাড়াও স্মরণীয় ইং ১৮১৫ থেকে ১৮২৫র মধ্যে বাঙলা-ইংরেজি অভিধান প্রকাশ (মোট প্রায় ৮৫ হাজার শব্দ সম্বলিত), ১৮২১এ On the Agriculture in India নামক প্রসিদ্ধ বক্তৃতা রচনা, ও ১৮২৫এ ভারতবর্ষে 'এগ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটি' স্থাপন।

এ বিষয়ে সন্দেহ নেই—কেরি খ্রীষ্টধর্মের প্রচারে তন্‌মন্‌ধন দিতে এসেছিলেন। ধর্মের গোঁড়ামিও তাঁর কম ছিল না; এটি তাঁর মধ্যযুগ-সুলভ দৃষ্টিরই চিহ্ন। কিন্তু মনে হয় কাণ্ডজ্ঞান ও বাস্তব বুদ্ধিও তাঁর তেমনি যথেষ্ট ছিল। প্রথম থেকেই তিনি এদেশের প্রকৃতি ও মানুষের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য বদ্ধপরিকর হন, আর ক্রমেই দেখি তিনি সংস্কৃত ভাষার রূপ উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়েছেন; দেশের শিক্ষিত ও সাধারণ মানুষের সম্বন্ধেও শ্রদ্ধা পোষণ করেছেন। প্রথম থেকেই তিনি বাঙলা ভাষা ও বাঙালীর জীবন-যাত্রার জ্ঞান প্রত্যেক ইউরোপীয়ের পক্ষে অপরিহার্য বলে অনুভব করেছেন। বাঙলা ভাষা সংস্কৃতের সাহায্যপ্রার্থী হবে, না, ফারসী ও হিন্দুস্থানীর উৎপীড়ন থেকে মুক্ত হবে, এবং আপনার ক্ষমতায় আপনি দণ্ডায়মান হতে সমর্থ হবে,—বাংলা গদ্যের সমস্ত আদর্শের অভাবেও—এই উপলব্ধি ক্রমেই তাঁর মনে দৃঢ় হয়। কেরির অক্লান্ত পরিশ্রম, অধ্যবসায়, ঐকান্তিক নিষ্ঠার লক্ষ্য যদিও ধর্মপ্রচার, কিন্তু তার ভিত্তি এই বৈজ্ঞানিক চেতনা, বাস্তববুদ্ধি, মানুষ ও পৃথিবীকে জানবার ও চেনবার আগ্রহ। এ জন্যই খ্রীষ্টান গোঁড়ামি সত্ত্বেও বৃদ্ধ কেরি বলেন (১৮২৫), "My heart is wedded to India, and though I am of little use, I feel a pleasure in doing the little I can."

(১) **'কথোপকথন'** : ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে কেরির 'কথোপকথন' প্রথম প্রকাশিত হয়। মাত্র দেড় মাস আগে প্রকাশিত হয়েছিল প্রথম বাঙালীর লেখা বাঙলা গদ্যের বই—রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র'। 'কথোপকথন' ইংরেজিতে 'Dialogues' বা 'Colloquies' বলেও প্রসিদ্ধ।

আমরা কেরির দেওয়া বাঙলা নামই গ্রহণ করছি। বইখানিতে বাঙলা ভাষায় কথাবার্তার মধ্য দিয়ে ইংরেজ কর্মচারীদের বাঙলা ভাষা ও বাঙালী সমাজের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্ত মোট ৩১টি অধ্যায় দেওয়া হয়েছে। কেরি কতটা তা নিজে লিখেছেন তা বলা শক্ত ; কিন্তু এ বই-এর বিষয় নির্বাচনে কেরির বাস্তব বুদ্ধির ও যুক্তিবাদী মনের স্বাক্ষর অভ্রান্ত। আইডিয়ার আকাশ অপেক্ষা মাটির পৃথিবীর সঙ্গেই মানুষের পরিচয় প্রথম হওয়া চাই। 'জমিদার-রাইয়ত -এর সম্পর্কের যত কথা. জায়গা-জমি, চাষ বাস, ক্ষেতখামার থেকে আরম্ভ ক'রে খাতক-মহাজন, যাজক-যজমান, ভদ্র-লোক.—গ্রাম্য জীবনের দৈনন্দিন যত বিষয়,—চাকর ভাড়া করা, সাহেব ও মুন্সির কথা. তিয়ারিয়া, ভিক্ষুক, মুটে-মজুর, হাটের বিষয় প্রভৃতি থেকে বিবাহ, ঘটকালী. বিবাহ-রাত্রির খাওয়া-দাওয়া, রোশনাইয়ের কথাবার্তা প্রভৃতি কিছুই এই কথোপকথন থেকে বাদ যায়নি। কিন্তু সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য স্ত্রীলোকের কথোপকথন, বিভিন্ন শ্রেণীর স্ত্রীলোকের কথাবার্তা। যে কোন ভাষায় এরূপ নিদর্শন পেলে সে ভাষার ও সে সমাজের আসল আটপৌরে রূপটি আর অগোচর থাকে না। পাত্র ও বিষয় ভেদে এই কথোপকথনের ভাষা যে গম্ভীর বা লঘু হবে, মার্জিত বা স্থূল হবে, এমন কি বাঙলা দেশে তা ফারসী ঘেঁসা. বা সংস্কৃত-মিশানো হয়ে থাকে. কেরি নিজেই তা উল্লেখ করেছেন। কথোপকথনের' পরের সংস্করণে সংস্কৃত মার্জনা কেরি বাড়িয়ে দেন. কিন্তু ভাষার 'শুচিবাই' তাঁকে পেয়ে বসেনি। তাই 'কন্দল ও 'মাইয়া কন্দলের' নিদর্শন দিতে তাঁর আপত্তি হযনি। ডঃ সুশীলকুমার দে (*Bengali Literature*, পৃঃ ১৪৬) সত্যই বলেছেন—এদিক থেকে কেরি প্যারীচাঁদ, দীনবন্ধু প্রভৃতি খাটি বাঙলার স্রষ্টাদের পথ-প্রদর্শক। তাঁর 'গম্ভীর চালের' ও 'হালকা চালের', ভাষার নমুনায়ও বাঙলা গদ্যের এই যুগের প্রধান অন্তর্বিরোধের প্রথম আভাস পাওয়া যায়— পণ্ডিতী ভাষা'. না, 'আলাপী ভাষা' গদ্যে কোন্ ভাষা গ্রাহ্য হবে। কেরি নিজে ক্রমশঃই অনাবশ্যক সংস্কৃত পদ গ্রহণ করছিলেন। অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করা অপেক্ষা 'কথোপকথন' একবার দেখে নেওয়াই পাঠকের প্রয়োজন ('দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা'য় তা পুনর্মুদ্রিত হওয়ায় এখন তা সুসাধ্য)। তবে আধুনিক দাঁড়ি-কমা-সেমিকোলনের অভাবে একটু অসুবিধা বোধ করতে হবে. কিন্তু পরবর্তী অনেক বিচার-বিতর্কের গ্রন্থের

তুলনায় 'কথোপকথন' অনেক সময়েই সুপাঠ্য—ভাষা কিছুটা সাবলীল। দু'একটি ক্ষুদ্র অংশ দৃষ্টান্তস্বরূপ নেওয়া যাক—'ভদ্রলোকে ভদ্রলোকে' কথা হচ্ছে যারা 'আঙুল ফুলে কলাগাছ' হচ্ছেন তাঁদের সম্বন্ধে :

তাঁহার ('বড় ভট্টাচার্যের') ভ্রাতুষ্পুত্ররা কেমন আছেন।

তাঁহারা মহারাজ চক্রবর্তী তাঁহাদের সহিত কার কথা তাঁহার প্রতিযোগিতার লোক আমার দেশে নাই।

এবারে কোম্পানীর কায পাইয়া মহা-ধনাঢ্য হইয়াছে তাঁহারদের সমান ধনীলোক আমার দেশে চাকরী করিয়া হইতে পারেন নাই।

কেবল ধনী নহে বিষয়ও অনেক করিয়াছে আজি নাগাদ কমবেস লাকোটাকার জমিদারী করিয়াছে।

সমস্তই ভাগ্যের বশীভূত দেখ দিকি তাহারা কি ছিলেন এখন বা কি হইয়াছেন। এ আঙ্গুল ফুলিয়া কলাগাছ হইয়াছে।

বিষয়টির সামাজিক তাৎপর্যের কথা ছেড়ে দিই। দেখতে পাই ক্রিয়াপদে ও সর্বনাম প্রভৃতিতে চল্‌তি রূপের সঙ্গে সাধুরূপ মিশে গিয়েছে। এ দোষ ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষ পর্যন্ত প্রসিদ্ধ বাঙালী লেখকদেরও ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও তা সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে পারেননি। তার কারণ কতকটা হয়ত তখনো বানান-গত (orthographic) বিপদ ছিল, কতকটা হয়ত চলিতের 'মাত্রা' অনির্ধারিত ছিল।

'কথোপকথনে'র মজুরের কথাবার্তা একটু দেখলেই বুঝব প্রভেদ কত :

কলনা কায়েতের বাড়ী মুই কায করিতে গিয়াছিনু। তার বাড়ী অনেক কায আছে। তুই যাবি।

না ভাই। মুই সে বাড়ীতে কায করিতে যাব না তারা বড় ঠেঁটা। মুই আর বছর তার বাড়ী কাজ করিয়াছিলাম মোর দুদিনের কড়ি হারামজাদগি করিয়া দিলে না মুই সে বাড়ীতে আর যাব না।......ইত্যাদি।

'মুই' 'ছিনু' প্রভৃতি এখন আর সাহিত্যের চলতি ভাষায় গ্রাহ্য নয়, গ্রাম্য বাঙলা। কিন্তু তখনো এই 'মাত্রা' কিছুমাত্র স্থির ছিল না।

আরও সচল ভাষায় লেখা 'স্ত্রিলোকের হাট করা'—সেদিনের সুতো-কাটুনীদের কথা :

আরটে সকাল বয়ে চল সুতা না বিকেলে তো নুন তেল বেসাতি পাতি হবে না।

সুতা বুন সেদিন কলাঘাটার হাটে গিয়াছিলাম তাহাতে দেখিয়াছি সুতার কপালে আগুণ লাগিয়াছে। পোড়া কপালে তাঁতি বলে কি আটপণ করে সুতাথান। সে সকল সুতা আমি এক কাহন কিচিটে।......

অপেক্ষাকৃত ভদ্রঘরের কথাবার্তাও এমনি সাবলীল। কথোপকথন' রচনায় পণ্ডিতদের কারও কারও হাত ছিল এ কথা প্রায় স্বীকৃত। বাইবেলে কেরির নিজের লেখা যা পাই, তা থেকেও এ কথা যথার্থ মনে হয়। সে হাত কতটা আর সে হাত কার, তা বলা এখন দুঃসাধ্য। ১৮০১এ প্রকাশিত বই। রামরাম বসুই তৎপূর্ব পর্যন্ত কেরির প্রধান সহায়। কিন্তু তিনি তখন 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' রচনায় ব্যস্ত। কলেজের প্রধান পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারকে তাই 'কথোপকথনে'র জন্য দায়ী করলে তা অযৌক্তিক হয় না (সঃ কাঃ দাস—বাঃ গঃ প্রঃ যুঃ, পৃঃ ১১০)। অন্যান্য ক্ষেত্রে মৃত্যুঞ্জয় নানাবিধ ভাষারীতিতে যে দখল দেখিয়েছেন, তাতে এরূপ কাজ তাঁর পক্ষে সহজ-সাধ্য।

কেরির কৃতিত্ব তবে কি? প্রথমতঃ, বই কেরির নামে, অতএব কেরিই লেখক, মৃত্যুঞ্জয় অনুমান মাত্র। দ্বিতীয়তঃ, বিষয়-নির্বাচন নিঃসংশয়ে কেরির। তৃতীয়তঃ, কেরি বহুভাষাবিদ্ হলেও মূলতঃ সাহিত্যশিল্পী ন'ন, মূলতঃ তিনি বৈজ্ঞানিক—গদ্যের প্রাথমিক প্রয়োজন হচ্ছে যোগাযোগের, আলোচনার এবং যুক্তি-চিন্তার বাহন হয়ে মানুষের জ্ঞান-জীবনকে মুক্ত করা। কেরি বাঙালীর সেই সামাজিক বাহনকে নির্মাণ করতে চেয়েছেন।

(২) **'ইতিহাসমালা'** : খ্রীঃ ১৮১২ সালে 'ইতিহাসমালা' প্রথম প্রকাশিত হয়। 'ইতিহাস' বলতে তখনো 'হিস্টরি বোঝাত না, কেরি বোঝাতে চেয়েছেন 'স্টোরি', গল্প বা কাহিনী—যেমন বত্রিশ সিংহাসনে আছে। ইতিহাস-মালা'র গল্পগুলি অনুবাদমাত্র। এ বইও কেরির রচনা নয়, তাঁর সংকলন—বইয়ের ইংরেজি নামপত্রে এসব কথা পরিষ্কার (ইতিহাসমালা or A Collection of Stories in the Bengalee Language. Collected from Various Sources. By W. Carey, D. D. ইত্যাদি)। 'ইতিহাস-মালা' হচ্ছে তাই বাঙলা সাহিত্যের প্রথম গল্প-সংকলন—তবে সে সব গল্প মৌলিক সৃষ্টি নয়। ১৫০টি শিরোনামায় এ গ্রন্থে নানা স্থানের ১৫৮টি গল্প সমাহৃত হয়েছে। পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ, বেতাল পঞ্চবিংশতি প্রভৃতি সংস্কৃতের কথা-স্রোতস্বতী তো আছেই—তবে বাঙলা দেশের গল্পই বেশী।

ফারসী-হিন্দুস্থানী থেকেও কিছু সংগৃহীত হয়ে থাকবে। অন্ততঃ তিনটি গল্পে ঐতিহাসিক চরিত্রেরও দর্শন পাওয়া যায়—প্রতাপাদিত্য (হয়ত ভারতচন্দ্রের কাল থেকেই প্রতাপাদিত্য বাঙলা সাহিত্যে স্থান করে নিচ্ছিলেন), রূপ ও সনাতন, আকবর ও বীরবল।

গল্পগুলি ফোর্ট উইলিয়মের পণ্ডিতেরা লিখেছেন, তাতে সন্দেহ নেই। কে কোন্‌টি লিখেছেন, তা বলা অসম্ভব। অনুমান করা চলে, তাতে লাভ নেই। সমগ্রভাবে দেখে বলতে হয় খ্রীঃ ১৮০১ থেকে খ্রীঃ ১৮১২ এই ১১ বৎসরে বাঙলা লেখকরা গদ্য লেখায় অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন; কেরির বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে বাঙলা গদ্যের 'সিনট্যাক্‌স্‌ বা অন্বয়রীতি ধরা পড়েছে, এবং কেরি স্বয়ং ফারসী-হিন্দুস্থানী থেকে ছাড়িয়ে বাঙলাকে সংস্কৃতের তিলক-চন্দনে সাজাতে বেশী সচেষ্ট হয়েছেন। সবশুদ্ধ ১১ বৎসরে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের গদ্য-সৃষ্টি যে কতটা অগ্রসর হতে পেরেছিল 'ইতিহাসমালা তার একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। ভাষা মোটের উপর সচল। দু'একটি গল্পে সংস্কৃত প্রভাব প্রচুর। 'কথোপকথনে'র মত 'সবেগ সাবলীলতা' নেই, তা ঠিক। সেই দাঁড়ি-কমার অভাবে ঠেকতে হয়, না হলে এই পরিচিত ছোট্ট (১৩৪ সংখ্যক) 'ইতিহাস'টি মন্দ কি ?

সাধুস্বভাব এক ব্যাক্তি পথে যাইতেছিলেন তথায় এক সরোবরে কথগুলি লোক বড়িশীতে মাংসাদি অর্পণ করিয়া মৎস্য ধরিতেছে মৎস্যসকল আহারার্থ আসিয়া আপন আপন প্রাণ দিতেছে ঐ সাধু এইরূপ দেখিয়া নিকটস্থ এক রাজসভাতে গিয়া কহিলেন অদ্য পুষ্করিণীর তটে আশ্চর্য দেখিলাম সভাস্থিত ব্যক্তিরা কহিল কি তিনি কহিলেন দাতা ব্যক্তি নরকে যাইতেছে এবং গ্রহীতাও প্রাণ ত্যাগ করিতেছে তখন কোন সভ্য ব্যক্তি কহিল এমত হয় না কেননা দান করিলে উত্তম গতি হয় এবং গ্রহণ করিলে নিরপরাধে প্রাণ নাশ হয় না এই কথা শুনিয়া সাধু কহিলেন যে আহারের আশা দিয়া নিকটে বড়িশ মাংসাদি দান করিলে বিশ্বাসঘাতকতার পাপ ভোগ করিতে হয় অতএব এমন দাতার অবশ্য নরকপ্রাপ্তি হইতে পারে এবং ঐ মাংস-আহারলোভী যে মৎস্যাদি তাহারও অবশ্য প্রাণ নাশ হইতে পারে এই কথা শুনিয়া সকলে জানিলেন যে দাতারও নরকপ্রাপ্তি সম্ভব বটে এবং গ্রহীতারও এ মৃত্যু সত্য বটে।

একটু দাঁড়ি-কমার সাহায্য পেলেই লেখাটি সুপাঠ্য হয়ে ওঠে।

বাইবেলের অনুবাদ, ইংরেজিতে বাঙলা ব্যাকরণ (১৮০১), ও বাঙলা-ইংরেজি অভিধান (১৮১৫-'২৫) প্রভৃতি এখানে আলোচ্য না হলেও কেরির অবিস্মরণীয় কীর্তি।

কেরি-চরিত্র ঃ উইলিয়ম কেরি অসামান্য পুরুষ ছিলেন এমন বলা যায় না, কিন্তু অসামান্য তাঁর কর্মজীবন। তার কারণ আজ আমরা বুঝতে পারি। একটা অসামান্য শক্তির মুখপাত্র হয়ে উঠেছে তখন কেরির জাতি। সেই শক্তি 'আধুনিক যুগ-ধর্ম'। তার বিপুল প্রভায় কেরির মত একাধিক ইংরেজ চরিত্র আলোকিত ও অসামান্য হয়ে ওঠে। কেরির চরিত্র বর্ণনায় তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রও বলেছেন—কেরির মনে বা জীবনযাত্রায় অসামান্যতার কোন চিহ্ন ছিল না। কেরি স্বয়ং আরও স্পষ্ট করেই এই মর্মের কথা এই ভ্রাতুষ্পুত্রকে লিখেছিলেন—"আমার অবর্তমানে আমাকে যদি কেউ বিচার করতে চায় তাহলে একটা তার মাপকাঠি তোমাকে বলে দিয়ে যাই। যদি সে বলে আমি পরিশ্রমী, তাহলে সে আমার সম্বন্ধে ঠিক কথা বলবে। তার বেশি কিছু বললে অতিরঞ্জন হবে। আমি খাটতে পারি। কাজ স্থির করে নিয়ে আমি তাতে লেগে থাকতে জানি। এই আমার একমাত্র গুণ;" [If he gives me credit for being a plodder, he will describe me justly. Anything beyond this will be too much. I can plod. I can persevere in any definite pursuit. To this I owe everything. পূর্বোক্ত বাঃ গঃ প্রঃ যুগে উদ্ধৃত, পৃঃ ১৩২]

প্রতিভার একটি সংজ্ঞা নাকি পরিশ্রম করবার অশেষ শক্তি। তাহলে উইলিয়ম কেরি নিশ্চয়ই প্রতিভাবান্ পুরুষ।

রামরাম বসু (?—১৮১৩)

বঙ্গজ কায়স্থ রামরাম বসু বাঙলার প্রথম মুদ্রিত মৌলিক গদ্যগ্রন্থের লেখক। 'রাজা প্রতাপ-আদিত্য চরিত্র' ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্রদের জন্য প্রকাশিত প্রথম পাঠ্য-পুস্তক; খ্রীঃ ১৮০১-এর আগস্ট মাসে তা বেরোয়। রামরাম বসুর দ্বিতীয় গদ্য-পুস্তক 'লিপিমালা' পর বৎসর খ্রীঃ ১৮০২ সালে প্রকাশিত হয়। এছাড়া রামরাম বসু 'খ্রীষ্টস্তবের' (খ্রীঃ ১৭৮৮) ও দুটি খ্রীষ্টসঙ্গীতের (খ্রীঃ ১৮০২) লেখক। এবং 'খ্রীষ্ট বিবরণামৃত' (খ্রীঃ ১৮০৫) নামে পদ্যে-রচিত খ্রীষ্টচরিত্রও তাঁরই লিখিত হতে পারে। আর, টমাস ও কেরি প্রমুখ খ্রীষ্টধর্ম প্রচারকদের বাইবেল অনুবাদে (গদ্য) ও হিন্দুর-

পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে প্রচারে যে তিনি প্রধান সহায় ছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। তাঁর রচিত 'হরকরা' (১৮০০), 'জ্ঞানোদয়' (১৮০০), ব্যঙ্গবিদ্রূপে হিন্দুদের চঞ্চল করে তুলেছিল। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠার অনেক পূর্ব থেকেই তিনি টমাস ও কেরির মুন্‌সি হিসাবে তাঁদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসেন। কলেজেও তিনি প্রথম থেকেই পণ্ডিত নিযুক্ত হন। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে সেই পদে অধিষ্ঠিত থাকা কালে তাঁর মৃত্যু হয়, তাঁর পুত্র নরোত্তম বসু তখন তাঁর স্থলে কলেজের পণ্ডিত নিযুক্ত হন।

রাজা প্রতাপাদিত্য এই বঙ্গজ কায়স্থের মনকে স্বভাবতঃই আকৃষ্ট করেছিল। গ্রন্থের দ্বিতীয় প্যারাটিতে রামরাম বসু তা বলেছেন :

সংপ্রতি সর্বারম্ভে এ দেশে প্রতাপাদিত্য নামে এক রাজা হইয়াছিলেন তাহার বিবরণ কিঞ্চিৎ পারস্য ভাষায় গ্রন্থিত আছে সাঙ্গ পাঙ্গ রূপে সামুদাইক নাহি আমি তাহারদিগের স্বশ্রেণী একই জাতি ইহাতে তাহার আপনার পিতৃপিতামহের স্থানে শুনা আছে অতএব আমরা অধিক জ্ঞাত এবং আর ২ অনেকে মহারাজার উপাখ্যান আনুপূর্বিক জানিতে আকিঞ্চন করিবেন এ জন্য যেমত আমার শ্রুত আছে তদনুযায়ি লেখা যাইতেছে।

ভাষার নমুনা হিসাবে এ অংশটিকে গ্রহণ করলে হয়ত ঠিক হবে না। কারণ, রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্রে ফারসী শব্দের আধিক্য দেখা যায় ;—এই অংশে তা নেই। সে আধিক্য দু কারণে—প্রতাপাদিত্য বাদশাহী আমলের সামন্ত, যে রাজনৈতিক ও সামাজিক স্তরে তাঁর স্থান সেখানে সে সময়ে ফারসীর একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল। দ্বিতীয়তঃ কায়স্থ রামরাম বসুও ফারসী-পড়া পাকা মুন্‌সি—সাহেবদের সাহচর্যে তিনি ইংরেজিও শিখেছিলেন, সংস্কৃতেও তাঁর অধিকার কম ছিল না. কিন্তু বোধ হয় ফারসীর থেকে তা বেশি নয়। যাই হোক, রাজা প্রতাপাদিত্যের থেকে দু'শ বৎসর পরেকার এই বঙ্গজ কায়স্থের জীবনটাও কম কৌতূহলোদ্দীপক নয়। এ কালের ঔপন্যাসিকের হাতে রামরাম বসু ছোট খাটো একখানা উপন্যাসের নায়ক হয়েও উঠতে পারেন।*

রামরাম বসু কবে কোথায় জন্মেছিলেন, তা স্থির করা যায় না। তবে কার্যারম্ভে দেখি তিনি পাদ্রি টমাসের মুন্‌সি। সেদিনের সুপ্রীম কোর্টের

* 'কেরি সাহেবের মুন্সি' সম্বন্ধে ধারাবাহিক উপন্যাস লিখিত হয়েছে

ফারসী দোভাষী ছিলেন উইলিয়াম চেম্বার্স। রামরাম বসু তাঁর সুপারিশে টমাসের মুন্‌সি স্থির হন খ্রীঃ ১৭৮৭ অব্দে। তার পূর্বেই রামরাম বসু কিছু ইংরেজি শিখেছেন। টমাসের সঙ্গেই তিনি মালদহতে তাঁর মুন্‌সি হয়ে যান। সেদিনের আরবী-ফারসী শিক্ষার ফলে অনেকেরই মনে মুসলমান সংস্কৃতির প্রতি আকর্ষণ জন্মাত ও হিন্দু দেবদেবীর উপর বিশ্বাস শিথিল হত, তা অনুমান করা যায়। তাই বলে যে তাঁরা ধর্ম ও সমাজ ত্যাগ করতেন, তাও নয়। টমাসের মুন্‌সির পক্ষে তাই নিজ হিন্দুধর্মের অপেক্ষা মুনিবের খ্রীষ্টধর্মের প্রতি বেশী আকর্ষণ প্রকাশ করতে দ্বিধা হয়নি। বিশেষ করে সেই মুনিব যখন টমাসের মত উন্মাদ পাদ্রি। মুন্‌সির পক্ষে মুনিবকে বাগিয়ে নেওয়াই প্রধান কাজ; সেদিনের কোনো মুন্‌সি-মুৎসুদ্দিই তা অন্যায় মনে করত না। রামরাম খ্রীষ্টের অনুরাগী, এবং খ্রীষ্ট ভজতেও প্রস্তুত হচ্ছেন এ বিশ্বাস টমাসের মনে জন্মাতে তাই টমাসের এই মুন্‌সির কোনো দ্বিধা ছিল না। এই সূত্রে পাঁচ বছর টমাসকে তিনি বেশ দোহন করেন। টমাস দেশে গেলে রামরাম আর্থিক অসুবিধায় পড়েন এবং যথারীতি হিন্দু সমাজেরই সংস্কার-নিয়ম পালন করে চলেন। কিন্তু কেরিকে নিয়ে টমাস বাঙলায় ফিরে আসতেই (১৭৯৩) রামরাম বসু আবার তাঁদের সঙ্গে জুটলেন। তিনি কেরির মুন্‌সি নিযুক্ত হলেন। কেরির সঙ্গে তিনি মালদহ মদনাবাটিতে যান। এমন উপযুক্ত লোককে মুন্‌সি রূপে পেয়ে কেরি যে বিশেষ উপকৃত হয়েছিলেন, তা পরিষ্কার। কিন্তু খ্রীঃ ১৭৯৬এ তবু রামরাম বসুকে কেরির বিদায় দিতে হয়। পাদ্রিদের আশা কোনোদিন পূর্ণ হয়নি—রামরাম বসু বাইবেল অনুবাদে যত সাহায্য করুন, 'খ্রীষ্টস্তব যত লিখুন, জাতি ত্যাগ করে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেননি। অধিকন্তু এ সময়ে টমাস শুনলেন—নিকটস্থ এক যুবতী বিধবার প্রতি তিনি আসক্ত; সে বিধবার একটি সন্তান হয়, সন্তানটিকে গোপনে হত্যাও করা হয়েছে। কথাটা একেবারে পাদ্রিদের রটনা নাও হতে পারে। সেদিনের চতুর ও চৌকোস লোকদের পক্ষে এ ধরনের আচরণ মোটেই বিরল ছিল না। কেরি মুন্‌সিকে বিদায় দিলেন। কিন্তু গুণী মানুষকে একেবারে ছাড়াও যায় না। তাই শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠিত হতেই (খ্রীঃ ১৮০০) রামরাম বসু এসে যখন আবার কেরির সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন, কেরি তখন রামরাম বসুকে আবার মিশনের প্রচারকার্যে গ্রহণ করলেন। অবশ্য এর অল্প পরেই রামরাম বসু ফোর্ট উইলিয়ম

কলেজের পণ্ডিত নিযুক্ত হন। আর সে সময় সেই কলেজের পাঠ্যগ্রন্থ ছাড়া পদ্যে খ্রীষ্টধর্ম মহিমা প্রচারে ও হিন্দুধর্মকে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপবাণ-আঘাতে রামরাম বসুর কোনো দ্বিধা হয়নি। অবশ্য পরিবার পরিজন ত্যাগ করে তিনি কখনো খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেননি, বা করতে পারেননি। আর একটি কথাও এ প্রসঙ্গে বলা যায়। সব জিনিসের মতই অনেকে অনুমান করেছেন রামরাম বসু রামমোহনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েই পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে দাঁড়ান; আর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র'ও তিনি রামমোহনকে দেখিয়ে নেন। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পরিষ্কার করে দেখিয়ে দিয়েছেন এ অনুমান অমূলক। খ্রীঃ ১৭৮৭ সনের কাছাকাছি সময় থেকেই রামরাম খ্রীষ্টধর্মের সপক্ষে দাঁড়ান, আর কলমও ধরেন। রামমোহন তখন বালক। তবে খ্রীঃ ১৮০১-১৮০৩ এই সময়ে কলিকাতা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সঙ্গে রামমোহনের সংশ্রব ছিল, এই দু'জন যোগ্য লোকের সে সময়ে পরিচয় ঘটে থাকতে পারে। আসল কথা, দু'জনেরই হিন্দু দেবদেবার বিরুদ্ধে প্রথম বিরাগ জন্মায় হয়ত আরবী-ফারসী শিক্ষা ও মুসলমানী সংস্কৃতির সম্পর্কে এসে। রামমোহনের অনেক পূর্বে ১৮০২ অব্দে 'লিপিমালা' পুস্তকের ভূমিকায় রামরাম বসু পরম ব্রহ্মের উদ্দেশে নতি ও প্রার্থনার কথা বলেছেন, এ গৌরবও তাঁর। কিন্তু 'মানি সত্য নিরঞ্জন' এ কথা কয়টি 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদে'ও' দেখা যায়। আসলে পরমব্রহ্মের ধারণা বহু-দেববাদী হিন্দুসমাজের শিক্ষিত মানুষদের মধ্যে পূর্বাপরই প্রচলিত ছিল—আচার-আচরণে তাতে বাধা জন্মায় নি। রামরাম বসু যখন 'খ্রীষ্টচরিতামৃত' বিতরণ করেছেন, রামমোহন বরং তখন খ্রীষ্টদের 'ত্রিতত্ত্বের' বিরুদ্ধে অ্যাডামকে দীক্ষিত করছেন, তাও দেখতে পাব। রামরাম বসুকে রামমোহনের চ্যালা প্রমাণ না করলেও রামমোহনের মাহাত্ম্য কিছুমাত্র খর্ব হয় না।

(৩) **রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র** (১৮০১)—অখণ্ড একখানা গ্রন্থ, মৌলিক রচনা এবং ঐতিহাসিক জীবনীরও নিদর্শন। এতগুলি কথা যে গ্রন্থ সম্বন্ধে বলতে হয়, তা তুচ্ছ করবার মত নয়। এ বই তবু বাংলা গদ্যের ইতিহাসে একটু উদ্ভট। তার ভাষার নিদর্শন পূর্বে আমরা দেখেছি, সে সম্বন্ধে তখনি সামান্য আলোচনাও করেছি। সংস্কৃত-ফারসী-আরবী-বাংলা শব্দ—যেমন যা এসেছে রামরাম বসু পাশাপাশি তা বসিয়ে যা কাণ্ড করেছেন, তা এখন ভাবাই যায় না। আর অন্বয়ের প্রয়োজনও তাঁকে সংযত করতে পারত না।

সম্ভবতঃ তাঁর সময় ও সংযমের অভাব ছিল—আর গদ্যের কোনো আদর্শ সম্মুখে না পেয়ে একটা কিছু খাড়া করাই ছিল তাঁর কাজ। যা করেছেন সেই ভাষা সত্যই কোনো নির্দিষ্ট রীতি বা পদ্ধতির পর্যায়ে পড়ে না। 'ইহার উপমা কেবল ইহাই'—"a kind of mosaic half Persain, half Bengali." অবশ্য ব্যতিক্রম অনেক আছে, কিন্তু আদর্শের অভাবে এ ধরনের কাণ্ড এ গদ্যেরই প্রথম যুগে আরও কিছুকাল চলেছে। তাঁর পদ্য বা গান গতানুগতিক পথে চলেছে। কিন্তু গদ্যে তেমন তৈরী পথ তিনি পাননি। তাঁর গদ্য তাই তাঁর আপন চরিত্রের প্রতিলিপি হয়ে উঠেছে। তাতে চাতুর্য আছে, সৃষ্টিশক্তি নেই; সাহস আছে, শৃঙ্খলা নেই; না হলে এক এক সময় তিনি প্রায় সহজ গদ্য লিখে উঠছিলেন যেমন, যশোরের বাজারের বর্ণনা; কিন্তু তখনি বাঙলার স্বাভাবিক অন্বয়নীতি ভুলে কথার ঝোঁকে অন্য পথে চললেন।

(৪) **'লিপিমালা'** (১৮০২)—দেড় বৎসর পরে প্রকাশিত হয়। 'লিপিমালা'য় ৪০টি লিপি আছে—আর তার শেষে আছে 'অঙ্কমালা নামে অধ্যায়। প্রথম ধারায় আছে 'রাজা অন্য রাজাকে' লেখা ১০ খানি চিঠি, 'রাজা চাকরকে লেখা ৫ খানি চিঠি। দ্বিতীয় ধারায় আছে পিতা পুত্রকে গুরু লঘুকে মনিব সামান্য চাকরকে,—এরূপ নানা লোকের লেখা ২৫ খানি চিঠি। আসলে কিন্তু এসব চিঠিপত্র নয়; এসবে পত্রাকারে রাজা পরীক্ষিতের কথা, দক্ষযজ্ঞের কথা, নবদ্বীপে চৈতন্যের কথা, গঙ্গাবতরণের কথা প্রভৃতি নানা কাহিনী বিবৃত হয়েছে। সে সব কাহিনী পুরাতন, কিন্তু রচনা মৌলিক। তাই এ বইতেও রামরাম বসুর পরিচয় রয়েছে, একথা মানতে হবে। আর সে পরিচয় আরও স্পষ্ট। কারণ এ গ্রন্থে রামরাম বসুর ভাষা অনেকটা সংযত হয়ে উঠেছে, ফারসীর দৌরাত্ম্য কমেছে। কেউ কেউ মনে করেন (বাঃ গঃ প্রঃ যুঃ, পৃঃ ১৪৯), তার কারণ গদ্য রণাঙ্গনে ইতিমধ্যে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের আবির্ভাব। এটিও অনুমান ও সম্ভবতঃ অত্যুক্তি। এরূপও অনুমান করা চলে—কেরির 'কথোপ-কথন' গদ্যের অন্বয় স্থির করে এনেছিল। 'লিপিমালা'তে রামরাম বসুও সময় ও আদর্শ লাভ করে গদ্যের পথে সহজেই এখন চলতে পেরেছেন। সূচনাতেই তিনি 'পরব্রহ্মের উদ্দেশ্যে' নত হয়ে নিবেদন জানিয়েছেন,

এই স্থানে (এ হিন্দুস্থানে) এখন এ স্থলের অধিপতি ইংলণ্ডীয় মহাশয়েরা তাহারা এ দেশীয় চলন ভাষা অবগত নহিলে রাজক্রিয়াক্ষম হইতে পারেন না ইহাতে তাহারদিগের আকিঞ্চন এখানকার চলন ভাষা ও লেখাপড়ার ধারা অভ্যাস করিয়া সর্বধিক কার্যক্ষমতাপন্ন হয়েন।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের উদ্দেশ্ড ছাড়াও এ কথায় কি 'কথোপকথনে'রও মূল কারণ নির্দেশ করা হয়নি ? 'চলন ভাষা লেখাই যখন উদ্দেশ্ড তখন ফারসীর প্রভাবও কিঞ্চিৎ থাকবার কথা। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই—'লিপিমালা'র তা প্রায় নেই ; সংস্কৃতের প্রভাবই বরং অধিক, তার উৎকটতাও আছে। যেমন—

এ সামান্ত বিষয় প্রযুক্ত এখানকার কোপের বাহুল্য হয় না শৃগালের গর্জনে কেশরী নাহি রোষে যদিতু হইল তবে তোমার কি গতিক হইবেক কোথায় যাইবা তোমার সহায় বা কে এবং রক্ষা বা কে করিবে। ইত্যাদি ('রাজা অন্ত রাজাকে')।

কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 'লিপিমালা'র সংস্কৃত-মিশ্রিত ভাষাও এরূপ বেসামাল নয়। যেমন, 'রাজা চাকরকে' লিপিতে সতীর কাহিনী বর্ণনা। কিন্তু 'চলন ভাষার' যথার্থ নমুনা সামান্ত চাকরকে লিখিত মনিবের পত্রেই দেখতে পাই।

……অতএব তুমি পত্রপাঠ ভবানীপুর গ্রামে যাইয়া পাঁচ সাত দিবস সেই গ্রামে থাকিয়া তিন ভরা কাষ্ঠ বিক্রয় করিয়া টাকা শীঘ্র পাঠাইবা। এখানে ব্যয় পুসনের বড়ই অপ্রতুল হইয়াছে এবং আর কএকখান নৌকায় চালান দিতে হইবেক আমি এখান হইতেই কানাই মাঝিকে শীঘ্র বিদায় করিব তুমি তাহার অপেক্ষা করিবা না……ইত্যাদি।

এ বাঙলা যিনি লিখতে পারেন তিনি বাঙলা গদ্যের প্রকৃতি কিছুটা অনুভব করতে পেরেছেন। কিন্তু তাঁর নিজ প্রবৃত্তিই হয়ত রচনাকালে তার পক্ষে বারে বারে বাদ সেধেছে। না হলে গদ্য-সৃষ্টির কৃতিত্বও তাঁর প্রাপ্য হত ; এখন প্রাপ্য হয়েছে শুধু প্রচেষ্টার কৃতিত্ব।

গোলকনাথ শর্মা (?—১৮০৩)

(৫) **হিতোপদেশ** (১৮০২)—গোলকনাথ শর্মা 'হিতোপদেশে'র অনুবাদক। তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত নন। সম্ভবতঃ তিনি ছিলেন কেরির সংস্কৃত শিক্ষক পণ্ডিত, খ্রীঃ ১৭৯৫ অব্দের কাছাকাছি তিনি হিতোপদেশের কিছু কিছু অংশের অনুবাদ করছিলেন। শেষ পর্যন্ত 'হিতোপদেশ প্রকাশিত হয় সম্ভবতঃ খ্রীঃ ১৮০২তে। খ্রীঃ ১৭৯৪ থেকে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত (খ্রী ১৮০৩) গোলকনাথ ও তাঁর ভ্রাতা কাশীনাথ মুখোপাধ্যায় মিশনারিদের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। সম্ভবতঃ, তাঁরা ছিলেন তখনকার মালদহের

মদনাবাটি অঞ্চলের অধিবাসী। 'হিতোপদেশে'র কয়েকটি উপভাষার চিহ্ন থেকেও এরূপ মনে হয়। স্বগৃহে গোলকনাথের মৃত্যু হলে (১৮০৩ খ্রীঃ) তাঁর স্ত্রী সহমৃতা হন, আর তাতে সহায়তা করার জন্ত কাশীনাথকেও মিশনারিরা চাকরি থেকে বিতাড়িত করেন—এটুকু তথ্যও জানা যায় (সজনী—বাঃ গঃ প্রঃ যুঃ, পৃঃ ১৫১-১৫২)। গোলকনাথের অনুবাদের ত্রুটি দেখানো যেতে পারে। ভাষায় 'বাঙাল'-বিচ্যুতিও আছে, বানান ও বাক্য-বিন্যাসও আগাগোড়া নির্দোষ নয়। তবু আসল কথাটা বলা শ্রেয়ঃ ;—বাঙলা গদ্যের বিচারে 'হিতোপদেশে'র ভাষা সত্যই সরল ; বাক্যরীতি মোটের উপর সহজবোধ্য। সংস্কৃতের অনুবাদ বলেই ভাষায় সংস্কৃত-প্রভাব প্রবল, কিন্তু তা পাণ্ডিত্য-কণ্টকিত নয়। এই ভাষায় মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের বিদ্যালঙ্কারিকতা নেই, রামরাম বসুর ফারসীর উৎকট আতিশয্যও নেই। নমুনা হিসাবে কথামুখের আরম্ভাংশ নেওয়া যাক :

কোন নদীর তীরেতে পাটলীপুত্র নামধের এক নগর আছে সে স্থানে সর্ব স্বামী গুণোপেত সুদর্শন নামে রাজা ছিল। সেই রাজা এককালে কোন কাহার মুখে দুই শ্লোক শুনিলেন তাহার অর্থ এই শাস্ত্র সকলের লোচন অতএব যে শাস্ত্র না জানে সেই অন্ধ। আর যৌবন ধন সম্পত্তি প্রভুত্ব অবিবেক ইহার যদি এক থাকে তবেই অনর্থ সমুদয় থাকিলে না জানি কি হয়।……… ইত্যাদি।

পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ জাতীয় নীতিকথা সেদিনের পাঠ্যবিষয়ের তালিকায় বিশেষ গুরুত্বলাভ করেছিল। সংস্কৃত থেকে সে সব গল্পের আরও অনুবাদ হয়। গোলকনাথের 'হিতোপদেশ' (খ্রীঃ ১৮০২) ততটা প্রচারিত হয়নি। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'হিতোপদেশ'ই (খ্রীঃ ১৮০৮) রচনার গুণে ও অন্যান্ত কারণে অধিক আদর লাভ করেছে।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার (১৭৬২ ?—১৮১৯)

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ছিলেন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান পণ্ডিত (১৮০১-১৮১৬), সেদিনের পণ্ডিত-সমাজে অগ্রগণ্য। এ পর্বের (১৮০০-১৮১৫) বাঙলা গদ্যের ইতিহাসে তাঁকে শ্রেষ্ঠ আসন দিতে আপত্তি করা উচিত নয়। অবশ্য তাঁর প্রধান গ্রন্থ 'প্রবোধ চন্দ্রিকা' এ সময়ে রচিত হয়েছিল কিনা সন্দেহ। আর ১৮১৩-তে তা রচিত হয়ে থাকলেও প্রথম প্রকাশিত

হয়েছিল ১৮৩৩-এ। অন্য গ্রন্থ ও 'বেদান্ত চন্দ্রিকা' রামমোহনের 'বেদান্তগ্রন্থ' ও 'বেদান্তসারের' (খ্রী: ১৮১৫) প্রতিবাদে লিখিত হয় খ্রী: ১৮১৭ সনে। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়ের মৃত্যু ঘটে খ্রী: ১৮১৯ অব্দে। তাই রামমোহনের পর্বারম্ভে (ইং ১৮১৫) তিনি জীবিত থাকলেও তাঁর কৃতিত্ব তখন শেষ হয়ে এসেছে। মৃত্যুঞ্জয়কে তাই কেরির যুগের গদ্য-গুরু বলেই গণনা করা শ্রেয়ঃ। পূর্বেই দেখেছি মোট পাঁচ খানি বাঙলা গ্রন্থের তিনি রচয়িতা :

বত্রিশ সিংহাসন—খ্রী: ১৮০২

হিতোপদেশ—খ্রী: ১৮০৮

রাজাবলি—খ্রী: ১৮১৭

প্রবোধ চন্দ্রিকা—খ্রী: ১৮১৩ (?) প্রকাশকাল—খ্রী: ১৮৩৩

বেদান্ত চন্দ্রিকা—খ্রী: ১৮১৭

সেদিনের এই অসামান্য পণ্ডিতের জীবনী সম্বন্ধেও মিশনের পাদ্রিরা যতটুকু সংবাদ দিয়ে গিয়েছেন তার বেশী সংবাদ জানবার আমাদের উপায় ছিল না। অক্ষয়কুমার সরকার, ডা: সুশীলকুমার দে ও শেষে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নতুন তথ্য উদ্ধার করে আমাদের জ্ঞান আরও কতকাংশে প্রসারিত করেছেন।

ইং ১৭৬১-'৬৩ অব্দে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের জন্ম। পাদ্রিরা (জে. সি. মার্শম্যান—হিস্টরি অব শ্রীরামপুর মিশন-এ) বলেছেন, তিনি ওড়িষ্যার অধিবাসী. তাঁর শিক্ষালাভ হয় নাটোরে, এবং পরে কলিকাতায় বাগবাজারে (রাজবল্লভ স্ট্রীটে) তিনি বাস স্থাপন করেন। ওড়িষ্যা বলতে তখন মেদিনীপুরকেও বোঝাত, হয়ত এখানেও তাই বুঝিয়েছে। তবে এও মনে হয় ওড়িষ্যার ভদ্রকে মৃত্যুঞ্জয়ের কোন এক পূর্বপুরুষ বাস করে থাকবেন. কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে মৃত্যুঞ্জয় ছিলেন রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ, "থানের চাটুতি শ্রীকরের সন্তান" (দ্রঃ ডঃ দেঃ পৃঃ ২০৩)। রামমোহন রায়ও বিচার কালে তাঁকে 'ভট্টাচার্য' বলে ইঙ্গিত করেছেন। ওড়িষ্যায় জন্মে থাকলেও মৃত্যুঞ্জয়কে তাই কুলগত ভাবে ওড়িয়া বলা কিছুতেই চলে না। তারপর. অধ্যয়ন অধ্যাপনা সবই তাঁর বাঙলায়। সম্ভবতঃ কেরি উত্তরবঙ্গে মদনাবাটি (মালদহ) থাকতেই তাঁর পাণ্ডিত্যখ্যাতি শুনেছিলেন, মৃত্যুঞ্জয়ের সঙ্গে সম্পর্কও স্থাপন করেছিলেন। অন্ততঃ কলকাতার দিকে আসার অনতিকাল পরেই যখন কেরি কলেজের

বাঙলা বিভাগের ভার নিলেন তার পূর্বেই মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে তিনি নিঃসন্দেহ হয়েছেন, হয়তো তখনি তাঁকে নিজের শিক্ষকও নিযুক্ত করেছেন। কারণ, দেখি কেরি প্রথম থেকেই তাঁকে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে ২০০৲ দু'শত টাকা মাহিনায় বাঙলা-বিভাগের প্রধান পণ্ডিত নিযুক্ত করেন (খ্রীঃ ১৮০১, মে মাস)। কেরির নির্দেশেই মৃত্যুঞ্জয় বাঙলা পাঠ্য-পুস্তক রচনায় হাত দেন। প্রথম লেখেন 'বত্রিশ সিংহাসন' (খ্রীঃ ১৮০২), এ গ্রন্থের জন্য দু'শত টাকা মৃত্যুঞ্জয় পারিতোষিক পেয়েছিলেন। খ্রীঃ ১৮০৫ থেকে কলেজের সিভিলিয়ানদের সংস্কৃত অধ্যাপনার ভার তাঁর উপর অর্পিত হয়—মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের পাণ্ডিত্যখ্যাতি তখন সুপ্রতিষ্ঠিত। 'হিতোপদেশ' ও 'রাজাবলি' (খ্রীঃ ১৮০৮) এবং 'প্রবোধচন্দ্রিকাও' (খ্রীঃ ১৮১৩?) এই ছাত্রদের লক্ষ্য করেই রচিত—সাহিত্য রচনার উদ্দেশ্যে বা জনসাধারণের উদ্দেশ্যে রচিত নয়। খ্রীঃ ১৮১৬ অব্দে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য সুপ্রিম কোর্টের 'জজপণ্ডিতের' পদে (৯ই জুলাইর পর) নিযুক্ত হন, এবং তাতে যোগদান করেন। এ সময়েই তিনি বেনামে রামমোহনের ব্রহ্মোপাসনা প্রভৃতি প্রচারের বিরোধিতা করে লেখেন 'বেদান্তচন্দ্রিকা' (খ্রীঃ ১৮১৭)। একমাত্র এ লেখাটিরই লক্ষ্য বাঙালী শিক্ষিত সমাজ। তখন তিনিও তাঁদের একজন নেতৃস্থানীয় পুরুষ—স্কুল বুক সোসাইটির পরিচালন-সমিতির সদস্য। হিন্দু কলেজ স্থাপনা কালেও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারকে নিয়মাবলী প্রণয়ন করতে হয়। সহমরণের বিরুদ্ধে রামমোহন রায়েরও পূর্বে প্রথম তাঁর মতামতই স্পষ্ট করে ব্যক্ত হয়। খ্রীঃ ১৮১৮এর পরে মৃত্যুঞ্জয় অসুস্থ হয়ে পড়েন, এবং খ্রীঃ ১৮১৯এর মধ্যভাগে মুর্শিদাবাদে তাঁর মৃত্যু হয়।

ফোর্ট উইলিয়ম-এর লেখকমণ্ডলীর মধ্যে যাঁরা পরবর্তী লেখকদের উপর প্রভাব বিস্তার করেছেন, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। দুর্ভাগ্যক্রমে অনেককাল পর্যন্ত এ প্রভাবের যথার্থ পরিমাপ হয়নি। মৃত্যুঞ্জয়ের বাঙলা অন্যায় ভাবেই অনেক সময়ে নিন্দিত হয়েছে। সে হাওয়া কতকটা ফেরে ডঃ সুশীল-কুমার দে'র বিচক্ষণ মূল্যায়নে। তারপর বিংশ শতকের দ্বিতীয় পাদে আবার কতকটা উল্টো হাওয়ায় মৃত্যুঞ্জয়ের কাঁধে এসে পড়ল বাঙলা গদ্যের সমস্ত নির্মাণ-কৃতিত্ব। ভাগ্যের খেলা ভিন্নও এ ব্যাপারে একালের মতবাদের খেলাও থাকতে পারে। কিন্তু আমরা মনে রাখতে পারি পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার

তখনকার পাদ্রিদের চোখে ছিলেন দেহে ও বিদ্যায় ডাক্তার জনসন—"a colossus of literature"; আর তাঁদের মতে "His knowledge of the classics was unrivalled, and his Bengali composition has never been surpassed for ease, simplicity, and vigour." (J.C. Marshman—The Life & Times of Carey, Marshman and Ward)। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার যুগপুরুষ নন, কিন্তু বাংলা গদ্যের ক্ষেত্রে তিনি সচেতন স্টাইলিস্ট। একালে প্রকাশিত মৃত্যুঞ্জয় গ্রন্থাবলী এজন্ত আদরের জিনিস।

(৬) 'বত্রিশ সিংহাসন': খ্রীঃ ১৮০২ থেকে মৃত্যুঞ্জয়ের গদ্য-রীতির বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। কারণ, সত্যই এ ভাষার সঙ্গে 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্রের ভাষার আকাশ পাতাল প্রভেদ। বত্রিশ সিংহাসন ও বেতাল পঞ্চবিংশতি জাতীয় কাহিনীমালা এ দেশে সুপ্রচলিত। মৃত্যুঞ্জয় সম্ভবত এসব কাহিনী সংস্কৃত 'দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা' থেকেই অনুবাদ করে থাকবেন। ফারসীর চিহ্ন এখানে থাকা সম্ভবও নয়। মৃত্যুঞ্জয়ের চেষ্টা ছিল বরং বাঙলাকে সংস্কৃতের মার্জনায় মার্জিত করা। 'বত্রিশ সিংহাসন' অনুবাদের ভাষা 'অত্যধিক সংস্কৃতপ্রধান নয়', এ কথা সত্য; কিন্তু এ কথা মৃত্যুঞ্জয়ের পরবর্তী গ্রন্থাদির ভাষা সম্বন্ধে সত্য নয়। দীর্ঘ ও জটিল বাক্যবিন্যাসে এ বইয়ের ভাষা মাঝে-মাঝে বিভ্রান্ত করে, না হলে মোটের উপর তা সচল স্বচ্ছন্দ। ছোট অংশ থেকেও দোষ ও গুণ সহজে বোঝা যায়। ধরা যাক নিয়ের অংশটুকু:

দক্ষিণদেশে ধারা নামে পুরী ছিল। সেই নগরের নিকট শম্বদকর নামে এক শস্যক্ষেত্র থাকে তাহার কৃষকের নাম যজ্ঞদত্ত। সেই কৃষক শস্যক্ষেত্রের চতুর্দিগে পরিখা করিয়া.........বেধার প্রভৃতি নানান জাতীয় বৃক্ষ রোপণ করিয়া এক উদ্যান করিয়া আপনি সেই উদ্যানের মধ্যে থাকেন।

শস্যক্ষেত্রের বেলা 'আছে' অর্থে 'থাকে' প্রয়োগ পরেও ('হিতোপদেশ'-এ) মৃত্যুঞ্জয় ছাড়েননি। তাছাড়া,

"তৎপর রাজা হৃষ্টচিত্ত হইয়া আপনার রাজধানীতে সিংহাসন আনয়নের ইচ্ছা করিয়া ভৃত্যবর্গদিগকে আজ্ঞা করিলেন। আজ্ঞা পাইয়া ভৃত্যবর্গেরা সিংহাসন চালন কারণ অনেক যত্ন করিল সে সিংহাসন নড়িল না।"

নির্ভুল হলেও এ বাক্য-রীতি নির্দোষ নয়। 'ভৃত্যবর্গদিগকে' প্রভৃতি নির্ভুল প্রয়োগও নয়। কিন্তু সহজভাবে দেখলে মানতেই হবে—বাঙলা

গদ্যের উপর লেখকের দখল জন্মেছে। 'বত্রিশ সিংহাসনে' চলতি ধারার ভাষার দৃষ্টান্তও আছে, তবে সংস্কৃতানুসারী দৃষ্টান্তই বেশি।

(৭) 'হিতোপদেশ'ও অনুবাদ গ্রন্থ, ছয় বৎসর পরে প্রকাশিত। স্বভাবতঃই গোলোকনাথ শর্মার 'হিতোপদেশের' ভাষার সঙ্গে মৃত্যুঞ্জয়ের ভাষার তুলনা করা হয়। দু'এক স্থলে মনে হয়—মৃত্যুঞ্জয়ই তুলনায় হারছেন; কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই তিনি শ্রেষ্ঠ। যেমন, গোলোকনাথের পূর্বোদ্ধৃত অংশের সঙ্গে তুলনীয় মৃত্যুঞ্জয়ের এই কথামুখের অংশ :

ভাগীরথী তীরে পাটলিপুত্র নামে নগর আছে সেখানে সকল রাজগুণে যুক্ত সুদর্শন নামে রাজা ছিলেন সেই ভূপতি এক সময়ে কাহারও কর্তৃক পাঠ্যমান শ্লোকদ্বয় শ্রবণ করিলেন তাহার অর্থ এই —অনেক সন্দেহের নাশক এবং অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের জ্ঞাপক যে শাস্ত্র সে সকলের চক্ষু ইহা যাহার নাই সে অন্ধ। আর যৌবন ও ধনসম্পত্তি ও প্রভুত্ব ও অবিবেকতা এই চতুষ্টয় প্রত্যেকেও অনর্থের নিমিত্ত হয় যেখানে এ চতুষ্টয় সেখানে কি হয় কহিতে পারি না।

সংস্কৃতের মাত্রা মৃত্যুঞ্জয় বাড়িয়েছেন, এ ব্যতীত আর বেশি কিছু এটুকু থেকে প্রমাণিত হয় না। কিন্তু বহু স্থলেই দেখব সংস্কৃতের গুণে ভাষায় গাম্ভীর্য এসেছে। মৃত্যুঞ্জয়ের 'হিতোপদেশ' বহু প্রচারিত আদর্শ হয়ে দাঁড়ায়।

(৮) 'রাজাবলি'ও সংস্কৃত রাজাবলি নামক গ্রন্থের অনুবাদ বা অনুসরণ, তা এখন স্বীকৃত (দ্রষ্টব্য: ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার—বঃ সাঃ পঃ পত্রিকা—৬৪ ভাগ)। মৃত্যুঞ্জয় নিজেও তাকে বলেছিলেন 'সংগ্রহ'। আর সম্ভবত গ্রন্থের নাম দিয়েছিলেন রাজতরঙ্গ। কেরি প্রমুখ সাহেবদের নির্দেশেই হোক্ বা রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্রে'র বা রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের 'মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রস্য চরিত্রং' (খ্রীঃ ১৮০৫)-এর সমাদর (?) দেখেই হোক্, মৃত্যুঞ্জয় এরূপে ভারতবর্ষের ইতিহাস সংকলনে প্রথম হাত দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর ঐতিহাসিক চেতনা বিশেষ ছিল না; জনশ্রুতি ও কল্পনা অবাধে মিশিয়ে তিনি যা তৈরী করেছেন তা ইতিহাস নয়। ভারতবর্ষের রাজা ও রাজবংশের সংক্ষিপ্ত একটা ধারাবাহিক বিবরণ—'বর্তমান কলিযুগের আরম্ভ' থেকে একেবারে ১৮০০ 'য়িশবীসন' পর্যন্ত কালের কথা। আরম্ভ হয়েছে চন্দ্র-বংশের ক্ষেত্রজ সন্তান রাজা বিচিত্রবীর্যের থেকে, শেষ হয়েছে কোম্পানি শাসনের সুস্থির প্রতিষ্ঠায়। ইতিহাসের বিরাট মহত্ব মৃত্যুঞ্জয়ের ধারণায় আসেনি; কিন্তু রীতি বিষয়ের অনুগামী হয়, ভাষা-বিষয়ক এ মূল সত্যের

ধারণা মৃত্যুঞ্জয়ের ছিল। তাই, পণ্ডিতী বাঙলার গুরু বলে গণ্য মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার হিন্দুযুগের বিবরণ যান্নত্ত সংস্কৃত-প্রধান বাঙলায় লিখে যাচ্ছেন; কিন্তু সুলতান-বাদশাহের আমলে পৌঁছে প্রয়োজন মত 'যাবনী মিশাল' বাঙলা লিখতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা করেননি। তবে সাধারণ ক্ষেত্রে সংস্কৃত-বহুল হলেও এসব বিবরণ সংস্কৃতের প্রস্তর-বন্ধনে বদ্ধ হয় নি। দীর্ঘ শ্বাসরোধী বাক্য রচনার দৃষ্টান্ত না নিয়ে যা তখনকার বাঙলা গদ্যের কৃতিত্বের নিদর্শন বা মৃত্যুঞ্জয়েরও নূতন কৃতিত্বের প্রমাণ তাই স্মরণ করা উচিত:

এইরূপে সুবে বাঙ্গালাদিতে কম্পানি বাহাদুরের অধিকার সুস্থির হইল। মহারাজ রাজবল্লভ বাহাদুর বাঙ্গালা ১২০৪ সন পর্যন্ত বরাবর কম্পানি বাহাদুরের খেদমত গুজারি করিয়া এই কলিকাতাতে মরিলেন। তাঁহার পুত্র মহারাজ মুকুন্দবল্লভ তাঁহার মৃত্যুর পূর্বেই মরিয়াছিলেন। এইরূপে মহারাজ দুর্লভরাম নিঃসন্তান হইলেন ঐ আপন মুনীব নবাব সিরাজদৌলার সঙ্গে নিমখারামী বৃক্ষের ফল পাইলেন……ঐ মহারাজ রাজবল্লভের ভাগিনেয়েরা প্রভৃতি পুরুষের ক্রমাগত যে কিছু ধন তাহা অধিকার করিয়া ঐ মহারাজ রাজবল্লভের পুত্রবধূ ঐ মহারাজ মুকুন্দবল্লভের স্ত্রীকে একবস্ত্রে কএক দাসী সমেত কৌশলক্রমে বাটী হইতে বাহির করিয়া দিয়া নীলবর্ণ শৃগালের ন্যায় আপনাকে মহারাজ করিয়া মানিয়া ঐ মহারাজ রাজবল্লভের ঐহিক সম্ভ্রম ও পারমার্থিক সকল কর্ম লোপ করত আছে। ঐ রাজা রাজবল্লভের পুত্রবধূ এক ব্রাহ্মণের বাটীতে দুঃখেতে কালক্ষেপণ করত আছেন।

এই ভাষা ও বিষয় দুই-ই রাজবল্লভ স্ট্রীটবাসী ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতের সাহস ও সদ্‌বুদ্ধির একটা প্রমাণ।

আর একটি নিদর্শন দিই—শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস যাতে 'বঙ্কিমী ভঙ্গীর' যথার্থ সন্ধান পেয়েছেন:

যে সিংহাসনে কোটি-কোটি লক্ষ স্বর্ণদাতারা বসিতেন সেই সিংহাসনে মুষ্টিমাত্র ভিক্ষার্থী অনায়াসে বসিল। যে সিংহাসনে বিবিধপ্রকার রত্নালঙ্কারধারিরা বসিতেন সে সিংহাসনে ভস্মবিভূষিত সর্বাঙ্গ কুযোগী বসিল। যে সিংহাসনে অমূল্য রত্নময় কিরীটধারি রাজারা বসিতেন সেই সিংহাসনে জটাধারী বসিল।……ইত্যাদি।

বক্তব্য কথা সামান্য। কিন্তু ভাবকল্পনার সঙ্গে ভাষা-সম্পদ তাল রক্ষা করে এগিয়ে চলেছে—সংস্কৃতপ্রধান বাঙলা গদ্যের স্বাভাবিক ছন্দকৌলীন্য এখানে প্রথম দেখা গিয়েছে মনে হয়। অবশ্য সেই ছন্দোরহস্য আবিষ্কারের ও প্রতিষ্ঠার গৌরব বিদ্যাসাগরের।

(১) 'প্রবোধচন্দ্রিকা' দিয়েই মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের পরিচয়। এ গ্রন্থ প্রকাশে অনেক বিলম্ব ঘটলেও অনেকেই অনুমান করেন খ্রীঃ ১৮১৩ অব্দের কাছাকাছি তা অন্ততঃ প্রথম রচিত হয়ে থাকবে। এই বই অনেকদিন পর্যন্ত হিন্দু কলেজ, হুগলী কলেজ, এবং পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের বাঙলার পাঠ্য-পুস্তক ছিল,—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তা (খ্রীঃ ১৮৬২) প্রকাশিতও করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত প্রবোধচন্দ্রিকা বাঙালীর নিকট সুপরিচিত,—এবং বহুদিন পর্যন্ত তাদের দ্বারা নিন্দিত। অথচ 'রাজাবলি'তে মৃত্যুঞ্জয়ের যে কলা-কৌশলের উদ্ভব দেখি, 'প্রবোধচন্দ্রিকা'য় দেখি তারই সুস্পষ্ট প্রকাশ। এ গ্রন্থও সংকলন। সংস্কৃত ব্যাকরণ, অলঙ্কার, নীতিশাস্ত্র, ইতিহাস, পুরাণ প্রভৃতি থেকে পণ্ডিতপ্রবর মৃত্যুঞ্জয় নানা উপাখ্যান ও রচনা-রীতি সংগ্রহ করেছেন। লৌকিক কাহিনীও সে সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন। সবশুদ্ধ এ সংগ্রহ তাই প্রায় মৌলিক রচনা হয়ে দাঁড়িয়েছে—বিষয়বিন্যাসে কতকাংশে, এবং ভাষার বিন্যাসে সর্বাংশে। অন্ততঃ তিনটি বিশিষ্ট গদ্যরীতি এ গ্রন্থে অনুসৃত হয়েছে—কথ্যরীতি, সাধুরীতি এবং সংস্কৃতানুসারী রীতি। সাধারণতঃ এই সংস্কৃত-প্রপীড়িত ভাষাকেই প্রাধান্য দিয়ে পরবর্তীরা 'প্রবোধচন্দ্রিকা'র নিন্দা করেছেন, কিন্তু তাঁরা বিস্মৃত হয়েছেন পণ্ডিতী লক্ষ্য এ ভাষার উদ্দিষ্ট ছিল :

"যেমন দুই এক পণ্ডিতাধিষ্ঠিত দেশ হইতে বহুতর পণ্ডিতাধিষ্ঠিত দেশ উত্তম ইত্যানুমানে সকল লৌকিক ভাষার মধ্যে উত্তম গৌড়ীয় ভাষাতে অভিনব যুবক সাহেবজাতের শিক্ষার্থে কোন পণ্ডিত প্রবোধচন্দ্রিকা নামে গ্রন্থ রচিতেছেন"—

এই (নাতিজটিল) সংস্কৃতানুসারী ভাষাই মৃত্যুঞ্জয়ের একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়। বরং সেই ধারাও তাঁর বৈশিষ্ট্য যাতে বিদ্যাসাগরের পরবর্তী রীতি মনে পড়ে—(ডঃ সুশীল কুমার দে—পৃঃ ২২৩) :

দণ্ডকারণ্যে প্রাচীনদীতীরে এক তপস্বী তপস্যা করেন বিবিধ কৃচ্ছ্র সাধ্য তপঃ করিলাও তপঃসিদ্ধিভাগী হন না। দৈবাৎ ঐ তপোধনের তপোবনেতে এক দিবস নারদমুনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঐ তপস্বী বহুমান পুরঃসর পাদ্যার্ঘ্যাসন দান ও স্বাগত প্রশ্ন করিয়া নারদমুনিকে নিবেদন করিলেন।……ইত্যাদি।

কিন্তু, কৃতিত্ব সাধুরীতিতে ; যেমন,

একস্থানে অনেক বক বসিয়াছিল অকস্মাৎ সেই স্থানে মানসসরোবরনিবাসী এক রাজহংস আসিয়া

উপস্থিত হইল। বকেরা ঐ হংসকে দেখিয়া অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়া লোহিত লোচন লম্বমান চরণ ধবল শরীর তুমি কে হে। হংস কহিল আমি রাজহংস। বকেরা কহিল ওহো তুমিই রাজহংস বটে ভাল একণে কোথা হইতে আসিলে। মানসসরোবর হইতে। ইত্যাদি—

এবং প্রধান কৃতিত্ব সেই কেরির 'কথোপকথনের' মত কথ্য-ভাষার রীতি আবিষ্কারে :

মোরা চাষ করিব ফসল পাব রাজার রাজস্ব দিয়া যা থাকে তাহাতেই বছরশুদ্ধ অন্ন করিয়া খাবো ছেলেপিলাগুলি পুষিব। যে বছর শুকা হাজাতে কিছু খন্দ না হয় সে বছর বড় দুঃখে দিন কাটি কেবল উড়ি ধানের মুড়ী ও মটর মসুর শাক-পাত শামুক গুগলি সিজাইয়া খাইয়া বাঁচি খড়কুটা কাটা শুকনা পাতা কলা ছুঁষও বিল খুঁটিয়া কুড়াইয়া জ্বালানি করি। কার্পাস তুলি তুলা করি ফুড়ী পিঁজি পাঁইজ করি চরকাতে সূতো কাটি কাপড় বুনাইয়া পরি।......শাকভাত পেট ভরিয়া যেদিন খাই সেদিন তো জন্মতিথি।......ইত্যাদি।

নিশ্চয়ই বিষয়ানুযায়ী ভাষার রীতি হালকা, গম্ভীর বা মধ্যমগতি হতে হয়, কিন্তু সর্বত্রই তার হওয়া প্রয়োজন স্বচ্ছন্দ, গতিবান্। আর, এই খাঁটি ভাষার নিদর্শন মৃত্যুঞ্জয় কিছু না কিছু জুগিয়েছেন,—তাঁর পূর্বে কেউ জোগাননি। বিশেষ করে, এসব কথ্যরীতির ক্ষেত্রেই আমরা পাচ্ছি খাঁটি বাঙলা ভাষাকে—যে ভাষার যোগ মাটির সঙ্গে ও মাটির মানুষের সঙ্গে। এ কথাটা মানতে পারি, "তাঁহার (মৃত্যুঞ্জয়ের) একার সাধনা প্রায় একযুগের সাধনা বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।"—অবশ্য যদি 'যুগ' অর্থে মনে করি এই 'কেরির পর্ব' অর্থাৎ খ্রীঃ ১৮০০-১৮১৫ এই পনের বৎসর কাল। যদি সে সঙ্গে ধরে নিই কেরির 'কথোপকথনে'ও মৃত্যুঞ্জয়েরই হাত ছিল, যদি মেনে নিই মৌলিক রচনা অপেক্ষা সংকলন বা অনুবাদ কম কথা নয়, এবং পাঠ্য-পুস্তক রচনা ও সাধারণের জন্য কোনো গ্রন্থ রচনা এ দু'য়ে মূল্যগত প্রভেদ নেই। ঠিক এসব মানতে বাধা হয় যখন মৃত্যুঞ্জয়ের স্বাধীন রচনা 'বেদান্ত চন্দ্রিকা'র আলোচনা করি।

'বেদান্ত চন্দ্রিকা'য় লেখকের নাম ছিল না, কিন্তু লেখকের পরিচয় সমকালীন কারও নিকট অজ্ঞাত ছিল না—পক্ষ-প্রতিপক্ষ সকলেই জানতেন। ইং ১৮১৭ অব্দে ('রামমোহনের পর্বে') তা প্রকাশিত হয়—দু' বৎসর পূর্বে রামমোহন রায় 'বেদান্ত গ্রন্থ' ও 'বেদান্তসার' প্রকাশিত করেন ও ব্রহ্মোপাসনার জন্য 'আত্মীয়সভা' গঠিত করেন। কলিকাতার হিন্দু সমাজে

তাতে প্রবল আলোড়ন ওঠে। অবশ্য শহরের শিক্ষিতবর্গের বাইরে কিংবা পল্লীগ্রামে তা কোন তরঙ্গ তুলেছিল কি না সন্দেহ। তা সত্ত্বেও প্রথম কথা —রামমোহন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্রপাঠ্য-গ্রন্থ লেখেননি, আবার তিনি যথার্থ সাহিত্য রচনাও করেননি। তাঁর লক্ষ্য হল সাধারণ পাঠক, তাঁর উদ্দেশ্য তাঁদের যুক্তি ও বোধশক্তির উদ্বোধন। নিশ্চয়ই এ কারণেও তাঁর ১৮১৫-এর প্রয়াস পর্বান্তরের সূচনা করে। দেওয়ান রামমোহনের মত উদ্যোগী, অর্থবান্ ও প্রবল ব্যক্তিত্ববান্ পুরুষ বেদান্তের চর্চাকে যেন পুনরুজ্জীবিত করতে চাইলেন, আর তাতেই পণ্ডিত সমাজেও প্রতিবাদের ঢেউ উঠল। সেদিনের অগ্রগণ্য পণ্ডিত হিসাবে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারই এই প্রতিবাদের মুখপাত্র হলেন। রামমোহনের উত্তর থেকেই আমরা জানি—মৃত্যুঞ্জয়ও ইতিপূর্বেই বেদান্ত-উপনিষদাদি চর্চা করতেন। তাঁর পাণ্ডিত্যও নিতান্ত গতানুগতিক ধরনের ছিল না। তাই ইং ১৮১৭ সনেই যখন সহমরণ বিষয়ে শাস্ত্রীয় নির্দেশ জানাবার জন্য সরকারী তরফ থেকে 'জজপণ্ডিত' মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারকে অনুরোধ করা হয় তখন তিনি এই অভিমত প্রকাশ করেন—

"চিতারোহণ অপরিহার্য নয়,—ইচ্ছাধীন বিষয়মাত্র। অনুগমন ও ধর্মজীবন যাপন, এই উভয়ের মধ্যে শেষটিই শ্রেয়তর। যে স্ত্রী অনুমৃতা না হয় বা অনুগমনের সংকল্প হইতে বিচ্যুত হয় তাহার কোন দোষ বর্তে না।"

এটি পাদ্রি মুরুব্বিদের বা সরকারের মনস্তুষ্টির ইচ্ছায় প্রণীত বিধান না হলে, উদারতার ও সাহসের পরিচায়ক। রামমোহনের সহমরণ-বিরোধী প্রথম পুস্তিকা প্রকাশিত হয় এর এক বৎসর পরে (১৮১৮)। কিন্তু বেদান্ত দর্শনের মত কঠিন বিষয়ের আলোচনার সূত্রপাত. বাঙলায় মৃত্যুঞ্জয় করেননি,—সম্ভবত করতেনও না। কারণ, হিন্দুশাস্ত্র সাধারণ্যে প্রচার করা পণ্ডিত হিসাবে তাঁর কাম্য হত না। দ্বিতীয়তঃ, তা ভাষায় প্রকাশ করতে তাঁর রীতিমত আপত্তি ছিল, তা স্পষ্টভাবেই বলেছেন। 'বেদান্ত চন্দ্রিকা'র বহু-লম্বিত উপসংহার এরূপ :

"………যেমন রূপালঙ্কারবতী সাধ্বী স্ত্রীর হৃদয়ার্থবোদ্ধা সুচতুর পুরুষেরা দিগম্বরী অসতী নারীর সন্দর্শনে পরাঙ্মুখ হন তেমনি সালঙ্কারা শাস্ত্রার্থবতী সাধুভাষার হৃদয়ার্থবোদ্ধা সৎপুরুষেরা নগ্না উদ্ধতা লৌকিক ভাষা শ্রবণ মাত্রেই পরাঙ্মুখ হন।"

এটা তর্কস্থলে কুযুক্তি মাত্র, না হলে 'বাঙলা গদ্যের প্রথম শিল্পীকে' বলতে

হত শ্রদ্ধাহীন, সাহেবদের বেতন-পারিতোষিকে লুব্ধ, সুকৌশলী পণ্ডিতমাত্র। 'বেদান্ত চন্দ্রিকা'য় মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার সত্যই বাঙলা ভাষায় শাস্ত্রীয় বিচারের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, একথা বলাও অত্যুক্তি।

'বেদান্ত চন্দ্রিকা' তিনভাগে বিভক্ত—কর্মকাণ্ড, উপাসনাকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। তার মূল বক্তব্য :—সাংসারিক মানুষ মোক্ষধর্মের জ্ঞানে অনধিকারী। কিন্তু শাস্ত্রীয় বিচার কাম্য হলেও তিনি দার্শনিক যুক্তি-তর্কের সাহায্য বিশেষ গ্রহণ করেননি। বরং তদপেক্ষা লৌকিক যুক্তি-তর্কে লেখকের রুচি কম নয়। রামমোহন রায়ের নাম একবারও না করে তিনি তাঁকে উল্লেখ করেছেন 'তত্ত্বজ্ঞানিমানি', 'বকধূর্ত', 'ধূর্ত অবধূত' প্রভৃতি কটূক্তি দ্বারা। সে তুলনায় রামমোহন বিতর্কেও আশ্চর্য রকমের সংযতভাষী। ভট্টাচার্যের সহিত বিচারে রামমোহন 'বেদান্ত চন্দ্রিকা'র ভাষা তুলেই উত্তর দিয়েছেন :

"ইহাতে [বেদান্ত চন্দ্রিকার 'শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত সংক্ষেপে বলা গেল,' এই কথায়] এই সন্দেহ আপনা আমাদিগের হইতেছে যে, যে ব্যক্তি বেদান্ত শাস্ত্রের মত পূর্ব হইতে না জানেন এবং ভট্টাচার্যের পাণ্ডিত্যে বিশ্বাস রাখেন তিনি বেদান্তের মত জানিবার নিমিত্ত ঐ গ্রন্থ পাঠ করিতে পারেন তখন সুতরাং দেখিবেন যে বেদান্ত চন্দ্রিকার প্রথম শ্লোক কলিকালীয় তাবৎ ব্রহ্মবাদির উপহাসের দ্বারা ['শিশ্নোদরপরায়ণাঃ' বলে] মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন"—ইত্যাদি।

দু জনেই পুরাতন ভাষ্যকারদের পদ্ধতিতে (schoolmen's method) বিচার-বিতর্ক করেছেন, কিন্তু রামমোহনই বাঙলা গদ্যে যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনা-রীতির পথপ্রদর্শক। দ্বিতীয়তঃ, নিছক বাঙলা গদ্যের লেখক হিসাবেও মৃত্যুঞ্জয়ের 'বেদান্ত চন্দ্রিকা'র ভাষা সংস্কৃতে ভারাক্রান্ত, যুক্তিস্থলেও প্রায়ই জটিল এবং পাঠকের দুষ্পাচ্য। সেদিক থেকে রামমোহনের ভাষা schoolmen-এর ভাষা হলেও কম দুর্বোধ্য, কখনো কখনো সহজগতি। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়ের বিরুদ্ধে রামমোহনকে 'বাঙলা গদ্যের যুগপুরুষ' বলে দাঁড় করাতে যাওয়াও নিরর্থক। সাধারণভাবে বলা যায় গদ্যের যে দুই ধারা,—একটি রসবহনের ধারা, অন্যটি চিন্তাবহনের ধারা—মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার তার প্রথমটিকে বাঙলায় উদ্ঘাটন করতে চেয়েছেন। রামমোহন সেদিকে ভুলেও পা বাড়াননি। কিন্তু চিন্তাশীল ও যুক্তিশীল গদ্যের ভাষার সন্ধান রামমোহনই প্রথম দিয়েছেন। আর পাঠ্যপুস্তক নয়, লাভের জন্যও নয়, সাধারণের উদ্দেশ্যে বাঙলা রচনার তিনিই 'পাইওনীয়ার' বা অগ্রণী।

তারিণীচরণ মিত্র (১৭৭২ ?—১৮৩ ?)

তারিণীচরণ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাঙলা বিভাগের পণ্ডিত নন, হিন্দুস্থানী বিভাগে জন গিলক্রাইস্টের অধীনে দ্বিতীয় মুন্‌সি। সেদিনের কলকাতার তিনি সম্ভ্রান্ত পুরুষ, ইংরেজি ফারসী হিন্দুস্থানীতে শিক্ষিত। তারিণীচরণের জন্ম ও মৃত্যু কালের ঠিক নেই, তবে খ্রীঃ ১৮০১ থেকে খ্রীঃ ১৮৩০-এ অবসর গ্রহণ কাল পর্যন্ত তিনি কলেজের হিন্দুস্থানী বিভাগে সসম্মানে কাজ করতেন. খ্রীঃ ১৮১৭-তে দি ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা হলে তিনি প্রথম তার 'নেটিব সেক্রেটারি ছিলেন ; ১৮৩০-এও সোসাইটির সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। এ ছাড়া তারিণীচরণের সামাজিক মর্যাদা ও রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই বোঝা যায় যে সতীদাহ নিবারণ আইনের বিরুদ্ধে ১৮০৩এ যে 'ধর্মসভা' স্থাপিত হয় তিনি সে সভার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, সেই আন্দোলনে অগ্রণী হন।

বাঙলা সাহিত্যে তাঁর পরিচয় গিলক্রাইস্টের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত ইংরেজি (১০) 'ওরিয়েণ্টাল ফেবুলিস্ট' (১৮০৩) নামীয় গ্রন্থের বাঙলা অনুবাদের জন্য, এবং রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেনের সঙ্গে স্কুল বুক সোসাইটির প্রকাশিত 'নীতিকথা' (১৮১৮) নামে পাঠশালার অনুবাদ-পুস্তিকা রচনার জন্য। কোনোটাই স্মরণীয় কৃতিত্ব নয়, তবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কমা, সেমিকোলন প্রভৃতি চিহ্নের ব্যবহার, আর তিনি হিন্দী-উর্দুরও একজন প্রথম দিকের লেখক।

রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়

রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় (১১) 'মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং'-এর লেখক। সে গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয় খ্রীঃ ১৮০৫ অব্দে। রাজীবলোচনও খ্রীঃ ১৮০১ অব্দে কেরির অধীনে ৪০৲ টাকা মাহিনায় কলেজের সহকারী পণ্ডিত নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি কৃষ্ণচন্দ্রের বংশোদ্ভূত বলে নিজের পরিচয় দিতেন। এ গ্রন্থ সম্ভবত রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্রের অনুকরণেই লেখা হয়। কিন্তু গল্পে কাহিনীতে মিলে যা তৈরী হয়েছে তার ঐতিহাসিক মূল্য সামান্য। তবে 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্রে'র মত ফারসী দৌরাত্ম্য তাতে নেই। ভাষা বরং

সংস্কৃতানুসারী। তবে সবসুদ্ধ বিবরণটি পড়ে যেতে বিশেষ বেগ পেতে হয় না; আর একথাই সেদিনের যে কোন গ্রন্থের পক্ষে যথেষ্ট প্রশংসার কথা।

চণ্ডীচরণ মুনশী

চণ্ডীচরণ মুন্শীর (১২) 'তোতা ইতিহাস'ও খ্রীঃ ১৮০৫ অব্দেই মুদ্রিত হয়। সে সময়ে তিনি কলেজের পণ্ডিত ছিলেন এবং ১৮০৮এ তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত সে কাজ তিনি করেন। 'তোতা ইতিহাস' ছাড়া তিনি 'ভগবদ্গীতার'ও বঙ্গানুবাদ করেন। 'তোতা ইতিহাস' হিন্দুস্থানী থেকে অনূদিত. ৩৫টি কাহিনী তাতে আছে। এ জাতীয় কাহিনী সংস্কৃতেও পাওয়া যায় কিন্তু ফারসী তোতা কাহিনীই সে যুগে বেশী প্রচলিত ছিল। তা-ই হিন্দুস্থানীতে ভাষান্তরিত হয়। যে কোন কারণেই হোক. চণ্ডীচরণের 'তোতা ইতিহাস ('ইতিহাস' অর্থ অবশ্য সেদিনে গল্প) বারে বারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। তার সমাদর যথেষ্ট হয়েছিল বলতে হবে; এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্রপাঠ্য বহু পুস্তকের এত সৌভাগ্য ঘটেনি, তাও লক্ষণীয়। আরব্য উপন্যাসের শাহেরজাদির গল্পের মত, তোতার এক-একরাত্রির গল্পে এক প্রোষিতভর্তৃকার 'খোজেস্তা' পরপুরুষ সঙ্গের (রাজপুত্রের) বাসনা প্রতি রাত্রেই পিছিয়ে যেতে থাকে; শেষ পর্যন্ত সে রমণীর স্বামী ফিরে এলে আর তোতার গল্প বলার প্রয়োজন রইল না। চণ্ডীচরণের অনুবাদে প্রথম দিকে একটু ফারসী শব্দ থাকলেও ক্রমেই তা ফারসীর প্রভাব কাটিয়ে ওঠে; এবং তাতে সংস্কৃতের প্রভাবই স্পষ্টতর হয়। কিন্তু যা মানতে হয় তা হচ্ছে—'তোতা ইতিহাস' সহজবোধ্য; এমনকি, পুরনো গল্প হলেও তাতে রস জমেছে. ভাষা তা আটকায়নি, বরং সাহায্য করেছে। অবশ্য এ গ্রন্থও মৌলিক রচনা নয়।

হরপ্রসাদ রায়

এ পর্বের শেষ গ্রন্থ (১৩) 'পুরুষ-পরীক্ষা'র অনুবাদ। কবি বিদ্যাপতির 'পুরুষ-পরীক্ষা' সংস্কৃতে লিখিত। তার থেকেই এই বাঙলা অনুবাদ. তা প্রথম প্রকাশিত হয় ইং ১৮১৫ অব্দে; কিন্তু তারপর বহুবার মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে। এ গ্রন্থ বেশ বড় গ্রন্থ। মোট ৪ পরিচ্ছেদে ৫২টি গল্প আছে—পুরুষের বিভিন্ন লক্ষণ-নির্দেশক গল্প ৪৪টি। এসব গল্পে সংস্কৃত প্রভাবই

স্বাভাবিক। সেই স্বাভাবিক মাত্রা ছাড়িয়ে না যাওয়াই হরপ্রসাদ রায়ের কৃতিত্বের প্রমাণ। হরপ্রসাদ রায় এমন কোনো স্মরণীয় কৃতী পুরুষ ছিলেন না। তাই আরও অনুমান করা চলে সকলে মিলে খ্রীঃ ১৮১৫ অব্দের দিকে বাঙলা গদ্যের একটা ভিত্তিভূমি আবিষ্কার করতে পেরেছেন ; তা আশ্রয় করে এবার অনেকেই চলতে পারেন।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের নাম তার পণ্ডিতদের কীর্তিতেই স্মরণীয় হয়ে আছে, অবশ্য পণ্ডিতদের নাম রয়েছে বাঙলা রচনার জন্য। না হলে, তাও ধুয়ে মুছে যেত। সে কীর্তির পরিমাপ করা এখন দুঃসাধ্য—যেখানে কিছুই স্থির ছিল না সেখানে যে একটা স্থির ভিত্তি আবিষ্কার করা গেল, এইটিই তো প্রধান লাভ। সম্ভবত, এসব গদ্যরচনার বিষয়বস্তু ('বত্রিশ সিংহাসন', 'রাজাবলি' প্রভৃতি) তখনো শিক্ষিত লোকের নিকট 'সেকেলে' হয়ে ওঠেনি,— ভাবী 'ছোটগল্পের' স্বাদ তাঁরা জানতেন না, পাশ্চাত্ত্য দেশেও যথার্থ ছোটগল্প তখন পর্যন্ত জন্মগ্রহণ করেনি। কাজেই এসব বই সে পর্বের বাঙালী সমাজে সমাদর লাভ করত না, একথা বলাও কঠিন। তবু তা ছাত্র-পাঠ্য বই, যদিও ইংরেজ ছাত্রদের জন্য লিখিত। নিশ্চয়ই দুর্মূল্যতার জন্যও এসব বই অন্যদের নিকট দুষ্প্রাপ্য ছিল। 'বত্রিশ সিংহাসন' যদি বা 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'কে প্রভাবান্বিত করে থাকে, 'প্রবোধ চন্দ্রিকা'র সঙ্গে 'পদ্মাবলী'র বা 'বোধোদয়ে'র কোন সম্পর্ক নেই। 'রাজাবলি'র ধারা ত্যাগ করে মার্শম্যানের ইতিহাসের ধারাই প্রবাহিত হতে থাকে বিদ্যাসাগরের মধ্য দিয়ে। কিন্তু সর্বাপেক্ষা বড় কথা এই যে, ১৮১৫ পর্যন্ত বাঙলায় সাধারণ-পাঠ্য মৌলিক রচনা প্রায় নেই। আর রামমোহন রায় 'বেদান্তসার' ও 'বেদান্তগ্রন্থ' প্রকাশিত ও বিনামূল্যে বিতরণ করে সেই নূতন পর্বের সূত্রপাত করলেন। রামমোহনের সে রচনা শিক্ষিত-সাধারণের বোধগম্য না হলে তা বাংলার শিক্ষিত-সমাজে আলোড়ন তুলত না। সেদিক থেকেই তিনি বাঙলা গদ্যের ইতিহাসেও এক প্রধান পুরুষ—লিপিকুশলতা অপেক্ষাও তাঁর কীর্তি মহত্তর—তিনি বৃহত্তর বাঙালী সমাজকে বাঙলা ভাষার পাঠক সমাজে পরিণত করলেন, বাঙলা গদ্যকে ধর্ম, দর্শন ও সমাজের নানা প্রশ্ন আলোচনার বাহন করে তুললেন। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই এসে গিয়েছিল স্কুল বুক সোসাইটি (১৮১৭), হিন্দু কলেজ (১৮১৭), কলিকাতা স্কুল সোসাইটি (১৮১৮), আর শেষে বাঙলা সংবাদপত্র

(১৮১৮)। বাঙলা গদ্যের ইতিহাসের সেই দ্বিতীয় স্তরে সে যুগের মিশনারিদের ও অন্যান্য পাঠ্যগ্রন্থ-প্রণেতাদের স্মরণীয় কীর্তি ম্লান না হলেও এক-মাত্র নক্ষত্রের মত আর বিরাজ করতে পারল না। বাঙালীর প্রয়োজনে বাঙালী সমাজের দাবীতে বাঙলা গদ্যের প্রাণস্ফূর্তি তখন থেকে (ইং ১৮১৮) নানাদিকে অনিবার্য হয়ে উঠল।

॥ ২ ॥ রামমোহনের পর্ব (১৮১৫-১৮৩০)

ভারতবর্ষের ইতিহাসে রামমোহন রায় (ইং ১৭৭৪-ইং ১৮৩৩) আধুনিকতার অগ্রদূত। কিন্তু সে পথে তিনি একক যাত্রী নন, এবং কোন দিকে প্রথম যাত্রীও নন, তবে সর্বত্রই তিনি প্রায় প্রধান পুরুষ।' এবং সবসুদ্ধ জড়িয়ে তিনি যে বিরাট কর্মশক্তির ও ব্যাপক যুগধর্মবোধের পরিচয় দেন তাতে তাঁকে শুধু যুগ-প্রধান না বলে ভারতবর্ষের যুগ-পুরুষ বললেও অন্যায় হবে না। ঘটনাচক্রে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের কাছাকাছি তাঁর নামে একটি সম্প্রদায় প্রায় গড়ে ওঠে, আধুনিক বাঙলার ইতিহাসে যাঁদের কীর্তি অসামান্য। সেই অসামান্য শক্তি ও প্রচেষ্টার দ্বারা রামমোহনের সেই অনুবর্তীরা রামমোহনকেও একই কালে ধর্ম-প্রবর্তক ও যুগ-প্রবর্তক বলে প্রতিষ্ঠিত করতে থাকেন, এবং 'বাঙলা গদ্যের জনক' বলেও অভিহিত করেন। বিংশ শতকের দ্বিতীয় পাদে এই বহু প্রচারিত ও সহজ প্রচলিত ধারণার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। 'রামমোহন মিথ্' ধসে যাওয়াই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু রামমোহনের অসামান্য কীর্তি তাতে গুঁড়িয়ে যাবে না। বাঙলা সাহিত্য ক্ষেত্রে তিনি গদ্যের জনক নন নিশ্চয়ই, কিন্তু বাঙলা গদ্যের কোনো কোনো দিকে তিনি পথিকৃৎ—পাঠ্য-পুস্তকের বাইরে বাঙলা গদ্যের পথ তিনি উন্মুক্ত করেন। আর সেই নবাবিষ্কৃত পথে তাঁর পা ক্ষণে ক্ষণে জড়িয়ে গেলেও তাঁর গতি রুদ্ধ হয়নি। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লেখক হিসাবে তাঁকে মান্য করতেন। ১৮৫৪-এর ১৩ই মার্চ-এর 'সংবাদ প্রভাকরে' ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখেছিলেন : "দেওয়ানজী* জলের ন্যায় সহজ ভাষা লিখিতেন, তাহাতে কোন বিচার ও বিবাদ ঘটিত বিষয় লেখায় মনের অভিপ্রায়

* 'রাজা' রামমোহন রায় শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগ পর্যন্ত 'দেওয়ানজী' নামেই পরিচিত ছিলেন; অবশ্য 'রাজা' উপাধি পান খ্রীঃ ১৮২৮-এ।

ও ভাবসকল অতি সহজে স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইত, এজন্য পাঠকেরা অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম করিতেন, কিন্তু সে লেখায় শব্দের বিশেষ পারিপাট্য ও তাদৃশ মিষ্টতা ছিল না।" রামমোহনের ভাষা কর্মী-পুরুষের ভাষা, ডায়েলেকটিশিয়ান্ বা বিচারদক্ষ তার্কিকের ভাষা। তা ভাবুকের ভাষা নয়, শিল্পরসিকের ভাষা নয়। প্রাঞ্জল হলেও তাঁর বাঙলা সরস নয়। রসবোধ রামমোহনের আদৌ ছিল কি না সন্দেহ। 'এজ্ অব প্রোজ্' বা গদ্যের যুগের পথিকদের পক্ষে সে অভাব তত দোষাবহ নয়। তবে সে গুণ না থাকলে সাহিত্যের বিচারে কাউকে যথার্থ স্রষ্টা বলা যায় না, পরিচালক বলা যায় মাত্র।

যে দেশে অতি সহজেই ধর্মগুরুরা অবতার বা পরমপুরুষে পরিণত হন, সেদেশে রামমোহনের নামে যদি নানা কেরামতির গল্প জমে উঠত তাহলেও বিস্ময়ের কারণ থাকত না। তার পরিবর্তে জমেছে শুধু কিছু অপ্রমাণিত বা অতিরঞ্জিত গল্প। তা সামান্য জিনিস। সমস্ত 'মিথ্' ছাড়িয়ে নিয়েও যে রামমোহন রায় দাঁড়িয়ে থাকেন (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তথ্যনিষ্ঠ বিচারেও যিনি অসাধারণ পুরুষ), তাঁকে না জানলে আধুনিক ভারতীয় জীবনের চেতনা-উন্মেষের প্রথম রূপটি অগোচর থেকে যায়।

'রামমোহনের পর্ব' বলতে অবশ্য শুধু রামমোহন নয়, তাঁর প্রতিপক্ষ হিন্দু রক্ষণশীলরা (মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন, পরে রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন প্রভৃতি) ও খ্রীষ্টান পাদ্রিরা (প্রধানতঃ শ্রীরামপুরের মিশনারিরা) গণ্য হবেন; তাঁর সপক্ষীয় ('আত্মীয় সভার' অন্যতম আচার্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, ১৭৯৪-১৮৪৬, এবং হিন্দু কলেজের প্রসন্নকুমার ঠাকুর, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, চন্দ্রশেখর দেব প্রমুখ) নব্যশিক্ষিত প্রধানগণও গণ্য হবেন। এবং ডেভিড্ হেয়ার (১৭৭৫-১৮৪২, ডিরোজিও'র (১৮০৯-১৮৩১) কথা না জানলে এ সময়কার বাঙালীকে জানাই যাবে না, সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু কলেজের 'ইয়ং-বেঙ্গল-এর' উৎসক্ষেত্র অ্যাকাডেমিক সোসাইটি বা অ্যাসোসিয়েশন ও 'পার্থেনন'-এর কথাও মনে রাখা প্রয়োজন। এসব স্বচ্ছ বুঝে রাখা প্রয়োজন—১) পর্বটা রামমোহনের সূচনা হলেও এ পর্ব বাঙলা গদ্যে (২) পাঠ্যপুস্তকাদি রচনারও এক প্রধান পর্ব;—স্কুল বুক সোসাইটি এ পর্ব থেকে সে দায়িত্বভার গ্রহণ করে। সেখানে পাদ্রি উইলিয়ম কেরি বাঙালী রাধাকান্ত দেব প্রভৃতি শিক্ষোৎসাহীদের পূর্বাপর সহযোগী

ছিলেন। শ্রীরামপুর মিশন স্বাধীনভাবেও সেদিকে উদ্যোগী ছিল। (৩) কিন্তু এ পর্বের লেখকদের প্রধান কর্মক্ষেত্র হল সাময়িক পত্র ও সংবাদপত্র। এমন কি, ইং ১৮১৮ থেকে ইং ১৮৫৭ পর্যন্ত কালে বাঙলা গদ্যের প্রধান বিকাশ-ক্ষেত্র হচ্ছে বাঙলা সংবাদপত্র। তার আবির্ভাবেই লেখক বা সাহিত্যিক নামক লেখ-জীবী শ্রেণীরও উদ্ভবক্ষেত্র ও জীবিকাক্ষেত্র মিলল। (৪) অবশ্য বাঙলা সাহিত্যের দিক থেকে আর একটি মৌলিক প্রয়াসের প্রারম্ভও এ সময়েই দেখা দেয়—তা ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কলিকাতা কমলালয়' প্রভৃতি বাঙলা গদ্য-রস-সাহিত্য রচনার প্রথম প্রয়াস।—এ সবই রামমোহনের পর্বের স্মরণীয় প্রধান কর্মক্ষেত্র। আরও দু একটি কথা লক্ষণীয়: (৫) প্রচার-মূলক রচনা অবশ্য মিশনারিরা পূর্ব থেকেই সূচনা করেছিল; এখনও তা চলে। কিন্তু এখন রামমোহনের কাল থেকে সেই প্রচার আর একতরফা রইল না। পক্ষ-প্রতিপক্ষে প্রচার, বিতর্ক চলতে লাগল। (৬) প্রাচীন ভারতের নূতন পরিচয় গ্রহণ এখন আরম্ভ হল—অনুবাদ সূত্রে। বাইবেল অনুবাদ দিয়েই অনুবাদের কাজ আরম্ভ করেছিলেন পাদ্রিরা; ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতেরাও পাঠ্যপুস্তক রচনায় অনুবাদই বেশি করেছেন। রামমোহন উপনিষদ্ অনুবাদ করে সংস্কৃত থেকে দর্শন ও ধর্মশাস্ত্র অনুবাদের ধারাকে অনুসরণ করেন; রাজা রাধাকান্ত দেব বিরাটভাবে সংস্কৃত চর্চায় উৎসাহ দান করলেন। বাঙলার জাগরণের যুগে পরাধীন ভারতবাসী যে ঐতিহ্য থেকে আপনার প্রেরণা আহরণ করতে গেল তা দীর্ঘদিন পরে পুনরাবিষ্কৃত এই প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্য। এ আবিষ্কারে মুসলিম ভারতের ঐতিহ্য অবজ্ঞাত এবং অনেকাংশে বিজাতীয় বলে্য গণ্য হয়, আর মুসলিম ভারতের সম্বন্ধে এই অবহেলার ফলে বাঙালীর ভাষায়, ভাবে, জীবনে যে জটিলতার সূচনা হতে থাকে বাঙলার জাগরণের যুগেও তা কারো দৃষ্টিতে পড়ল না। (৭) ক্রমেই ভাষার বানান ও অর্থগত স্থিরতা আসতে থাকে ব্যাকরণ-অভিধানের প্রকাশে।

(১) রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩)

বাঙলা সাহিত্যজিজ্ঞাসুর পক্ষে সব বাদ দিয়েও রামমোহন রায়ের সম্বন্ধে এইটুকু জানা প্রয়োজন—হুগলীর রাধানগরের সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান

রামমোহন রায় যথানিয়মে আরবী-ফারসী দোরস্ত করেছিলেন, এবং সম্ভবতঃ সেই মুসলমান সংস্কৃতির প্রভাবেই প্রচলিত হিন্দুধর্মে পৌত্তলিকতা ও বহু-দেববাদের বন্যা দেখে তাতে শ্রদ্ধা হারান। হিন্দুধর্মের উচ্চতর দিক সম্বন্ধে তাঁর চেতনা জাগ্রত হয় (সম্ভবতঃ কাশীতে) বেদান্তপাঠে, এবং নিশ্চয়ই তাঁর গুরু হরিহরানন্দ নাথ তীর্থস্বামী (নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার) নামক সুপণ্ডিত তান্ত্রিক যোগীর উপদেশে। হরিহরানন্দই তাঁকে তান্ত্রিক সাধনায় শ্রদ্ধাশীল করে তোলেন। আর, যে বিষয়ে সন্দেহ নেই তা এই—রামমোহন শুধু শাস্ত্র-জিজ্ঞাসায় ও শুধু ধর্ম-জিজ্ঞাসায় দিন কাটান নি, ধর্ম-জিজ্ঞাসার সঙ্গে অর্থ-জিজ্ঞাসা ও জ্ঞান-জিজ্ঞাসারও অসামান্য সামঞ্জস্য সাধন করেন। ব্যক্তিস্বাধীনতার মূলনীতি তিনি অনুসরণ করেন,—পারিবারিক মান ও নামের জন্য নিজের ব্যক্তিগত বৈষয়িক উদ্যোগ ও স্বার্থ খর্ব করেন নি। কলিকাতার সাহেবদের ঋণদান করে ও নানা উদ্যোগে (খ্রীঃ ১৭৯৪-১৮০১) রামমোহন বিত্তশালী পুরুষ হন। ইংরেজদের উপর নানা বিষয়ে নির্ভরশীল হয়েও ব্যক্তিত্ববান্ পুরুষের মত ইংরেজদের নিকট রামমোহন নিজ ব্যক্তি-মর্যাদা কিছুতেই ক্ষুণ্ণ হতে দেননি। ডিগ্‌বী সাহেবের দেওয়ান হয়ে খ্রীঃ ১৮০৫-১৮১৪ পর্যন্ত প্রায় দশ বৎসর কাল রংপুরে কাটিয়ে—খ্রীঃ ১৮১৪ অব্দে রামমোহন সরকারী কর্ম ত্যাগ করে কলকাতায় এলেন। দেওয়ান রামমোহন রায় তখন অগাধ ধনের অধিকারী; ফারসী-আরবী, সংস্কৃত-ইংরেজি প্রভৃতি বহু ভাষায় সুশিক্ষিত, শাস্ত্রজ্ঞানী, প্রচণ্ড যুক্তিবাদী, ব্রহ্মজ্ঞানের মাহাত্ম্যপ্রচারক, অ্যাডাম সাহেবের মত খ্রীষ্ট প্রচারককে 'ইউনিটেরিয়ান্' করে ছেড়েছেন। তাঁর কর্মজীবন দেখে মনে হয়, ইংরেজদের সাহচর্যে ও ইংরেজি বিদ্যার মাধ্যমে আহৃত পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার (বা 'বুর্জোয়া-সভ্যতার) দ্বারা তিনি তখন সম্পূর্ণ প্রবুদ্ধ। সেই নূতন যুগধর্মের প্রেরণায় ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের প্রচেষ্টায় তিনি আত্মনিয়োগে দৃঢ়সংকল্প; এবং ভারতীয় সমাজের জীবনের সর্ববিভাগে আপনার প্রবল ব্যক্তিত্ব, বিষয়বুদ্ধি ও অক্লান্ত উদ্যোগের বলে নেতৃত্ব গ্রহণে অভিলাষী। কলিকাতাবাসী (খ্রীঃ ১৮১৪-১৮৩১) রামমোহনের বহুমুখী জীবনই বাঙলা সাহিত্যের বিশেষ আলোচ্য; কিন্তু ইংলণ্ড-প্রবাসের শেষ দুই বৎসর কালও (খ্রীঃ ১৮৩১-১৮৩৩) তাঁর জীবনের চরম বিকাশের কাল, তা মনে রাখা উচিত। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনস্বীদের সজলাভে সেখানে

তাঁর প্রতিভা কোনো কোনো দিকে সম্পূর্ণ প্রকাশের সুযোগ পেয়েছিল—পরাধীন দেশে সে সুযোগ কোথায় ?

খ্রী: ১৮১৫ থেকে খ্রী: ১৮৩১ পর্যন্ত কালের মধ্যে কলিকাতায় এমন একটি বড় অনুষ্ঠান বা বড় আন্দোলন হয় নি রামমোহন যার সঙ্গে সম্পর্কিত নন। হয় তিনি উদ্যোক্তা, নয় তিনি প্রধান সমর্থক, না হয় প্রধান প্রতিপক্ষ,—একভাবে-না-একভাবে তিনি প্রত্যেকটি প্রধান আয়োজনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। অনেক ক্ষেত্রেই তিনি নেতা। কলিকাতায় তখন পদস্থ অভিজাত বিত্তবান্ ও কৃতী বাঙালী আরও ছিলেন ; কিন্তু রামমোহনের পুরুষকার ইংরেজ বাঙালী সকলের কর্তৃত্বাভিমানকে আচ্ছন্ন করে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে ; দিল্লীর বাদশাহ তাঁকে যে 'রাজা' উপাধি দিয়ে নিজের দূত রূপে মনোনীত করলেন, তাও এ সত্যের প্রমাণ। রামমোহনই তখন সর্বাগ্রগণ্য পুরুষ। বলে লাভ নেই,—নিরাকার ব্রহ্মের বিষয়ে চেতনা তাঁর পূর্বেও রামরাম বসু লাভ করেছিলেন। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার তাঁর পূর্বেই সতীদাহের বিরুদ্ধে শাস্ত্রীয় বিধান প্রকাশ করেছিলেন। কলিকাতায় ইংরেজি শিক্ষার প্রচেষ্টা পূর্বেই আরম্ভ হয়েছিল। তিনি ছাড়া অন্যেরাও অ্যাংলিসিস্ট' দলে ইংরেজি প্রবর্তনে উদ্যোগী হয়েছিলেন ; 'স্ত্রীশিক্ষা-বিষয়ক' ব্যাপারেও তিনি ছাড়াও উদ্যোগী পুরুষ অনেক ছিলেন। মুদ্রাযন্ত্র আইনের প্রতিবাদেও (খ্রী: ১৮২৩) তিনি ছাড়া বহু দেশীয় গণ্যমান্য লোক অগ্রণী হন। বেদান্ত-চর্চা তাঁর পূর্বেও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার করেছিলেন ; আর রামমোহনও প্রকৃতপক্ষে অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক নন, বরং দ্বৈতবাদী তান্ত্রিক বা ব্রহ্মোপাসক 'ডীইস্ট' মাত্র। 'হিউম্যানিস্ট' বলতে যথার্থ যা বোঝায়—পরমার্থ-নিরপেক্ষ মানবতাবাদ—তত্ত্বভক্ত, তত্ত্বজ্ঞানী, রামমোহনকে সেরূপ হিউম্যানিস্ট বলাও দুঃসাধ্য। এবং সর্বাপেক্ষা সত্য কথা এই যে, রামমোহন ধর্মপ্রবর্তক ছিলেন না, সাধকভক্তও ছিলেন না, পরবর্তী ব্রাহ্ম-সমাজের 'সুনীতি-দুর্নীতির' কঠোর নিয়ম তিনি পালন করতেন না, একথা সত্য। তা সত্ত্বেও, তিনি যে প্রতিভায় ও পুরুষকারে অতুলনীয়, তার প্রমাণ তাঁর বাঙলা গ্রন্থাবলী (এখন কৌতূহলী পাঠক সহজেই পাঠ করতে পারেন. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ তা প্রকাশ করেছেন)। তাতে সুস্পষ্ট তাঁর যুক্তিবাদ (Rationalism), ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধ (Individualism). দেশের ও বিদেশের সর্ব জাতির

রাজনৈতিক স্বাধীনতার (National Freedom) আকাঙ্ক্ষা, এবং মানবাধিকার-বাদের (Rights of Man) অপেক্ষাও যা এক হিসাবে নূতনতর, রামমোহনের আন্তর্জাতিক মৈত্রীতে (International Amity) বিশ্বাস। 'যুগধর্মের' পুরোধা হয়েও তিনি দেশ-ধর্মের ক্ষেত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চাননি—এমন কি, তাঁর কালের হিন্দু দেওয়ান-মুৎসুদ্দির সমস্ত বৈষয়িক চাতুর্য ও সম্ভ্রান্ত-বিলাসে তাঁর কিছুমাত্র সংকোচ ছিল না। এবং সমস্ত বাস্তবদৃষ্টি সত্ত্বেও তিনি শিল্প-বাণিজ্যে ধন নিয়োগ না করে জমিদারী প্রতিষ্ঠাতেই নিজের বৈষয়িক প্রতিষ্ঠা খুঁজেছেন।

রামমোহনের বাঙলা রচনা: বাঙলা রচনায় রামমোহনের প্রধান কাজ (১) 'বেদান্তগ্রন্থ ; (২) 'বেদান্তসার'—খ্রীঃ ১৮১৫ ; (৩) 'ভট্টাচার্যের সহিত বিচার'—('বেদান্ত চন্দ্রিকা র উত্তর)—খ্রীঃ ১৮১৭ ; (৪) 'গোস্বামীর সহিত বিচার'—খ্রীঃ ১৮১৮ ; (৫) 'প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ'—(সহমরণ বিরোধী পুস্তিকা)—খ্রীঃ ১৮১৮ ; (৬) 'পথ্যপ্রদান (কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের 'পাষণ্ড-পীড়নের' উত্তর)—খ্রীঃ ১৮২৩। তা ছাড়া (৭) 'ব্রাহ্মণ সেবধি'—খ্রীঃ ১৮২১ ও (৮) 'সম্বাদ কৌমুদী' খ্রীঃ ১৮২১ - প্রকাশ করে তিনি শ্রীরামপুরের পাদ্রিদের সঙ্গে হিন্দুধর্ম বনাম খ্রীষ্টধর্মের বিতর্ক চালান। অবশ্য এ বিতর্ক প্রধানতঃ ইংরেজি ভাষার মাধ্যমেই চলে। বাঙলা ভাষায় রামমোহনের (৯) কেনোপনিষদ্ ও ঈশোপনিষদের অনুবাদ খ্রীঃ ১৮১৬ অব্দের দিকে প্রকাশিত হয় ; পরে বা জসনেয় সংহিতা ও আরও কয়েকটি উপনিষদের তিনি অনুবাদ করেন। তা ছাড়া (১০) কয়েকটি ব্রহ্মসঙ্গীতও তিনি রচনা করেন। (১১) তাঁর 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' ইংরেজিতে লেখা ব্যাকরণ অবলম্বনে বিলাত যাত্রার পূর্বে তাড়াতাড়ি রচিত। স্কুল বুক সোসাইটি কর্তৃক তা খ্রীঃ ১৮৩৩এ (তাঁর মৃত্যুর পরে) প্রকাশিত হয়। বাঙালী-রচিত এই প্রথম বাঙলা ব্যাকরণ রামমোহনের যুক্তিনিষ্ঠ মনের ও ভাষাবোধের পরিচায়ক। রামমোহনের ইংরেজি পুস্তক-পুস্তিকা, সরকারী ও বেসরকারী স্মারকপত্র ও পত্রাদি এবং হিন্দী রচনা এ প্রসঙ্গে আলোচ্য নয়, কিন্তু সে সব রামমোহনের পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার পরিচায়ক। 'আত্মীয় সভা' (খ্রীঃ ১৮১৫) প্রতিষ্ঠা, 'উপাসনা সভা' (খ্রীঃ ১৮২৮), 'ব্রহ্মমন্দির' স্থাপন—সে কালের যুগান্তকারী কাজ ; 'হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠায় তাঁর উদ্যোগ, নিজের 'অ্যাংলো-হিন্দু অ্যাকাডেমি' পরিচালনা ; ডাফ্ স্কুল প্রতিষ্ঠায়

সহকারিতা ; ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনে তৎপরতা,—এসব উদ্যোগের মতোই তাঁর হিন্দী ও ইংরেজি লেখা নিয়েই রামমোহন রামমোহন,—শুধু বাংলা লেখার বিচার করলে ভারতীয় জীবন-গঠনে রামমোহনের যে দান তার যথার্থ পরিমাপ হয় না।

'বেদান্তসার , 'বেদান্তগ্রন্থ' বাঙালী শিক্ষিত সাধারণের জন্ত লিখিত বাঙলা গদ্য-পুস্তক। সেদিনে এরূপ দার্শনিক বিচারে তাঁদের রুচি ছিল। তাই আজকালকার তুলনায় খুব বেশি পরিচ্ছন্ন রচনা না হলেও তখন তা চলত। তবে রামমোহন শব্দ-পারিপাট্য অপেক্ষা সরলার্থের দিকেই বেশি দৃষ্টি দিয়েছেন। রামমোহনের লেখার এক-আধটি উদ্ধৃতি দিলে চলে না ; বহু বিষয়ে বহু ধরনের তাঁর লেখা। তাঁর ভাষায় তবু ত্রুটি ঘটেছে—প্রথমতঃ, 'হইবাক' প্রভৃতি পদ তখনো পরিত্যক্ত হয়নি। দ্বিতীয়তঃ, দাঁড়ি, কমা, সেমিকোলনের অভাবে লেখা পাঠে বাধা হয়। তৃতীয়তঃ, তাঁর সুদীর্ঘ জটিল বাক্যের অন্বয় পরিষ্কার নয়। চতুর্থতঃ, যে পণ্ডিতী বিচার পদ্ধতিতে তিনি পাকা সে পদ্ধতি সংস্কৃতের ঐতিহ্যে গঠিত ; বাঙলা ভাষার স্বভাবানুযায়ী রামমোহন তা নিয়ন্ত্রিত করতে পারেননি।

রামমোহনের ভাষার প্রধান গুণ—প্রথমতঃ, বক্তব্যকে সরল করে বলবার জন্তই রামমোহন লেখেন শব্দ বা বাক্যের খেলা দেখাবার ইচ্ছায় নয়। তাই, তাঁর ভাষা প্রায়ই সরল, এমন কি, সময়ে সময়ে প্রাঞ্জল। দ্বিতীয়তঃ, তার্কিক রামমোহন বিপক্ষের বিরুদ্ধে কটূক্তি প্রয়োগ করেননি, এবং অপরের কটূক্তিকে স্থিরভাবে যুক্তির দ্বারা নিরসন করেছেন। এই আশ্চর্য সংযম তাঁর তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও রুচিবোধের প্রমাণ। তাতে মাঝে-মাঝে স্মিত হাস্যরেখাও দেখা যায় ; যেমন 'পাদরী ও শিষ্যসংবাদ', কিংবা 'পথ্য-প্রদান' প্রভৃতি রচনা। রামমোহনের প্রতিপক্ষরা যুক্তি অপেক্ষা শাস্ত্রেরই দোহাই দিতেন। যুক্তিবাদী হলেও এরূপ প্রতিপক্ষের সহিত বিচারে রামমোহন শাস্ত্রীয় যুক্তিকে নিজের অস্ত্ররূপে গ্রহণ করে এঁদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করতে দ্বিধা করেননি। তাঁর এই কৌশল বিদ্যাসাগরও পরবর্তী কালে গ্রহণ করেছেন—এ কৌশলে ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ সুরক্ষিত হয়েছে, নৈয়ায়িক তর্কের শূন্যলোকে এ যুক্তিবাদ মিলিয়ে যায়নি।

রামমোহনের প্রতিপক্ষ :—রামমোহনের প্রতিপক্ষ হিসাবে প্রথমেই

দাঁড়ান 'বেদান্ত চন্দ্রিকা'র (খ্রীঃ ১৮১৭) লেখক মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ; তাঁর কথা পূর্ব প্রসঙ্গে উল্লেখিত হয়েছে। বিদ্যালঙ্কার ছাড়া বাঙলা সাহিত্যে রামমোহনের প্রতিপক্ষ আর দু জনাই মাত্র উল্লেখযোগ্য,—'পাষণ্ড-পীড়নের' লেখক কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন (মৃত্যু ১৮৫১); এবং 'সম্বাদ-কৌমুদী' (খ্রীঃ ১৮২১) ও 'সম্বাদ-চন্দ্রিকা'র (খ্রীঃ ১৮২২) সম্পাদক, 'কলিকাতা কমলালয়', 'নববাবু-বিলাস' প্রভৃতির প্রণেতা ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (খ্রীঃ ১৭৮৭-খ্রীঃ ১৮৪৮)। আসলে গণ্য শুধু একজন - ভবানীচরণ, আর তিনি গণ্য মৌলিক লেখকরূপে। কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন দর্শনের গ্রন্থাদিও (আত্মকৌমুদী, পদার্থ-কৌমুদী) লিখেছিলেন, কিন্তু রামমোহনকে আক্রমণ না করলে তিনি বিস্মৃতির অতলেই তলিয়ে যেতেন।

সহমরণের বিরোধিতা করে রামমোহনের প্রথম বাঙলা পুস্তিকা 'প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ' খ্রীঃ ১৮১৮ সনে প্রকাশিত হয়। এঁড়েদ'-বাসী (?) কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন তখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সহকারী পণ্ডিত ; তিনি স্মৃতিশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। তিনি পর বৎসর (খ্রীঃ ১৮১৯) রামমোহনের উত্তরে পুস্তিকা প্রকাশ করলেন 'বিধায়ক নিষেধকের সম্বাদ'। এর পরে 'ধর্ম-সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী' নামে তিনি 'সমাচার দর্পণে' (৬ এপ্রিল, ১৮২২) রামমোহনকে লক্ষ্য করে পত্রাকারে চারিটি প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করেন। রামমোহন তার উত্তরে প্রকাশ করেন 'চারি প্রশ্নের উত্তর' (১১ই মে, ১৮২২)। প্রত্যুত্তরে 'ধর্ম-সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী' মূল প্রশ্ন ও 'ভক্ততত্ত্বজ্ঞানী'র (রামমোহনের) উত্তরের সারভাগসুদ্ধ প্রকাশ করলেন 'পাষণ্ড-পীড়ন' (১লা ফেব্রুয়ারী, ১৮২৩)। এর উত্তরে রামমোহন রায় লেখেন 'পথ্য প্রদান' (১৮২৩)—ঐ বিতর্কের তা'ই শেষ গ্রন্থ। কাশীনাথ তার পরেও বহু বৎসর জীবিত ছিলেন—খ্রীঃ ১৮২৫ সনে তিনি সংস্কৃত কলেজের স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন ; পরে খ্রীঃ ১৮২৭ সনে ২৪ পরগনার 'জজ-পণ্ডিতের পদ লাভ করেন। খ্রীঃ ১৮৫১ সনে তাঁর মৃত্যু হয়। আমাদের নিকট 'পাষণ্ড-পীড়ন' (১৮২৩) দিয়েই তাঁর পরিচয়। যদি আমরা এসব লেখাকে বাঙলা গদ্যের ক্রম-সামর্থ্যের দিক থেকে বিচার না করি, তা হলে শাস্ত্র ও স্মৃতির নানা বিরোধী বাক্য নিয়ে এই সব পণ্ডিতী বিচার ও শাস্ত্রের কচকচি আজ মূল্যহীন। গদ্যের বিচারে দেখি বিশ বৎসরের মধ্যে বাঙলা গদ্যের মান এতটা এগিয়ে এসেছে যে, ফোর্ট

উইলিয়ম কলেজের অধিকাংশ পাঠ্য পুস্তকের থেকে কলেজের এই সহকারী পণ্ডিতের লিখিত বাঙলা সুবোধ্য। শাস্ত্র বিচারের ভাষায় সংস্কৃতবাহুল্য থাকবেই এখানেও তা আছে। কিন্তু ব্যাকরণে, অন্বয়ে এবং বর্ণবিন্যাসে 'পাষণ্ড-পীড়নে'র বাঙলা অনেকটা সুস্থির হয়ে এসেছে। বিপক্ষের প্রতি কটূক্তি প্রয়োগে তর্কপঞ্চানন কুণ্ঠাহীন—'প্রতারক……নগরান্তবাসি, মাংসাশি ইত্যাদি অজস্র বিশেষণ প্রতিপক্ষের প্রতি তিনি বর্ষণ করেছেন। কিন্তু বাঙলা গদ্যের রীতি তাঁর মোটের উপর আয়ত্ত, আর গালিগালাজ সত্ত্বেও ব্যঙ্গবিদ্রূপে তিনি অক্ষম নন। যেমন, 'ভক্তত্বজ্ঞানী' (রামমোহন) বৈষ্ণবদের তিলক-সেবন শুধু সময়ের অপব্যয় বলে পরিহাস করায় 'ধর্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী' উত্তর দিচ্ছেন :

বৈষ্ণবদের তিলক সেবনে শৈবাদির ত্রিপুণ্ড্র ধারণে কিঞ্চিৎকাল বিলম্বে কি দুরদৃষ্ট এবং ভক্ত-তত্ত্বজ্ঞানীদিগের নূতন ব্রাহ্মবস্ত্র ও চর্মপাদুকা, যাহা যবনদিগের ব্যবহার্য ও যে বস্ত্রসকল যবনেরা ইজের ও কাবা প্রভৃতি কহিয়া থাকে ও যে চর্মপাদুকার যাবনিক নাম মোজা, সেই বস্ত্র পরিধানে ও সেই চর্ম পাদুকা বন্ধনে দণ্ডদ্বয় ও দণ্ডচতুষ্টয় কাল বিলম্বেই কি শুভাদৃষ্ট জন্মে, তাহার শ্রবণের প্রত্যাশায় রহিলাম। অধিকন্তু অদ্য পরমাহ্লাদিত হইলাম, অনেক কালের পরে অনেক অন্বেষণে এক্ষণে ভক্তত্বজ্ঞানি মহাশয়দিগের নিগূঢ় শাস্ত্র দর্শন করিলাম। যে নিগূঢ় শাস্ত্রে নির্ভর করিয়া তাঁহারা শৈব বিবাহ, যবনাগমন ও সুরাপানাদি অনেক সৎকর্মের অনুষ্ঠান ও ছাগীমুণ্ড, বরাহমুণ্ড, হংসাণ্ড ও কুক্কুটাণ্ড ভোজন করিয়া থাকেন…ভাল, জিজ্ঞাসা করি, যদি এই সকল গর্হিত কর্ম করিলেই লোক ব্রহ্মজ্ঞানী হয়, তবে হাড়ি ডোম চাঁড়াল ও মুচি ইহারা কি অপরাধ করিয়াছে, ইহাদিগকেও কেন ব্রহ্মজ্ঞানী না কহা যায়, তাহারা ভক্তত্বজ্ঞানি মহাশয় সকল হইতেও এই সকল কর্মে বরং অধিকই হইবেক, ন্যূন কোন মতেই হইবেক না, অধিকন্তু তাহারা রাজপথের মধ্যে কত প্রকার হাস্যকৌতুক নৃত্যগীত অঙ্গভঙ্গ রঙ্গরস করে। কেহ বা পীত্বা, পীত্বা পুনঃ পীত্বা পপাত ধরণীতলে, এই তন্ত্রোক্ত শ্লোকের অযথার্থ যথাশ্রুত অর্থ দর্শন করায়, অর্থাৎ পান করিয়া, পান করিয়া পুনর্বার পান করিয়া রাজপথের প্রান্তে বস্ত্ররহিত, ধূল্যবলুণ্ঠিত, আলুলায়িত কেশ, মৃতবেশ হইয়া পথস্থ সকলকে উপস্থ দর্শন করাইয়া ধ্যানস্থ হয় কেহ বা এই প্রকার পরম ব্রহ্মে লীন হয় যে, কুক্কুরাদিতে যথাত্রবাংস ভোজন করিলেও ধ্যান ভঙ্গ হওয়া দূরে থাকুক, ভ্রূভঙ্গ করে না, অতএব তাহাদিগকে পরম ব্রহ্মজ্ঞানী কহিলেও কহা যায়। (দ্বিতীয়োল্লাস)

একে যুক্তি বলবার কোন কারণ নেই; কিন্তু সেদিনের তুলনায় ভালো বাঙলা বলতেই হবে। ঈশ্বর গুপ্তের কথাতেই 'পাষণ্ড-পীড়নে'র সম্বন্ধে বলা চলে—"রামমোহনের ভাষা ত্রুটিহীন নয় কিন্তু 'পাষণ্ড-পীড়নে'র ভাষা সর্বাংশেই

উত্তম অর্থাৎ শব্দের লালিত্য ও মাধুর্য প্রাচুর্য সর্বদিকেই উত্তম হইয়াছিল, তদ্দৃষ্টে অনেকেই সরস রচনায় শিক্ষিত হইয়াছেন।" (সং প্রঃ ১৩ মার্চ, ১৮৫৬) ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য সেরূপ রচনার পথপ্রদর্শক। 'পাষণ্ড-পীড়নে'র সম্বন্ধে আর একটি কথা জানা প্রয়োজন—শাস্ত্রানুযায়ী 'পাষণ্ড' অর্থে যারা বৈদিক কর্ম ত্যাগ করে অন্য কর্ম করে, তর্কপঞ্চানন তাদের বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ status-এর নিগড় ভেঙে যাঁরা contract-এর স্তরে যান সেই আধুনিক কালের উদ্যোগী মানুষ মাত্রই 'পাষণ্ড'। কিন্তু রামমোহনাদির বিরুদ্ধে হিন্দুদের একটা প্রচার লক্ষণীয় :—"দেশ বিদেশের জাতি বিশেষের ক্ষণিক মনোরক্ষার্থ অনর্থ অম্লানবদনে সজাতীয় ধর্মনিন্দা"। অর্থাৎ, রামমোহন সমসাময়িক হিন্দু-সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছিলেন। এ অবশ্য অপপ্রচার, কারণ কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নয়। রামমোহন হিন্দু সমাজ ত্যাগ করে মুসলমানও হতে যাননি, খ্রীষ্টানও হতে চাননি ; হিন্দু বলে, ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় রক্ষা করতেন। ঐহিক আদর্শ (secular) ও সংশয়বাদী (agnostic) জিজ্ঞাসা নিয়ে বরং তাঁরই জীবনের শেষদিকে (খ্রীঃ ১৮২৫ —খ্রীঃ ১৮৩৩) বাঙলা দেশে উত্থিত হচ্ছিল ডিরোজিওর শিষ্যদল নব্যবাঙালী —'ইয়ং বেঙ্গল'।

রামমোহনের প্রধান প্রতিপক্ষ অবশ্য ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মৌলিক রচনাকার হিসাবে তাঁর কথা স্বতন্ত্র আলোচনা করা প্রয়োজন।

(২) স্কুল বুক সোসাইটি ও পাঠ্যপুস্তক

স্কুল কলেজে পাঠ্যপুস্তকরূপে সাহিত্য-গ্রন্থও পঠিত হয়, কিন্তু পাঠ্যপুস্তক সাধারণতঃ সাহিত্যের মানদণ্ডে সাহিত্য বলে গ্রাহ্য হয় না। তবে বিষয়-মাহাত্ম্যে ও লিপিকুশলতায় কোনো কোনো পাঠ্য-পুস্তক সে গৌরব নিশ্চয়ই অর্জন করতে পারে। বাঙলা ভাষায় গদ্য-সাহিত্য যতক্ষণ উদ্ভূত হয়নি ততক্ষণ পর্যন্ত যে কোনো গদ্য রচনা গদ্য-সাহিত্যের সেই জন্মক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে তাকেই আমরা গ্রহণ করেছি। বলাই বাহুল্য, এসব প্রচার-পুস্তিকা, পাঠ্যপুস্তক, অনেক সময়ে মোটেই সাহিত্য-পদবাচ্য নয়—শুধু গদ্যের নমুনা। কিন্তু এই দ্বিতীয় পর্বে এসে আমরা প্রথম স্বতন্ত্র গদ্য-সাহিত্য রচনারও প্রয়াস দেখতে পাই। গদ্যের রূপ এখনও সুস্থির হয়নি বলেই এখনও প্রচার-পুস্তিকা,

পাঠ্যপুস্তক প্রভৃতিকে একেবারে আলোচনা থেকে বাদ দেওয়া যায় না—সাময়িক পত্রকে তো বিংশ শতকেও সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু গদ্য রচনার ইতিহাসেও এখন (ইং ১৮১৫-এর পর) থেকে পাঠ্যপুস্তক বা প্রচার-মূলক পুস্তক-পুস্তিকাকে আর নির্বিচারে আলোচ্য বিষয় করার প্রয়োজন কমে এসেছে। এই কারণেই কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির প্রকাশিত সকল পুস্তকের বিশদ আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু সেদিনে শিক্ষার ও সংস্কৃতির ইতিহাসে সোসাইটির এই দান অতি প্রয়োজনীয় ছিল। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্য বই সাধারণ দেশীয় ছাত্রদের জন্ত লেখা নয়, তার মূল্যও ছিল অত্যধিক। দেশীয় ছাত্রদের অভাব মেটাবার উদ্দেশ্যেই খ্রীঃ ১৮১৭ অব্দে 'কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি' স্থাপিত হয়। ৪ জন বাঙালী হিন্দু, ৪ জন মুসলমান মৌলবী ও বাকী ১৬ জন ইউরোপীয় নিয়ে পরিচালক সমিতি গঠিত হয়। সকলের শীর্ষভাগে ছিলেন উইলিয়ম কেরি, আর বাঙালীদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন তারিণীচরণ মিত্র, রাজা রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন প্রভৃতি। সাহেবদের মধ্যে ডেভিড্ হেয়ারও অন্ততম সদস্ত ছিলেন। সংস্কৃত, ইংরেজি ও অন্যান্ত ভারতীয় ভাষায় (বাঙলা, হিন্দুস্থানী) সাহিত্য, গণিত, ভূগোল, ইতিহাস প্রভৃতি পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও বিনামূল্যে তা বিতরণ ছিল সমিতির কাজ। বাঙলা দেশের নবোন্মেষিত জিজ্ঞাসা যে তাঁরা পরিতৃপ্ত করেন ও পরিপুষ্ট করেন, এইটাই প্রধান কথা—সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁদের কোনো সাক্ষাৎ দান থাক বা না থাক। এজন্ত প্রথম উল্লেখযোগ্য—'নীতিকথা' (খ্রীঃ ১৮১৮)। সামান্ত জিনিস হলেও তিনজন মহারথী এর লেখক—তারিণীচরণ মিত্র, রাজা রাধাকান্ত দেব ও রামকমল সেন। রাজা রাধাকান্ত দেবের (খ্রীঃ ১৭৮৪-খ্রীঃ ১৮৬৭) কীর্তিও (দ্রঃ যোগেশচন্দ্র বাগল—উঃ শঃ বাঙলা) এ প্রসঙ্গেই উল্লেখ করা যেতে পারে।

বিদ্যোৎসাহী রাধাকান্ত দেব (১৭৮৪-১৮৬৭) ক্লাইভের মুন্সি নবকৃষ্ণের পৌত্র, কলিকাতার রাজবাটীর প্রধান কর্তা. এবং সংস্কৃত, ইংরেজি, বাঙলা, ফারসী প্রভৃতি বহু ভাষায় সুপণ্ডিত। এসব কারণে তিনি কলিকাতার ইংরেজ, বাঙালী সকলের নিকট—বাঙালী সমাজের অবিসংবাদিত নায়ক রূপে পরিগণিত হন। স্বভাবতই সমাজপালক হিসাবে তিনি চেয়েছেন ইংরেজি শিক্ষার জোয়ারের জলকে বাঁধ বেঁধে দেশের চিরন্তন খাতে প্রবাহিত করাতে।

তাই, হিন্দু কলেজ থেকে স্কুল বুক সোসাইটি পর্যন্ত শিক্ষাপ্রসারের এমন কোন আয়োজন নেই যাতে রাধাকান্ত দেব ছিলেন না, যাতে আন্তরিকভাবে তিনি সহায়তা দান করেননি। তথাপি রাজা রাধাকান্ত দেবকেই হতে হয় সতী-দাহ নিবারণ আইনের বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ হয় তার একজন নেতা, 'ধর্মসভার' প্রতিষ্ঠাতা, ইংরেজি শিক্ষার বিরুদ্ধে প্রাচ্যশিক্ষার ('ওরিয়েণ্টালিস্ট') যে দাবী তার অন্যতম প্রবক্তা। 'ইয়ং বেঙ্গলে'র বিদ্রোহে তটস্থ যে-সব (নব্যতন্ত্রের পক্ষীয় প্রসন্নকুমার ঠাকুরও ছিলেন) সমাজ-কর্তা ডিরোজিওর হিন্দু কলেজ থেকে বিতাড়নের জন্য দায়ী, রাজা রাধাকান্ত দেবও তাঁদের একজন। হিন্দু কলেজকে চতুর্থ দশকে খ্রীষ্টধর্মের গ্রাস থেকে রক্ষার জন্যও তিনি ছিলেন বদ্ধপরিকর। অর্থাৎ সামাজিক কারণে ও আপন অভিজাত রুচিতে রাধাকান্ত দেব ছিলেন রক্ষণশীল, কিন্তু তাঁকে সম্পূর্ণ প্রতিক্রিয়াশীল বলা অসম্ভব। মনস্বী রাধাকান্ত দেব নূতন কালের জ্ঞানালোককে অস্বীকার করবেন কি করে? শিক্ষাক্ষেত্রে—এমন কি স্ত্রীশিক্ষায়ও—তাঁর যত্ন, দান. উৎসাহ কারও থেকে কম নয়। আর একদিকে তিনি সমস্ত সমসাময়িকদের থেকে শ্রেষ্ঠ—'শব্দকল্পদ্রুম' বা সংস্কৃত ভাষায় এনসাইক্লোপীডিয়া (১৮১৯-১৮৫৮) সংকলন করে প্রাচীন ধারার সমস্ত ভারতীয় বিদ্বজ্জনদের তিনি নূতন জ্ঞানের ক্ষেত্রে সম্মেলিত করবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সংস্কৃতের গৌরব সেদিন তখন অস্তমিত, সংস্কৃত ভাষা আর নূতন জ্ঞানের বাহন হতে পেল না। রাজা রাধাকান্ত দেব নিজে সামান্যই বাঙলায় লিখেছেন; তাই বাঙলা সাহিত্য তাঁর আশ্রয় পেয়েছে, কিন্তু তাঁর মনীষার দান বিশেষ লাভ করে নি।

রামকমল সেন (১৭৮৩-১৮৪৪) রাজা রাধাকান্ত দেবের সহযোগী ও মতাবলম্বী। শুধু বাঙলা 'হিতোপদেশ' ও দু'-একটি বাঙলা নিবন্ধ (যেমন. 'বঙ্গদেশের পুরাবৃত্ত', খ্রীঃ ১৮৩০) দিয়ে মনীষী রামকমল সেনেরও কর্মের পরিমাপ হয় না। তাঁর ৫৮ হাজার শব্দের ইংরেজী-বাঙলা অভিধান (খ্রীঃ ১৮৩৪) সেদিনের এক প্রধান কীর্তি। স্কুল বুক সোসাইটি থেকে পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ করে তাঁরা বাঙলা ভাষাকে সেবা করেছেন নিঃসন্দেহে। কিন্তু বাঙলা ভাষায় আত্মপ্রকাশ না করে এঁরা নিজেরাও একদিকে বঞ্চিত হয়েছেন। এঁরা অনেক দিকেই ছিলেন রামমোহনের প্রতিপক্ষ; বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই পর্ব রামমোহনের নামেই নামাঙ্কিত হয়; রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন উহ্য

থেকে যান। পরবর্তী কালে অবশ্য রামমোহন অপেক্ষা ইয়ং বেঙ্গলের বিদ্রোহ এই রামমোহনের প্রতিপক্ষদেরও যেমন বিচলিত করে, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের (১৮১৭-১৯০৫) মতো রামমোহনের ভাব-শিষ্যকেও তেমনি খ্রীষ্টানী আক্রমণের বিরুদ্ধে সক্রিয় করে। তাই দেবেন্দ্রনাথের উদ্যোগে এই দুই দল হিন্দুই একত্রিত হন, ও ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশনে (১৮৫৪) রাজনৈতিক স্বার্থে সহযাত্রী হন।

স্কুল বুক সোসাইটির এক বৎসর পরেই স্থাপিত হয় স্কুল পরিচালনার জন্য **'কলিকাতা স্কুল সোসাইটি'** (খ্রীঃ ১৮১৮), আর পরে মিশনারিদের শ্রীরামপুর কলেজ। পূর্বেই তাঁরা বহু বাঙলা পাঠশালা পরিচালনা করতেন। স্কুল ও কলেজের জন্য পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নেও উইলিয়ম কেরির সহযোগীরা অগ্রসর হন। শিক্ষা-সাহিত্য প্রকাশে ব্রতী এসব পাদ্রিদের মধ্যে ছিলেন বর্ধমানের স্টুয়ার্ট, মালদহের এলার্টন, চুঁচুড়ার হার্লি, মে ও পিয়ার্স'ন, আর সর্বোপরি শ্রীরামপুরের ফেলিক্স কেরি, জন ক্লার্ক মার্শম্যান, পীয়ার্স প্রভৃতি। তাঁরা 'স্কুল বুক সোসাইটি'র সঙ্গে অনেক সময়েই এক যোগে কাজ করতেন। ইংরেজি পাঠ্য-পুস্তকও তাঁরা প্রণয়ন করেছেন। স্বভাবতঃই বেশির ভাগ বাঙলা পাঠ্য-পুস্তকই অনুবাদ বা অনুবাদমূলক রচনা। এ প্রসঙ্গেই তাই এসব মিশনারিদের কিছু কিছু অনূদিত বা রচিত পাঠ্যপুস্তক জাতীয় গ্রন্থের কথাও সংক্ষেপে উল্লেখ করা যেতে পারে। অবশ্য এ পর্ব ছাড়িয়ে অন্য পর্ব পর্যন্ত (১৮৪৩-'৫৭) তা সমভাবে চলে, তা মনে রাখা উচিত ; এবং খ্রীষ্টধর্মের প্রচার-পুস্তক ও অন্যান্য প্রকাশনও সেই সঙ্গে পাদ্রিরা সমভাবে চালিয়েছেন, তাও জানা কথা।

মিশনারিদের লিখিত পুস্তক-সমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য : উইলিয়ম কেরির জ্যেষ্ঠ পুত্র **ফেলিক্স কেরির** (খ্রীঃ ১৮২২) কৃত (১) বিদ্যাহারাবলি (খ্রীঃ ১৮১৯) নামক একখানি ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা বিষয়ক পুস্তক ; (২) গোল্ড্স্মিথ্-এর ইংরেজিতে লেখা ইতিহাস অবলম্বনে 'ব্রিটিশ দেশীয় বিবরণ সঞ্চয়' নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থ (১৮১৯-২০) ; এবং (৩) বানিয়ন-এর 'পিলগ্রিম্স্ প্রোগ্রেস্-এর অনুবাদ 'যাত্রাগ্রসরণ' (১৮৩৮)— এ গ্রন্থের দ্বিতীয় অনুবাদ করেন সাটন। এ জাতীয় সাহিত্য গ্রন্থের অনুবাদ —যেমন, জনসনের 'রাসেলাস' থেকে একেবারে 'টেলিমেকস ও 'ভ্রান্তিবিলাস' পর্যন্ত—পাঠ্যপুস্তক রূপেই বাঙলা গদ্য সাহিত্যের বিকাশের এই প্রথম পর্বে বাঙলা ভাষার সীমানা কতকটা প্রসারিত করেছে। যাই হোক, ফেলিক্স্ কেরি পিতার উপযুক্ত সন্তান,

আবাল্য বাঙলা দেশে বাস করে বাঙলা ভাষা হয়ত তিনি পিতার অপেক্ষা বেশি জানতেন। কিন্তু শত হলেও মৌলিক রচনায় তিনি হাত দেননি।

জশুয়া মার্শম্যানের পুত্র জন ক্লার্ক মার্শম্যান-এর নাম ইতিহাসের পাঠ্য-পুস্তকের জন্ত এদেশে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। তাঁর ইংরেজিতে লিখিত ভারত-বর্ষের ইতিহাস ও বঙ্গদেশের ইতিহাস উনিশ শতকে স্কুল-কলেজে বরাবর পঠিত হত। এ পর্বের শেষে তাঁর (১) ভারতবর্ষের ইতিহাসের বাঙলা অনুবাদ (খ্রীঃ ১৮৩১) ও (২) ইংরেজি ও বাঙলা দু ভাষায় 'পুরাবৃত্তের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (খ্রীঃ ১৮৩৩) প্রকাশিত হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় মার্শম্যানের ইংরেজিতে লিখিত বাঙলার ইতিহাস অবলম্বনেই 'বাঙ্গালার ইতিহাস (দ্বিতীয় ভাগ)' লিখেছিলেন (খ্রীঃ ১৮৪৭-৪৮)। তাই এদেশের ইতিহাস চর্চার ইতিহাসে জন ক্লার্ক মার্শম্যানের দান স্মরণীয়।

এ কারণেই খ্রীঃ ১৮৩০ অব্দে কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত 'প্রাচীন ইতিহাস সমুচ্চয়' মূল্যবান্। কারণ বিদ্যাসাগরের পূর্বেও বিশেষ করে মার্শম্যানের গ্রন্থের আদর্শে অনেক বাঙালী ইতিহাস-গ্রন্থ লেখেন—যেমন. রাজেন্দ্রলাল মিত্রের অগ্রজ গোপাললাল মিত্র ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (গোল্ডস্মিথের ইংরেজি থেকে 'গ্রীক দেশের ইতিহাস' খ্রীঃ ১৮৩৩-এ প্রকাশিত), গোবিন্দচন্দ্র সেন ('সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সমিতি'র দ্বারা অংশতঃ প্রকাশিত অনুবাদ 'বাঙলা ইতিহাস') ইত্যাদি। বিদ্যাসাগরের সমকালে (ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রেরণায় ?) প্রকাশিত হয় বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত 'ভারতবর্ষীয়েতিহাস সার সংগ্রহ' (খ্রীঃ ১৮৪৮)। উল্লেখযোগ্য এই যে এটি হিন্দুপক্ষ থেকে মার্শম্যানের প্রতিবাদে লেখা ইতিহাস। কারণ, মার্শম্যান, 'হিন্দুবালকদিগকে ভুলাইয়া খ্রীষ্টিয়ান করিবার মানসেই' হিন্দুদের সম্বন্ধে মিথ্যা কথা লিখেছেন। ইতিহাসের ক্ষেত্রেও (হিন্দু) জাতীয়তাবাদ ক্রমে প্রবেশ করবে, বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইতিহাস থেকে তা বুঝতে পারি। অবশ্য এ হচ্ছে তত্ত্ববোধিনীর লেখা।

আসলে জাতীয় আত্মমর্যাদাবোধ যে জাগ্রত হচ্ছিল স্বয়ং রামমোহনই তার প্রমাণ। তবে তিনি যুক্তি-বিচারের পথে পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান গ্রহণ করে দেশের পুনরুজ্জীবন পরিকল্পনা করছিলেন ; আর তাঁর সনাতনী প্রতিপক্ষরা সাধারণভাবে ধর্মীয়. সামাজিক ও রাজনৈতিক নানা সংঘাতে ভটস্থ হয়ে

চাইছিলেন ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করে ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে জাতীয় ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রাখতে। সমস্ত উনবিংশ শতাব্দী ধরেই এ দু'ধারায় ক্রমসংঘাত চলেছে. তাও আমরা যতই অগ্রসর হব ততই প্রত্যেক পর্বে দেখতে পাব। রামমোহন পাদ্রিদের সঙ্গে যুদ্ধে নেমেছিলেন ভারতীয় সভ্যতার সপক্ষে, হিন্দু রক্ষণশীলদের সঙ্গে যুদ্ধে নেমেছিলেন বুর্জোয়া জীবনা-দর্শের সপক্ষে—রক্ষণশীলদের শাস্ত্রবচনকে শাস্ত্রবচনেই খণ্ডিত করে। এসব যুদ্ধ চলেছে প্রধানতঃ নানা প্রচার ও বিতর্ক পুস্তিকায়, এবং নবপ্রতিষ্ঠিত নানা সংবাদপত্রে।

(৩) সাময়িকপত্র ও সংবাদপত্রের সূচনা (১৮১৮-১৮৩১)

ইংরেজ-প্রাধান্য স্থাপিত হলে সংবাদপত্রও যে প্রাদুর্ভূত হবে তা জানা কথা। 'ফোর্থ এস্টেট্' রাজনৈতিক চেতনার ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রধানতম বাহন। অষ্টাদশ শতাব্দীতেই ইংলণ্ডে ইংরেজের জীবন-যাত্রার তা অঙ্গ হয়ে গিয়েছে। ভারতবর্ষেও প্রথম ইংরেজি সংবাদপত্র প্রকাশিত হল (খ্রীঃ ১৮৩০) হিকি'স্ 'বেঙ্গল গেজেট'। বাঙলা মুদ্রাযন্ত্র তখনো স্থাপিত হয়নি। শ্রীরামপুরের পাদ্রিরাই যেমন প্রথম মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা (১৮০০) তেমনি প্রথম বাঙলা সংবাদপত্রও তাঁরাই প্রকাশিত করেন। গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের 'বাঙ্গালা গেজেট' হয়ত শ্রীরামপুরের 'সমাচার দর্পণে'র (মে, ১৮১৮) কিছুদিন পূর্বে প্রকাশিত হয়ে থাকবে। কিন্তু 'বাঙ্গালা গেজেট' স্থায়ী হয়নি, তার নিদর্শনও কেউ দেখেনি। সকলের পূর্বে প্রকাশিত হয় শ্রীরামপুর মিশনারিদের 'দিগ্‌দর্শন' (এপ্রিল, ১৮১৮)। তবে 'দিগ্‌দর্শন' সাপ্তাহিক-পত্র নয়, মাসিকপত্র ; সংবাদ অপেক্ষা শিক্ষার্থীদের জন্য তথ্যপরিবেষণই ছিল দিগ্‌দর্শনে'র উদ্দেশ্য। সরকারও এ পত্রের প্রতি সদয় ছিলেন। প্রায় ২৬ সংখ্যা পর্যন্ত এ মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়ে বন্ধ হয়ে যায়। পশ্বাবলি কে (১ম পর্যায়, ১৮২২-২৭) এক ধরনের 'গ্রন্থ' বলাই শ্রেয়ঃ, মাসে এক সংখ্যায় এক-একটি পশুর কথা তাতে প্রকাশিত হত। আসলে প্রথম সংবাদপত্র 'সমাচার দর্পণ'। তার অনুসরণে আরও প্রায় ২৮খানি সংবাদপত্র এ সময়ে (ইং ১৮৩১) প্রকাশিত হয়। প্রায়ই তা স্বল্পায়ু, আর প্রায়ই তা বিস্মৃত।

(ক) **সমাচার দর্পণ** (১৮১৮): খ্রীঃ ১৮১৮ সনে, 'দিগ্‌দর্শনে'র একমাস পরেই, 'সমাচার দর্পণ' প্রথম প্রকাশিত হয় (মে, ১৮১৮)। 'সমাচার দর্পণ খ্রীঃ ১৮৪০ পর্যন্ত চলে। মাঝে দ্বিসাপ্তাহিক পত্রও হয়েছিল। ইংরেজি 'ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া'ও শ্রীরামপুরের মিশনারিদের এ সময়কার এরূপ আর এক উদ্যোগ। খ্রীঃ ১৮১৮র মে মাসেই তা আরম্ভ হয়। প্রস্তুতির পর্বের বাঙলা সাহিত্যের বহু সংবাদ তার পাতা থেকেই সংগ্রহ করতে হয়। আর 'সমাচার দর্পণের যে মূল্য কী, তা ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সংবাদ পত্রে সেকালের কথা' না দেখলে যথার্থ উপলব্ধি করা যায় না। জন ক্লার্ক মার্শম্যান 'সমাচার দর্পণে'র প্রথম সম্পাদক। কিন্তু মার্শম্যান বিশেষ লিখতেন কি না সন্দেহ—তিনি অনন্যসাধারণ কর্মী পুরুষ—পাঠ্যপুস্তকের লেখক হিসাবে আমরা তাঁর পরিচয় পেয়েছি। 'সমাচার দর্পণে'র লেখার ভার বাঙালী পণ্ডিতদের উপর ছিল, এ অনুমান মিথ্যা মনে হয় না। তার মধ্যে জয়গোপাল তর্কালঙ্কার একজন। কিন্তু কেরি ও ম্যার্শম্যানের মত বস্তুনিষ্ঠ ইংরেজ কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণেই এই পণ্ডিতেরা চালিত হতেন। তাই 'সমাচার দর্পণের' ভাষায় যে সারল্য, লেখায় যে তথ্যবোধ ও মাত্রাজ্ঞান দেখা যায়,—তাতে এই ইংরেজ পুরুষদের প্রভাব অনুমান করতে হয়। মিশনারিদের পক্ষে একটি বিশেষ গৌরবের কথা—এমন পত্রিকাকে তাঁরা একেবারে খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারের বা সাম্প্রদায়িক বিতর্কের আসর করেন নি। স্বভাবতই 'সমাচার দর্পণে'র খ্রীষ্টান মতবাদের দিকে পক্ষপাতিত্ব ছিল। সংবাদপত্র হলেও দেশবাসীর মনে স্বাধীনতাবোধের প্রেরণা তা যোগায় নি। কিন্তু আধুনিক কালের ভাষায় 'সমাচার দর্পণ'কে বলা যায় সেদিনের প্রগতিবাদী পত্রিকা (দ্রঃ 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'র উদ্ধৃতিসমূহ)।

(খ) **'সম্বাদ কৌমুদী'** (১৮২১): রামমোহন রায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশিত 'সম্বাদ কৌমুদী' (ডিসেম্বর, ১৮২১) হয়ত প্রথম জাতীয় জাগরণের আসর হতে পারত। তার প্রকাশক ছিলেন তারাচাঁদ দত্ত ও ভবানী-চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু নূতন শিক্ষা ও আদর্শের ফলে তার পূর্বেই হিন্দু সমাজে সংঘাত বেধেছে—সে সংঘাত নানা পর্বে চলে। সংবাদপত্রের পরিচালনাতেই তা বিশেষ করে দেখা দেবার কথা। অচিরেই তা দেখা দিল। ১৮২১-এর ডিসেম্বর মাসে 'কৌমুদী' প্রথম প্রকাশিত

হয়। রামমোহন তাতে লিখতেন, তাঁর সতীদাহ-বিরোধী মতবাদও প্রকাশ করেন। কিন্তু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় হিন্দু রক্ষণশীলদের প্রবল নেতা। তিনি এ পত্রিকার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করে 'সমাচার চন্দ্রিকা' প্রকাশ করলেন। 'সম্বাদ কৌমুদী' হিন্দু সমাজের সমর্থন হারিয়ে ক্রমে বন্ধ হয়ে যায়। অবশ্য রামমোহনও তৎকালীন নবপ্রবর্তিত মুদ্রাযন্ত্র আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সংবাদ-পত্র প্রকাশ বন্ধ করেন। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার জন্য আবেদনের (১৮২৩) তিনি ছিলেন প্রধান একজন উদ্যোক্তা।

(গ) 'সমাচার চন্দ্রিকা' (খ্রীঃ ১৮২২) গোঁড়া বাঙালী সমাজের মুখপাত্র রূপে 'সমাচার দর্পণে'র প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়ায়। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৭৮৭-১৮৪৮) বাঙালী সম্পাদকদের মধ্যে প্রথম সম্পাদক, এবং সত্যই শক্তিশালী ব্যক্তি ও লেখক। সে সময়কার বাঙলা সংবাদপত্র-জগতের তিনি প্রধান ব্যক্তি, আর গদ্য সাহিত্যের প্রথম সাহিত্য-প্রণেতা। হিন্দুদের সমর্থন লাভ করাতে 'সমাচার চন্দ্রিকা'র প্রচার বাড়ে, ১৮২৯ (এপ্রিল) সনে তা অর্ধসাপ্তাহিক হয়। এই পত্রিকার পাতাতেই হিন্দু কলেজের ছাত্রদের বিষয়ে হিন্দু কর্তাদের সত্যমিথ্যা অভিযোগ প্রকাশিত হয়, 'সমাচার দর্পণে' তার উত্তর প্রকাশিত হত (দ্রঃ—সঃ পঃ সেঃ কথা)। 'ইয়ং বেঙ্গলে'র বিদ্রোহ যখন ধূমায়িত তখন রক্ষণশীলদের তটস্থ হবারই কথা। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ইংরেজি 'এন্‌কোয়ারার'-এ যাকে 'গুড়ুম সভা' বলেছেন, সেই 'ধর্মসভার' মতবাদই ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্রে প্রকাশিত হবে, তা জানা কথা।

(ঘ) 'বঙ্গদূত' (খ্রীঃ ১৮২৯): নীলমণি হালদারের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। এটি হিন্দু সংস্কারবাদীদের নূতন প্রয়াস। রামমোহন ও তাঁর অনুগামীরা 'বঙ্গদূতে'র পরিচালকমণ্ডলীতে ছিলেন। এ পত্রের বেশ কিছুটা প্রভাব ছিল। এদেশে ইংরেজরা জমির মালিক হয়ে বাস করুক, নীলের চাষ চলুক, ইত্যাদি রামমোহন-দ্বারকানাথ প্রমুখ প্রগতিধর্মী ব্যক্তিদের 'কলোনিজেশন' নামে পরিচিত) মতবাদের প্রধান বাহক ছিল 'বঙ্গদূত'। কিন্তু তখন পর্ব শেষ হচ্ছে, অবশ্য সংবাদপত্রের ক্রেতাও কতকটা স্থির হয়ে এসেছে।

এ পর্বের শেষে খ্রীঃ ১৮৩১এর ফেব্রুয়ারিতে প্রথম প্রকাশিত হয় 'সম্বাদ প্রভাকর'—সাহিত্যের দিক থেকে 'সম্বাদ প্রভাকর' আর এক ধারার

সূচনাকারী সংবাদপত্র। মনে রাখতে পারি—তখন 'ইয়ং বেঙ্গলের' বিদ্রোহে হিন্দু সমাজে 'গেল' 'গেল' রব উঠেছে। সে বিদ্রোহ ইংরেজি ভাষাতেই আত্মঘোষণা করত। তথাপি খ্রীঃ ১৮৩১এ প্রথম প্রকাশিত 'জ্ঞানান্বেষণ'-এ (১৮৩১-১৮৪০) দক্ষিণানন্দ (দক্ষিণারঞ্জন) মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বাঙলা ভাষায় তাঁদের মতবাদের কিছু প্রমাণ দিয়ে গিয়েছিলেন। তা তাঁদের পক্ষেও সৌভাগ্যের কথা না হলে তাঁরা বাঙলা সংবাদপত্রের (১৮৪২-৪৯) স্মরণীয় হতেন না। এ সঙ্গেই স্মরণীর সে সময়কার সংবাদপত্রের মধ্যে 'জ্ঞানোদয় (খ্রীঃ ১৮৩১) 'বিজ্ঞান সেবধি' (খ্রীঃ ১৮৩২), 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় (খ্রীঃ ১৮৩৫)। এসবে জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত হচ্ছিল। এসব বাঙলা পত্রের অগ্রদূত।

বাঙালী সমাজে এসব সংবাদপত্রের দান অনুমান করা যায়। অবশ্য মনে রাখা দরকার—শিক্ষিত ও কলিকাতা হুগলী প্রভৃতি শহরে লোকেরাই এসবের পাঠক ছিলেন। সেদিনে তাঁদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। এঁদের মধ্যেও অধিকাংশই ছিলেন ইংরেজি জানা; এবং ইংরেজি তাঁরা বেশি লিখতেন, বেশি পড়তেন—ইংরেজি সংবাদপত্রেরও তাই প্রতিষ্ঠা ও সমাদর ছিল বেশি। এসব বাঙলা সংবাদপত্রের অপেক্ষা সামাজিক মতবাদ গঠনে ইংরেজি সংবাদপত্রের দান বরং বেশিই ছিল (যেমন, পাদ্রিদের ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া হরকুরা ইয়ং বেঙ্গলের এনকোয়ারার, বেঙ্গল স্পেক্‌টেটর প্রভৃতি)।

বাংলা সংবাদপত্র প্রধানতঃ দু'টি উদ্দেশ্য সাধন করেছে—এক, শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য। বাঙলা সংবাদপত্র জ্ঞান-বিজ্ঞানের তথ্য বাঙলা ভাষায় জুগিয়ে সমাজের চেতনাকে প্রসারিত করেছে। এ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা বড় দান প্রথম 'সমাচার দর্পণে'র; পরে 'জ্ঞানান্বেষণে'র, 'জ্ঞানোদয়ে'র (ছাত্রদের উদ্দেশেই এই মাসিক প্রকাশিত হত), শেষে 'তত্ত্ববোধিনী'র (১৮৪৩)। দুই, ভাষা ও সাহিত্য-গঠন। যে আটপৌরে বাঙলা গদ্য গড়ে না উঠলে সামাজিক চেতনা আত্মপ্রকাশের পথ পায় না সে গদ্য গঠনে সংবাদপত্রই সর্বাপেক্ষা বড় ক্ষেত্র হয়ে ওঠে। সংবাদের সঙ্গে শুধু তথ্য জুগিয়েও সংবাদপত্রের চলত না; সেই সঙ্গে লোকের মনোরঞ্জনেরও চেষ্টা করতে হত। সরস লেখা যোগাবার চেষ্টায় সাহিত্যিক রচনারও তাই প্রয়োজন হয়। 'সমাচার চন্দ্রিকা'র পরেই এক্ষেত্রে 'প্রভাকরে'র উদয় হয়। অবশ্য পরযুগে 'তত্ত্ববোধিনী'র পরে সাময়িক-পত্র সাহিত্যেরই উর্বর ক্ষেত্র হয়ে ওঠে—আর আজও তা আছে।

(৪) সাহিত্য-রচনার প্রয়াস

বাঙলা সংবাদপত্রের আসরেই বাঙলা গদ্য-সাহিত্য রচনার প্রথম প্রয়াস দেখা দেয়। বাঙলা ভাষার জন্ম থেকেই বাঙালী প্রায় সাহিত্য রসের রসিক। গদ্যের জন্ম হতেই গদ্যেও যে রস পরিবেষণের চেষ্টা হবে, তা অনুমান করা যায়। ফোর্ট উইলিয়মের ছাত্রপাঠ্য ভাষা-শিক্ষার পুস্তক বা রামমোহন-মৃত্যুঞ্জয়-কাশীনাথের শাস্ত্রীয় যুক্তির কচকচিতে অবশ্য রস-সৃষ্টির অবকাশ বেশি ছিল না গদ্যভাষা তৈরী হচ্ছিল মাত্র। আর মৃত্যুঞ্জয় যে সচেতন শিল্পী, তা আমরা পূর্বেই বলেছি। অন্যদিকে, তর্কের প্রয়োজনেই মৃত্যুঞ্জয়-রামমোহন প্রভৃতিও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের আশ্রয় নিচ্ছিলেন। অবশ্য 'সমাচার দর্পণে'ও সেরূপ ব্যঙ্গ-রচনা সামান্য কিছু ছিল।

স্বভাবতই নূতন যুগ ও পুরাতন যুগের সংঘাতকালে বিদ্রূপ দু'পক্ষেরই এক প্রধান অস্ত্র হয়ে ওঠে। দু'পক্ষের কৃতী পুরুষেরাই তা দিয়ে পাঠকের তর্ক-শ্রান্ত মনকে জাগিয়ে রাখতে পারেন। তবে একটা সাধারণ কথা আছে—সংস্কারবাদীরা নূতন আদর্শ প্রবর্তন করতে চান বলে প্রায়ই সাধারণের সমর্থন তাঁদের পক্ষে থাকে না, যুক্তি ও সহিষ্ণুতা দিয়ে সর্বাগ্রে তাঁদের তা অর্জন করতে হয়। রুচি, আদর্শ ও যুক্তির নিয়ম লঙ্ঘন করে ব্যঙ্গের শরক্ষেপণ তাই তাঁদের পক্ষে শক্তির অপচয়। অপর পক্ষে, রক্ষণশীলেরা সহজ সমর্থনে সুরক্ষিত, বিপক্ষকে শরাঘাতে তাঁদের শক্তির সার্থকতা, ন্যায়-অন্যায় যে কোন রূপ বিদ্রূপে তাঁদের লক্ষ্যচ্যুতি ঘটবার কারণ নেই। এই কারণে বিদ্রূপ-বিলাসীরা সহজেই প্রধানতঃ রক্ষণশীলদের দলে যোগদান করা সুবুদ্ধির কাজ মনে করেন,—মতামত যাঁর যা-ই হোক। অন্ততঃ আজও পর্যন্ত বাঙলা সাহিত্যে এ কথাটা মোটামুটি সত্য। আমাদের সাহিত্যে সুইফ্‌ট্ জন্মেন নি, বার্নার্ড শ' নেই। যাঁরা জি. বি. এস্-এর ব্যঙ্গের অনুকরণ করেন তাঁরা জি. বি. এস-র মত যুক্তিবাদী, সমাজ-বিপ্লবী নন বরং পরিবর্তনের বিরোধী। ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধের সে-সব বিদ্রূপ-বিশারদদের বিদ্রূপ যে এখন অপাঠ্য ঠেকে, তা কিন্তু তাঁদের দোষ নয়। তখন পর্যন্ত বাঙালী সমাজে সাধারণভাবে নূতন শিক্ষা ও সংস্কৃতি ব্যাপক হয়নি, আধুনিক জীবনাদর্শ সম্মান লাভ করেনি, গতানুগতিক রুচির স্থূলতা আধুনিকভাবে মার্জিত হতে আরম্ভ করেনি। এক কথায়, আধুনিক জীবনাদর্শ ও সাহিত্যাদর্শ স্থাপিত

হয়নি। অথচ সংস্কৃতের ঐতিহ্যের মধ্যে স্বচ্ছ হাস্যরস যথার্থই ছিল। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বা শিবায়নে তা বাঙালী হাস্যরসে পরিণত হয়েছে। মধ্যযুগের অন্ত্যকালীন পচন-ধরা সমাজে তা একদিকে সাহিত্যে পরিণত হয়েছে নারীগণের পতিনিন্দায়, সতীনের কলহ ইত্যাদিতে, অন্যদিকে লৌকিক আমোদে, যাত্রায়, খেউড়ে, গোপাল ভাঁড়ের 'রসিকতায়'। এ ঐতিহ্যেই ঊনবিংশ শতকের রক্ষণশীলদেরও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ রচিত। তথাপি সে সম্বন্ধে প্রধান বড় কথা এই—প্রথমতঃ, তা এই অনুবাদ ও সংকলনের যুগের প্রথম মৌলিক রচনার প্রয়াস। দ্বিতীয়তঃ, তা এই নিছক ও প্রায় নীরস গদ্য-রচনার যুগের একমাত্র সরস রচনার প্রয়াস। আর এ দু'টি কথাতেই আমাদের সে সাহিত্যের দৈন্যের পরিচয় স্পষ্ট।

এ চেষ্টায় একজন লেখকই স্মরণীয়—ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (খ্রীঃ ১৭৮৭-১৮৪৮)। বাঙালী সাংবাদিক ও সম্পাদকরূপেও তিনি প্রকৃতপক্ষে প্রথম গণ্য—'সমাচার চন্দ্রিকা'র (৫ই মার্চ, ১৮২২) তিনিই সম্পাদক ও প্রতিষ্ঠাতা; 'সম্বাদ কৌমুদী'রও (ডিসেম্বর, ১৮২১) তিনিই প্রথম হতে ১৩শ সংখ্যা প্রকাশ করেন। ভবানীচরণের জীবনীকাররা বলেছেন (খ্রীঃ ১৮৪৯), "এ পত্রকে এতদ্দেশীয় ভাষা পরিবর্তনের মূল সূত্র বলিতে হয়।" তা ছাড়া, তিনি যে 'ধর্মসভা'র (১৮২৯) প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক তাও আমরা জানি। এই 'ধর্মসভা'র উদ্যোগে তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর একখানি ক্ষুদ্র জীবনচরিত প্রকাশিত হয় (দ্রঃ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লিখিত 'কলিকাতা কমলালয়ের' ভূমিকা, ও 'নববাবু বিলাসের' ভূমিকা)। তাতে মোটের উপর ভবানীচরণের কর্মজীবনের ও কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। খ্রীঃ ১৮৪৮ সনে তাঁর মৃত্যু হয়—ততক্ষণে যা কিছু তাঁদের বক্তব্য ছিল তা নিঃশেষ হয়েছে, সমস্যার মীমাংসা না হলেও বিচার শেষ হয়ে এসেছে। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' পাঁচ বৎসর চলেছে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' (খ্রীঃ ১৮৪৭) প্রকাশিত হয়েছে—ইউরোপে অবশ্য ইং ১৮৪৮এ বিপ্লবের ঝড়। তথাপি ভবানীচরণের জীবনচরিত দেখলে সন্দেহ থাকে না যে, রামমোহন রায়ের এই প্রতিপক্ষ ও রক্ষণশীল হিন্দুদের অন্যতম নেতা সত্যই সুপণ্ডিত, উদ্যোগী ও অসাধারণ কর্মকুশল পুরুষ ছিলেন। আর, সেই সঙ্গে দেখি—সত্যই বাঙলা ভাষা তিনি লিখতে জানতেন, ভালোবাসতেন; বিদ্রূপ রচনায় তাঁর হাত ছিল,

কিন্তু রুচি তখনো মার্জিত হয় নি। তাঁর রুচি, তাঁর নীতি, তাঁর মতবাদ—কতকটা তাঁর কালের রক্ষণশীলদের, কতকটা যে-কোন কালের প্রতিক্রিয়াশীলদের সহজ গুণ ও সহজ দোষ।

ভবানীচরণের প্রধান পরিচয় 'সমাচার চন্দ্রিকা' (খ্রীঃ ১৮২২?), ছাড়া এই ৪ খানি গ্রন্থ—(১) 'নববাবু বিলাস' (১৮২৩?), 'প্রমথনাথ শর্মা' নামে লিখিত; (২) 'কলিকাতা কমলালয়' (১৮২৩?); (৩) 'দূতীবিলাস' (খ্রীঃ ১৮২৫) পদ্যে রচিত; (৪) 'নববিবি বিলাস' (খ্রীঃ ১৮৩০?)—ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই ছদ্মনামে একটি সংস্করণ চলিত। এ ছাড়া গীতা, ভাগবত, প্রাচীন শাস্ত্র-গ্রন্থও ভবানীচরণ গদ্যে পদ্যে রচনা করেছিলেন।

এই চারখানা পুস্তকের মধ্যে 'নববিবি বিলাস' ও 'দূতীবিলাস' তাঁর গুণগ্রাহীরাও এখন আর পুনর্মুদ্রণে সাহসী হবেন না। একটিতে কুলটা স্ত্রীর গঞ্জনা ব্যপদেশে, অন্যটিতে তৎকালীন ঐতিহ্যে দূতী-কর্ম-বর্ণনে তিনি যে বাড়াবাড়ি করেন তাকে কালের দোহাই দিয়েও কেউ বরদাস্ত করতে পারেন না। বাকী ২ খানার মধ্যে পদ্যাংশ অনেক—লেখকের পদ্যের উপর মায়া আছে।

'কলিকাতা কমলালয়' (দ্বিতীয় গ্রন্থ) বিদেশীর ও নগরবাসীর প্রশ্নোত্তরে কলিকাতার 'বিষয়ি ভদ্রলোকের ধারা', 'যাবনিক ও সাধু ভাষার বিবরণ', কলিকাতার পাঠশালা, স্কুল প্রভৃতিতে বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা প্রভৃতি নানা বিষয় বিবৃত হয়েছে। তথ্য যথেষ্ট আছে, কৌতূহল থাকলে পড়া চলে। তবে ব্যঙ্গবহুল নয়। 'নববাবু বিলাসই' বিদ্রূপাত্মক রচনা—এবং ভবানীচরণের প্রধান রচনা।

নববাবু বিলাস (১৮২৩?):

"মুনিয়া বুলবুল আখড়াই গান,
ঘোষ পোবাকী যশসী দান,
আড়ি ঘুড়ি কানন ভোজন,
এই নবধা বাবুর লক্ষণ।"

'অঙ্কুর খণ্ড', 'পল্লব খণ্ড', 'কুসুম খণ্ড', ও 'ফল খণ্ড' এই চার খণ্ডে বাবুর কথা বিবৃত হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙলা ব্যঙ্গ-রচনায় কলিকাতার এই 'বাবু' বিবিধ ব্যঙ্গের বিষয়-বস্তু। আর গদ্য ব্যঙ্গ-রচনার ইতিহাসে এ গ্রন্থের

সঙ্গে 'আলালের ঘরের দুলালের' (খ্রীঃ ১৮৫৪-৫৮) যোগাযোগ অনুমিত হয়েছে (দ্রঃ দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা ৭ নং, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা ও 'নববাবু বিলাস'-এর উদ্ধৃতিসমূহ)।

বিষয়বস্তু হিসাবে 'বাবু'র সাক্ষাৎ পাওয়া যায় প্রথম 'বাবুর উপাখ্যানে'। তা 'সমাচার দর্পণের' (খ্রীঃ ১৮২১, ফেব্রুয়ারী ও জুন) দু'সংখ্যায় প্রকাশিত একটি ব্যঙ্গ রচনা। তখনো 'সম্বাদ কৌমুদী' বা 'সমাচার চন্দ্রিকা' প্রকাশিত হয়নি। লেখার তুলনা করলে মনে হয় এটি 'নববাবু বিলাসের' লেখকেরই 'বাবু' আখ্যানের প্রথম খসড়া। অনুরূপ আরও দু'একটি লেখা এ-সময়কার সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। তার পরে নববাবু বিলাসের' আবির্ভাব। মোটের উপর উনিশ শতকের প্রথম পাদে এই অশিক্ষিত বাবুরা চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছিল, ব্যঙ্গের বিষয়ও হয়েছিল। এ অবশ্য হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বেকার চিত্র। 'যে সময়ে তাহা (নববাবু বিলাস) প্রস্তুত হইয়াছিল তৎকালে বর্ণিত বাবুর আদর্শ কলিকাতায় অপ্রাপ্য ছিল না'—শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজেন্দ্রলাল মিত্র একথা বলেছেন। পাদ্রি লঙ সাহেবেরও তাই মত। 'হিন্দু কলেজ' স্থাপিত (১৮১৭) হলে নূতন শিক্ষার ব্যবস্থা হয়, তখন ভবানীচরণের মত সমাজ-কর্তৃপক্ষের ভয়ের কারণ ও বিদ্রূপের বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে প্রথমে রামমোহনের দল, পরে ইয়ং বেঙ্গল। কিন্তু 'বাবুর দল' কি তখন-তখনি বিলুপ্ত হয়েছিল? 'হুতোম পেঁচার নক্সায়' (খ্রীঃ ১৮৬২) হয়ত পুরনো দিনের বাবুর যুগের চিত্রই অঙ্কিত হয়েছে। 'আলালের ঘরের দুলাল' (ইং ১৮৫৪-৫৮) দেখে মনে হয় শতাব্দীর মধ্যভাগেও 'বাবু'র সম্ভাবনা দূর হয় নি। 'সধবার একাদশী'র অটলের কথা মনে রাখলে বুঝব স্কুল-কলেজের যুগে বাবুদের কতটা রূপান্তর ঘটছিল—ইংরেজি স্কুলে 'বাবু ক্লাশে' তাদের ভরতি হতে হয়। তারপরে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বাবু' নামক রচনা মনে করলে শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে নতুন বাবুরা কি রূপ ধারণ করছিল তাও বুঝি। সাধারণ-ভাবে মনে হয়—'তোতারাম দত্ত'দের যুগ শেষ হয়েছিল হিন্দু কলেজ ও ইংরেজি শিক্ষার বিস্তারে। সমাজ ও সংস্কৃতিতে তখন 'বাবু'র প্রাধান্য লুপ্ত হতে থাকে। শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে পরাশ্রয়ী নিমচাঁদের তুলনায়ও অটলবিহারীরা নিজেদের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক খর্বতা অনুভব না করে পারেনি। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত তখন শিক্ষাহীন বিত্তবানদের অপেক্ষা অধিক আদৃত।

ব্যঙ্গ রচনার ইতিহাসে 'নববাবুবিলাস প্রথম গ্রন্থ। অনেকদিন পর্যন্ত তা জনপ্রিয় ছিল; তার নাট্যরূপও দেওয়া হয়েছিল; একথা বাঙলা সাহিত্যের আর-এক দৈন্যের প্রমাণ। 'আলালের ঘরের দুলালে'র সঙ্গে তার যোগ ছিল; কিন্তু তা ঘনিষ্ঠ নয়, সামান্য। দু'য়ের উপকরণ বাহ্যত কতকটা এক। 'আলালের ঘরের দুলালে'র ভাববস্তু সুশিক্ষা ও কুশিক্ষা; তার সমাজচিত্র শুধু ব্যঙ্গচিত্র নয়। তা ছাড়া তাতে চরিত্র ফুটেছে। 'উপদেশক' বা 'খলিফা' জাতীয় ব্যক্তির সঙ্গে 'ঠগ্‌চাচা'র মিল কার্যঘটিত, চরিত্রগত নয়—'ঠগ্‌চাচা' চরিত্র হতে পেরেছে। 'নববাবুবিলাস' গতানুগতিক প্রহসন ধরণের রচনা, 'আলালের ঘরের দুলাল' সম্পূর্ণ উপন্যাস না হলেও মোটের উপর উপন্যাস জাতীয় সৃষ্টি।

॥ ৩ ॥ 'ইয়ং বেঙ্গলের' পর্ব (খ্রীঃ ১৮৩১-১৮৪৩)

'ডিরোজিও'র শিষ্যদের নিয়েই ইয়ং বেঙ্গল বা 'নব্য বাঙলা'। হয়ত আজকালকার ভাষায় এঁদের নাম দিতে পারা যায় 'বিদ্রোহী বাঙলা'। ডিরোজিও'র নিকট 'ইয়ং বেঙ্গল' শিক্ষা পেয়েছিলেন—আস্তিকতা হোক, নাস্তিকতা হোক, কোনো জিনিসকে পূর্ব থেকে গ্রহণ না করতে; জিজ্ঞাসা ও বিচার, এই তাঁদের মূলমন্ত্র। এসব কথা পূর্বেই প্রথম পরিচ্ছেদে উল্লেখিত হয়েছে। ডিরোজিও ছাড়া ডেভিড্ হেয়ারের প্রভাবও তাঁদের কারও কারও উপর বেশ গভীর ছিল। ডেভিড্ হেয়ারও বাইবেলে বিশ্বাস করতেন না। খ্রীঃ ১৮২৬-১৮৩১ ডিরোজিও'র শিক্ষকতাকাল, 'ইয়ং বেঙ্গলের'ও উন্মেষকাল। অবশ্য খ্রীঃ ১৮৩১এ 'ইয়ং বেঙ্গল' প্রকাশ্যে আত্মঘোষণা করলেন প্রথম ইংরেজি এন্‌কোয়ারার' পত্রে, পরে বাঙলা 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রে। তাঁদের পরিচয় এ পত্র দু'খানির নামে, লেখায়, ভাষায় দেখা গিয়েছে। শেষদিকে 'বেঙ্গল স্পেক্‌টেটর' তাঁদের মুখপত্র হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে, এঁরা ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাহীন বলে 'ধর্মসভা' এঁদেরই বিরুদ্ধে সমাজ রক্ষার জন্য কোমর বেঁধে দাঁড়ায়, খ্রীষ্টানরাও চমকিত হয়।

বিদ্রোহী বাঙলা

'ইয়ং বেঙ্গলের' নাম কতকটা অন্যায়রূপেই পরবর্তী কালে মসীলিপ্ত করা হয়েছে। কিন্তু বাঙলা দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে তাঁরা ধূমকেতু নন, আশ্চর্য জ্যোতিষ্ক। এঁদের মধ্যে ফরাসী বিপ্লবের প্রেরণা ও ব্রিটিশ র‍্যাডিকেলদের ধারণা একসঙ্গে জ্বলে উঠেছিল। কিন্তু সে অগ্নি-শিখাকে বিপ্লবের মশালে বা সংস্কারের প্রদীপে প্রায় কেউ ধরে রাখতে পারেনি। এঁদের অধিকাংশই অভিজাত গোষ্ঠীর নন, হিন্দু কলেজের শিক্ষায় প্রবুদ্ধ শিক্ষিতশ্রেণী। নিজেদের জীবন-যাত্রায় তাঁরা সমাজে আলোড়ন ও বিক্ষোভ তুললেন, কিন্তু নিজেরা কোন সুচিন্তিত আন্দোলন সংগঠন করলেন না। আত্মগঠন অপেক্ষাও আত্মস্বাতন্ত্র্য ছিল তাঁদের লক্ষ্য। কর্মনীতি সম্বন্ধেও কোনো মতের ঐক্য তাঁরা স্থির করতে চাননি, প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র পথে চলেছেন। অনেকেই পরে জীবিকার্জনে বাধ্য হন; ইং ১৮৩৮ সনে দেশীয় শিক্ষিতদের উচ্চ চাকরির সুযোগও হল,—ক্রমে চাকরির নিয়মে তাঁরা জীবিকা ক্ষেত্রে আবদ্ধ হয়ে পড়েন। কেউ কেউ তা সত্ত্বেও নিজের প্রতিভাকে একভাবে-না-একভাবে কিছুটা প্রকাশিত করেছেন। অনেকেই তা করেন শেষের দিকে,—যখন 'ইয়ং বেঙ্গলের' তেজঃপ্রভা স্তিমিতপ্রায়। অধিকাংশেরই কীর্তি থেকে অবশ্য তাঁদের মাতৃভাষা বঞ্চিত। ঈশ্বর গুপ্ত তাঁদের আহ্বান করেন বাঙলা লেখাতে, তা বিশেষ সফল হয় নি। তাই বাঙলা ভাষার ইতিহাসে 'ইয়ং বেঙ্গলের' তেমন নাম নেই। কিন্তু তাঁদের কর্ম ও সাংস্কৃতিক প্রভাব সেদিনের (ইং ১৮৩১-১৮৫৭) বাঙালী সমাজে কম ব্যাপক ছিল না—আর বাঙলা সংস্কৃতির ইতিহাসে তাঁরা চিরস্মরণীয়।

(১) **কবি ডিরোজিও (১৮০৯-১৮৩১)**: মাত্র ২৩ বৎসর বয়সে অকালে অস্তমিত হন। তাঁর কবিতা ইংরেজিতে হলেও দেশপ্রেমের কবিতা হিসাবে তা আজও স্মরণীয়। চৈতন্যদেব এক অক্ষর বাঙলা না লিখেও বাঙলা সাহিত্যের যুগাবতার; ডিরোজিও বাঙলা না লিখেও বাঙলার একটি পর্বের প্রবর্তক। এই অত্যাশ্চর্য যুবকের মনীষার ও সত্যনিষ্ঠার পরিচয় তাঁর ছাত্ররা। খ্রীঃ ১৮২৬ থেকে খ্রীঃ ১৮৩১ পর্যন্ত তিনি হিন্দু কলেজে শিক্ষাদান করতেন। তাঁর গৃহে ছাত্রদের ছিল অবাধ অধিকার। তর্ক হত, আলোচনা হত, জীবনের সব জিনিসকে বিনা সংকোচে তাঁরা যাচাই করতে শিক্ষা পেতেন। আর

ডিরোজিও'র গৃহে ও অন্যত্র মদ্য ও নিষিদ্ধ মাংস আহারে তাঁরা প্রকাশ্যে যোগ দান করতেন। এরূপই ছিল সেই 'মদ্য ও বই-এর যুগের' বিদ্রোহ ও সত্যনিষ্ঠার পরিচয়। এজন্যই হিন্দু কলেজের কর্তৃপক্ষ ডিরোজিওকে (খ্রীঃ ১৮৩১) বিতাড়িত করেন—'ধর্মসভার' রামকমল সেন এ বিষয়ে উদ্যোগী হন; রামমোহনের সহগামী প্রসন্নকুমার ঠাকুরও শেষ পর্যন্ত এ প্রস্তাবে সম্মত হন। এটিও তত দুর্ভাগ্যের কথা নয়। পরম দুর্ভাগ্য এই—বৎসর শেষ না হতেই ডিরোজিও কলেরায় কালগ্রাসে পতিত হন। আর তাঁর মৃত্যুতে এই শিষ্যদের কেন্দ্রচ্যুতিও সুনিশ্চিত হয়ে ওঠে। এই যূথহারা, প্রায়-পথহারা গোষ্ঠীর সাহিত্যকীর্তি নেই, কিন্তু পরিচয় তবু স্মরণীয়।

(২) **তারাচাঁদ চক্রবর্তী** (১৮০৬-১৮৫৫): 'ইয়ং বেঙ্গল' যে বয়োজ্যেষ্ঠকে আশ্রয় করে ডিরোজিও'র পরে নিজেদের পরিচয় এপর্বে প্রদান করেন, তিনি রামমোহনের 'ব্রহ্মসভার' প্রথম সম্পাদক, হিন্দু কলেজের প্রথম দিককার ছাত্র তারাচাঁদ চক্রবর্তী ('উঃ শতাব্দীর বাংলায়' যোগেশচন্দ্র বাগল তাঁর কথা বিবৃত করেছেন)। সাংবাদিক, কোষকার ও সরকারী কর্মচারী বললে তাঁর কিছুই পরিচয় দেওয়া হয় না। ইং ১৮৩৩-এ কোম্পানির সনদ পরিবর্তনের দিনে রাজনৈতিক দাবী-দাওয়া পেশ করা হয়; সে সময় থেকে বাঙলা দেশের রাজনৈতিক চেতনা যাঁদের প্রয়াসে এগিয়ে চলে তারাচাঁদ তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য। তিনিই হন 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার' স্থায়ী সভাপতি। সে সভাতে জর্জ টমসনের উত্থাপিত প্রথম রাজনৈতিক সংগঠনের জন্য প্রস্তাব তিনিই সমর্থন করেন (খ্রীঃ ১৮৪৩)। আর, সে সভায় হিন্দু কলেজের গৃহে দক্ষিণানন্দ এক দিনের অধিবেশনে প্রিন্সিপাল রিচার্ডসনের উপস্থিতিতে ব্রিটিশ ফৌজদারী শাসন-রীতির কুপ্রথার সমালোচনা করেন (১৮৪৩)। এ তথ্যও উল্লেখিত হয়েছে—কাপ্তেন রিচার্ডসন তাঁর কলেজে সেই 'রাজদ্রোহের' প্রবন্ধপাঠ তখনি বন্ধ করতে চান; সভাপতি তারাচাঁদ চক্রবর্তী তাতে রিচার্ডসনকে বাধা দেন,—যেখানেই হোক্ সভা চলাকালে এরূপ বিঘ্ন উৎপাদন দোষাবহ। প্রিন্সিপাল রিচার্ডসনকে সভার নিকটে তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করতে বাধ্য করেন। মনে হয়, রামমোহন ও 'ইয়ং বেঙ্গলে'র সঙ্গে তারাচাঁদই যোগসূত্র রক্ষা করেছিলেন। হয়ত রামমোহনের অবর্তমানে তিনি 'ইয়ং বেঙ্গল'কেই দেখেছিলেন তাঁদের আদর্শের বাস্তব

উত্তরসাধকরূপে। অন্তত এ সময়ে এই 'নব্য বঙ্গের' নাম হয় চক্রবর্তী ফ্যাক্শ্যান' বা 'চক্রবর্তীচক্র' ।—তবু তাঁর ৭৫০০ শব্দের ইংরেজী-বাঙলা অভিধান ও মনুসংহিতার ৫ খণ্ডের অনুবাদ ছাড়া আর কোনো পরিচয় এখন নেই।

(৩) **কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়** (১৮১৩-১৮৮৫): তারাচাঁদ চক্রবর্তীর পরেই কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথম অধ্যায়েই তাঁর কথা উল্লেখিত হয়েছে। 'বিদ্যাকল্পদ্রুম' (১৮৪৬) 'ষড়্দর্শনসংবাদ' (১৮৬৭) প্রভৃতির জন্য বিশেষভাবে তিনি আলোচ্য বাঙলা সাহিত্যে —তবে তা পরবর্তী পর্বের কথা। দরিদ্র ব্রাহ্মণের ছেলে কৃষ্ণমোহন ডেভিড্ হেয়ারের অবৈতনিক আরপুলি স্কুলের ছাত্র। হিন্দু কলেজে তিনি উচ্চশ্রেণীতে পড়তেন বলে ডিরোজিও'র নিকটে পড়েন নি। কিন্তু লেখায়, বক্তৃতায় তিনি ডিরোজিও'র শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যেও একটি রত্ন। ১৮৩১ অব্দে বন্ধুদের দুষ্কৃতির জন্য (পূর্বাধ্যায়ে উল্লেখিত) তিনি স্বগৃহ থেকে বিতাড়িত হন, কিন্তু মিথ্যা আচার নিয়মের নিকট নতি স্বীকার করলেন না। ১৮৩১এই তিনি ইংরেজি 'এনকোয়ারার' পত্রের সম্পাদকরূপে তা প্রকাশিত করতে থাকেন। সে ভাষায় তেজ ও আগুন ছিল ছত্রে ছত্রে। ক্রমে (১৮৩২) তিনি (ও মহেশচন্দ্র ঘোষ) খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন, তারপর ১৮৩৭এ পাদ্রি হন। বাঙলায় তিনি এন্‌সাইক্লো-পীডিয়া জাতীয় গ্রন্থ 'বিদ্যাকল্পদ্রুম' রচনায় ব্রতী হন (পরে দ্রষ্টব্য)। বাঙলা সাহিত্যে তাঁর দান সেদিন নানা কারণে সম্পূর্ণ স্বীকৃতি পায়নি। কিন্তু পাণ্ডিত্যে, জ্ঞানাহরণে, সাধারণের হিতৈষণায় তিনি অগ্রগণ্য ছিলেন। জীবনের শেষ ১০-১০ বৎসর বাঙালী সমাজেও রেভাঃ কৃষ্ণমোহন সর্বসাধারণের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন।

(৪) **দক্ষিণানন্দ (দক্ষিণারঞ্জন) মুখোপাধ্যায়** ১৮১২-১৮৮৭): দক্ষিণানন্দ কলিকাতার অভিজাত বংশের সন্তান। অর্থে, কুলে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, বাক্কৌশলে সর্বদিকে সুপটু। তিনিই 'জ্ঞানান্বেষণের (খ্রীঃ ১৮৩১) প্রথম সম্পাদক। আর 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার' সেই খ্রীঃ ১৮৪৩এর বহু-উল্লেখিত সভায় তিনিই পাঠ করেছিলেন প্রবন্ধ। তাঁরই প্রদত্ত জমিতে সেদিনে বেথুন স্কুল প্রথম স্থাপিত হয়। ধনে মানে এই অগ্রণী পুরুষ পরে কলিকাতা ত্যাগ করেন। তিনি তখন লক্ষ্ণৌর অধিবাসী হন। সেখানে

সিপাহী যুদ্ধে তিনি ইংরেজদের সহায়তা দান করে তালুকদারী ও 'রাজা' খেতাব লাভ করেন। তাঁর দেশত্যাগে বাঙলা দেশের ও বাঙলা সাহিত্যের যে ক্ষতি হয় তা কেউ তখন একবারও ভাবেনি। অবশ্য সমধিক ক্ষতি হয় 'ইয়ং বেঙ্গলে'র। 'জ্ঞানান্বেষণের' সম্পাদক বাঙলা সাহিত্যে আর কিছুই দান করে যান নি।

(৫) **রামগোপাল ঘোষ** (১৮১৫-১৮৬৮): ইংরেজি বক্তৃতার জন্য 'ডিমোস্থীনিস্' বলে খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর বাঙলা রচনাও 'জ্ঞানান্বেষণে' স্থান পেত। কিন্তু বাঙলা লেখায় সম্ভবতঃ তাঁর রুচি বা আগ্রহ ছিল না। আচার-ব্যবহারে অনেকটা তিনি ইংরেজের মত চলতেন, হিন্দু সমাজকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করতেন—অর্থাৎ যথার্থ বুর্জোয়া শিক্ষার এক উগ্র প্রতীক। রামগোপাল ঘোষ ব্যবসায়ীদের মধ্যেও অগ্রণী হন। রাজনৈতিক অধিকার, মরিশাসে কুলিপ্রেরণ বন্ধ করা, মফঃস্বলে ইউরোপীয়দের দেশীয়দের মত বিচারের প্রস্তাব, প্রভৃতি বিষয়ে বাগ্মিতায় তিনি কলিকাতার ইউরোপীয়দের চমক লাগিয়ে দেন। বাঙালীর প্রথম রাজনৈতিক বাগ্মী রামগোপাল ঘোষ।

(৬) **রসিককৃষ্ণ মল্লিক** (১৮১০-১৮৫৭): ডিরোজিও'র ছাত্র নন, কিন্তু ছাত্রতুল্য শিষ্য। বিদ্যায়, বাগ্মিতায়, সততায় 'ইয়ং বেঙ্গলে'র আদর্শ তিনি উজ্জ্বল করে তোলেন। সেদিনের নিয়মে আদালতে 'গঙ্গাজল' নিয়ে হলপ পড়তে হত; তিনি তা অস্বীকার করলে হিন্দু সমাজে হৈ-চৈ পড়ে যায়। ইংরেজি বাঙলা 'জ্ঞানান্বেষণে'র (১৮৩৩) পরিচালনভার মাধব মল্লিকের সঙ্গে তিনি গ্রহণ করেছিলেন, তার বেশি বাঙলায় তাঁরও দান নেই। (দ্রঃ উঃ শঃ বাংলা—যোগেশচন্দ্র বাগল)

'ইয়ং বেঙ্গলে'র সকলেই যে চিরদিন এ রকম বিচ্ছিন্ন থাকেন তা নয়।

(৭) **প্যারীচাঁদ মিত্র** (১৮১৪-১৮৮৩): 'ইয়ং বেঙ্গলে'র নামকে বাঙলা সাহিত্যেও অমর করে রেখে গেছেন। হিন্দু কলেজে পড়ার সময়েই প্যারীচাঁদ নিজগৃহে শিক্ষাদানের জন্য স্কুল খোলেন। কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরির (বর্তমান 'ন্যাশনাল লাইব্রেরি'র মূল) সঙ্গে তিনিও ইয়ং বেঙ্গলের অন্যান্যের মত প্রথম থেকে সংযুক্ত থেকে পরে লাইব্রেরির গ্রন্থাধ্যক্ষ ও সম্পাদক পদ লাভ করেন। ইংরেজি প্রবন্ধ ও জীবন-চরিত্রের (ডেভিড হেয়ার, রামকমল সেন, রুস্তমজী কওয়াশজী প্রভৃতির) তিনি লেখক—সেদিকে তাঁর

অনুজ কিশোরীচাঁদ মিত্রের দান আরও উল্লেখযোগ্য। কিন্তু বাঙলা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ সুপরিচিত 'আলালের ঘরের দুলালে'র (খ্রীঃ ১৮৫৮-এ প্রকাশিত) লেখক 'টেকচাঁদ ঠাকুর' নামে। বিদ্রোহের প্রথম উদ্দামতা কাটিয়ে তিনি ক্রমেই স্থিরতর সাহিত্য-সাধনায় ব্রতী হন। শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চিন্তার সঙ্গে দেশের সংযোগসাধন তাঁর কাম্য হয়ে ওঠে। ইংরেজি-বাঙলা দু'ক্ষেত্রেই তাঁর দান ১৮৪৭ থেকে আরম্ভ হয়ে ১৮৮৩ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

(৮) রাধানাথ শিকদার (১৮১৩-১৮৭০): প্যারীচাঁদ মিত্রের বন্ধু, এক হিসাবে এদেশের প্রথম বৈজ্ঞানিক। জরীপ বিভাগের কর্মচারীরূপে তিনিই এভারেষ্ট গিরিশৃঙ্গ প্রথম আবিষ্কার (১৮৫২) করেন বলে বলা যায়। দেরাদুন অঞ্চলে দেশীয় লোকেদের দিয়ে সাহেবদের 'বেগার' খাটানোর বিরুদ্ধে তিনি দাঁড়ান প্রতিবাদী হয়ে। একটি সত্য ঘটনার সত্য উত্তরে তাঁর তেজস্বিতার ও যুগ-দৃষ্টির সাক্ষ্য রয়েছে। মাল বহনের জন্ত ম্যাজিস্ট্রেট্ মিঃ ভ্যানসিটার্ট রাধানাথের অধীন এক পিয়াদাকে বেগার খাটাতে চান (১৮৪৩)। রাধানাথ বাধা দেন। কুলি না পেয়ে ইংরেজপুঙ্গব এসে তম্বি শুরু করেন—"জানো, আমি কে?" রাধানাথ উত্তর দেন, "জানি—মানুষ, আমার মতই।" চাকরিতেও তাঁর মানবাধিকারবোধ খর্ব হয় নি। এ বিষয় উপলক্ষ করে ম্যাজিস্ট্রেট্ অবশ্য মামলা চালান, রাধানাথের দু'শ' টাকা অর্থদণ্ডও হয়। কিন্তু এ উপলক্ষে যে আন্দোলন হয়, তাতেই এরূপ অন্যায়ও দুঃসাধ্য হয়ে উঠে। বহু বৎসর পরে বাঙলা দেশে ফিরে ইংরেজি-ভাবাপন্ন এই বৈজ্ঞানিক বন্ধু প্যারীচাঁদ মিত্রের সঙ্গে ক্ষুদ্র 'মাসিক পত্রিকা' (খ্রীঃ ১৮৫৪) প্রকাশ করেন। আর তার পাতায় ছিল সরল চলতি কথায় স্ত্রী-দিগের শিক্ষাব্যবস্থা। শোনা যায়, বিদেশে রাধানাথ শিকদার বাঙলা প্রায় ভুলে যেতে বসেছিলেন, তবু নিজেও তিনি বাঙলা লিখলেন। কোন্ বাঙলা যে খাঁটি বাঙলা তা তিনি অভ্রান্তরূপে বুঝেছিলেন। 'মাসিক পত্রিকার' প্রতি সংখ্যা প্রকাশিত হতেই তিনি পরদিন প্রভাতে প্যারীচাঁদ মিত্রের বাড়ী আসতেন, "প্যারী, তোমার স্ত্রী পড়ে কি বললেন?" এই বাস্তব চেতনা ও উত্তম 'ইয়ং বেঙ্গলে'র এক অভিনব বৈশিষ্ট্য—ঘরের কথায় ঘরের মেয়েদের চোখ খুলে দিতে হবে।

(৯) রামতনু লাহিড়ী (১৮১৩-১৮৯৮): শিবনাথ শাস্ত্রীর লিখিত 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' থেকে আমাদের নিকট অনেকটা

পরিচিত হয়ে গিয়েছেন। যুক্তিবাদী জিজ্ঞাসায় কখনো তিনি উদ্দামতা দ্বারা চালিত হন নি। ভাবুক, ভক্ত ব্রাহ্মরূপে সকলের প্রীতি ও শ্রদ্ধাভাজন হয়ে রামতনু লাহিড়ী অনাড়ম্বর শিক্ষক-জীবন যাপন করে গিয়েছেন। অথচ দেবেন্দ্রনাথের বেদ-নির্ভর ব্রাহ্মধর্ম ও খ্রীষ্ট-বিরোধিতার সঙ্গে তাঁর বিরোধিতা ছিল—বেদকে অপৌরুষেয় বলা যুক্তিসিদ্ধ নয় বলে। ১৮৫১ সালেই তিনি এরূপ কারণে উপবীতও ত্যাগ করেন—যে উপবীত রামমোহন ত্যাগ করেন নি, দেবেন্দ্রনাথও যা ত্যাগ করবার জন্ত উৎসাহী ছিলেন না, বরং পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথের উপনয়ন করিয়ে তা অনুমোদন করে যান।

রামতনু লাহিড়ী ব্যতীত ইয়ং বেঙ্গলের শিবচন্দ্র দেব (খ্রীঃ ১৮১১-১৮৯০), হরচন্দ্র ঘোষও (১৮১১-১৮৯০) সেকালের ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ হয়ে দাঁড়ান। কোন্নগরে শিবচন্দ্র দেবের কীর্তি সর্বত্র। হরচন্দ্র ঘোষও রাজকর্মে সততা ও নিষ্ঠার জন্ত প্রসিদ্ধিলাভ করেন।

নিছক বাঙলা লেখার হিসাব নিলে এই 'নব্য বঙ্গে'র কৃতিত্ব সামান্ত, তা দেখেছি। কৃষ্ণমোহন ও প্যারীচাঁদই প্রধান। তা ছাড়া, কোষকার তারাচাঁদ ও 'জ্ঞানান্বেষণের' দক্ষিণানন্দের সঙ্গে রসিককৃষ্ণ, রামগোপাল ঘোষ ও 'মাসিক পত্রিকার রাধানাথের নামই মাত্র করা চলে। প্রায়ই তাঁরা ইংরেজিতে লিখেছেন। তদপেক্ষাও তাঁরা সে যুগে বেশি করেছেন ইংরেজিতে বক্তৃতা। 'পাবলিক লাইফ' বা রাজনৈতিক জীবনের সংগঠন তাঁদের প্রধান কীর্তি। সেই চেতনার উন্মেষ সাহিত্যের ইতিহাসেও সামান্ত ঘটনা নয়—তা প্রথম পরিচ্ছেদেই আমরা বলেছি। ইংরেজি-বাঙলা সংবাদপত্র পরিচালনা ছাড়াও প্যারীচাঁদ ও রাধানাথ প্রভৃতি অবৈতনিক বিদ্যালয় বিস্তারে, এবং প্রায় সকলেই স্ত্রীশিক্ষা, বিধবাবিবাহ প্রবর্তন প্রভৃতি সমাজ-সংস্কারের কর্মে প্রথমাবধি ছিলেন উৎসাহী। তাছাড়া ছিল রাজনৈতিক কাজ। ১৮৩৩-এর সনদ পরিবর্তনকালীন আবেদন-পত্রাদিতে, তারপর (১৮৩৫) প্রেস-স্বাধীনতার পুনরুদ্ধারে ও জুরীপ্রথার বিষয়ে, ভারতীয়দের রাজকর্মে নিয়োগ সম্পর্কে, তাঁদের উদ্যোগ দেখা যায়। ১৮৪৩-এর সময় থেকে 'বেঙ্গল-ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' গঠনে; ১৮৪৯-এ রামগোপাল ঘোষের ইউরোপীয়দের বিচার বিষয়ের বক্তৃতায়, আর শেষে খ্রীঃ ১৮৫৫-এ পুনরায় সনদ পরিবর্তনকালীন আন্দোলনে—'ইয়ং বেঙ্গলে'র সার্থক রূপ দেখতে পাই। অবশ্য খ্রীঃ ১৮৩৯ বা

১৮৪৩-এর সময় থেকে তাঁদের অপেক্ষাও প্রবল শক্তি দেশে জন্মগ্রহণ করে—১৮৩৯-এ 'তত্ত্ববোধিনী সভা' ও ১৮৪৩-এ 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র আবির্ভাব হয়। বাঙালী সমাজে একটা ঝড়ের মত উঠে 'ইয়ং বেঙ্গলের' বিদ্রোহ ক্রমশঃ এ সময়ে শেষ হতে থাকে। রেখে যায় বিদ্রোহের পরিবর্তে একটা নকল বিদ্রোহের জের। মদ্য ও নিষিদ্ধ মাংস ও ইংরেজি বই দিয়ে 'ইয়ং বেঙ্গল' প্রকাশ্যে নিজেদের বলিষ্ঠ বিশ্বাস ঘোষণা করেছিলেন—মিথ্যাচারকে তাঁরা মনেপ্রাণে ঘৃণা করতেন। '(হিন্দু) কলেজের ছেলেরা মিথ্যা বলতে জানে না' —এটি ছিল সেদিনের প্রবাদবাক্য (তাই কি আজও 'লায়ার' বললে আমরা এত চটে যাই ?)। এই সত্য-নিষ্ঠ বিদ্রোহ যখন বিভ্রান্ত হয়ে গেল তখনো মদ্য ও নিষিদ্ধ মাংসের 'কাল্ট্'ই ইংরেজি শিক্ষার লক্ষণ বলে পরিগণিত হচ্ছে। রাজনারায়ণ বসু সেই সময়েরই হিন্দু কলেজের ছাত্র। ইংরেজি শিক্ষা এতটা বৈষয়িক সৌভাগ্য ও সামাজিক সম্মানের বিষয় হয়েছে যে, ধনী ও ভদ্রবংশের অপোগণ্ড মূর্খদের জন্য ইংরেজি স্কুলে তখন 'বাবু-সেক্‌শন' খুলতে হয়। মাতলামি ও বেলেল্লাবৃত্তির জোরেই তারা প্রমাণ করতে ব্যস্ত হয় যে তারা ইংরেজিওয়ালা—'ইংলিশ এজুকেটেড্'। পরবর্তী কালে মাইকেল এবং দীনবন্ধুও এই নকল 'ইয়ং বেঙ্গলে'র চিত্র এঁকেছেন। অপরদিকে সেই পরবর্তী ইংরেজি শিক্ষিতরা মদ্য-মাংসের ব্যাপারে যতটা অসংযত হোক, সামাজিক নিয়ম-কানুনের ব্যাপারে প্রকাশ্যে পূর্বজদের মত অসংযত হল না—একটা আপোষ রফার পথ তারা গ্রহণ করল। অর্থাৎ যে মিথ্যাচার ছিল 'ইয়ং বেঙ্গলের নিকট সর্বথা ত্যাজ্য, তাই হল পরবর্তীদের একটা পুঁজি। সম্ভবত এদের এই মিথ্যাচার অসহ্য ঠেকেছিল বলেই 'তত্ত্ববোধিনীর' সুশৃঙ্খল ও সংযত শিক্ষাদর্শকেও মিথ্যাচারের প্রশ্রয়স্বরূপ মনে করে কৃষ্ণমোহন প্রভৃতি 'অর্ধসংস্কারবাদ' বলে ব্যঙ্গ করতেন। বলা প্রয়োজন, 'ইয়ং বেঙ্গলের' মাতলামির কাল্টের বিরুদ্ধে ক্রমশ সুস্থ মত সৃষ্টি করেন প্যারীচরণ সরকার ও প্যারীচাঁদ মিত্র, পরে কেশবচন্দ্রের প্রচারে ব্রাহ্মসমাজ সুরাবর্জনকেও প্রায় একটা গোঁড়ামিতে পরিণত করে, এখনো পর্যন্ত সেই ব্রাহ্ম-বিচারের বশেই বাঙালী ভদ্রসমাজে সুরা স্পর্শও দূষণীয় বলে গণ্য।

অবশ্য বাঙালীর নিজ এলেকার বাইরে এ কালের সর্বাপেক্ষা বড় ঘটনা হল ইংরেজির স্বপক্ষে মেকলের সিদ্ধান্ত ও বেন্টিঙ্ক কর্তৃক ইংরেজি ভাষা শিক্ষা

প্রবর্তনের নির্দেশ দান (খ্রীঃ ১৮৩৫)। তাতেই একদিক দিয়ে রক্ষণশীলদের পরাজয় সুস্থির হয়, এবং কতকাংশে 'ইয়ং বেঙ্গলে'র আশা পূরণের পথ হয়। তারপর খ্রীঃ ১৮৩৮-এ আপিস-আদালতে ফারসির পরিবর্তে বাঙলার আংশিক প্রচলনের সিদ্ধান্ত হয়। ইংরেজি শিক্ষিত ভারতীয়রা ১০০৲ টাকার অধিক বেতনের চাকরিলাভ করতে পারবে না, কর্নওয়ালিসের এরূপ নির্দেশ ছিল। এখন সে বাধা দূর করা হল;—শিক্ষিতদের পক্ষে এখন বেশি বেতনের চাকরিও জুটবে। ১৮৩৮ থেকে ফারসির প্রভাব প্রতিপত্তি আরও কমে, অন্যদিকে যে বাঙলা ইতিমধ্যে ফারসির প্রভাব মুক্ত হয়েছিল আইন-আদালতেও সেই সংস্কৃতাভিমুখিনী ভাষার প্রসার বৃদ্ধি পায়। অন্য দিকে ইংরেজি শিক্ষিতরা ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি বৈষয়িক বৃত্তি ত্যাগ করে এখন সরকারি চাকরিতে বেশি আকৃষ্ট হলেন। তাতে অবশ্য রাজকার্যে সততার ও ন্যায়নিষ্ঠার বিশেষ প্রসার ঘটে। কিন্তু এর ফলে বাঙালী শিক্ষিত শ্রেণী 'চাকুরে শ্রেণীতে' পরিণত হতে লাগল—শিক্ষিতের সাহিত্য চাকুরিজীবীর ভদ্র ও পোষমানা প্রাণের সাহিত্য হয়ে উঠবার সম্ভাবনা দেখা দিল। আমাদের 'ঔপনিবেশিক সাহিত্যের' চরিত্রে অনেকটাই এই চাকরির পরোক্ষ প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়, তা ভুলবার নয়—১৮৩৮-এর ব্যবস্থা তা অবশ্যম্ভাবী করে তোলে।

সাহিত্যের ক্ষেত্র

কাজেই, বাংলা সাহিত্যের দিক থেকে 'ইয়ং বেঙ্গলে'র পূর্বে ইয়ং বেঙ্গলের প্রথম নিজস্ব দান 'জ্ঞানান্বেষণ'। (১) 'জ্ঞানান্বেষণের সম্পাদকীয় ভার ছিল পরবর্তী কালের 'সম্বাদ ভাস্করের' সম্পাদক, প্রসিদ্ধ উদারমতাবলম্বী পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ বা গুড়গুড়ে ভট্টাচার্যের উপর। তিনিই এ পত্রের শিরোভূষণ বা 'মটো'র রচয়িতা :

এহি জ্ঞান মনুষ্যাণামজ্ঞানতিমিরহর।
দয়া সত্যঞ্চ সংস্থাপ্য শঠতামপি সংহর॥

প্রথম সংখ্যায় (১৮ই জুন, ১৮৩১) এর উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন বিবৃত হয়েছিল তা এরূপ :

"এক প্রয়োজন এই যে, এতদ্দেশীয় বিশিষ্ট সন্তান মহাশয়েরা লোকের

প্রপঞ্চ বাক্যেতে প্রতারিত হইতেছেন তাহাতে তাঁহারদিগের কোনরূপেই ভাল হইবার সম্ভাবনা না দেখিয়া খেদিত হইয়া বিবেচনা করিলাম যে নানা দেশ প্রচলিত বেদবেদান্ত মনুস্মিতাক্ষরা প্রভৃতি গ্রন্থের আলোচনা দ্বারা তাহারদিগের ভ্রান্তি দূর করিতে চেষ্টা করিব।

দ্বিতীয়তঃ এই যে এতদ্দেশনিবাসি অনেকেই আপন ২ জাতিবিহিত ধর্মের প্রতি-জিজ্ঞাসা করিলে যথাশাস্ত্রানুসারে কহিয়া থাকেন কিন্তু সেই মহাশয়েরা এমত কর্ম করেন যে তাহা বিশিষ্ট লোকেরই কর্তব্য নহে ইহার কারণ কি, তাহাও বিবেচনা করিতে হইবেক।

তৃতীয়তঃ এই যে ভূগোল প্রভৃতি গ্রন্থ যদ্যপি এতদ্দেশে দেশান্তরীয় ও বঙ্গদেশীয় ভাষায় নানাপ্রকারে প্রকাশ হইয়াছে তথাপি সে অতিবিস্তারিত রূপ প্রচার হয় নাই অতএব সকলের আশুবোধের নিমিত্তে সেই সকল গ্রন্থ আমরা বঙ্গদেশীয় ভাষায় ক্রমে ২ প্রকাশ করিব। এবং অন্য ২ বিষয় যাহা প্রকাশ করা আবশ্যক তাহাও উপস্থিতানুসারে প্রকাশ করিতে ত্রুটি করিব না ইতি।"

বাঙলা সাময়িক পত্রের পাতাতেই গদ্য চলতে শিখছে—তবে এ গদ্য পা ফেলছে থপ্ থপ্ করে। 'সমাচার দর্পণে' সুদক্ষ বাঙলা লেখকরাই তখন লিখতেন, তার গদ্যের সঙ্গে তুলনা করলেই দেখব 'জ্ঞানান্বেষণের' গদ্যও প্রশংসনীয়। এ সময়কার 'জ্ঞানোদয়ে' (মাসিক) সমাজ-সংস্কার ও জ্ঞান-বিস্তারের বিপুল প্রয়োজনেই ইংরেজিওয়ালারা অনভ্যস্ত হাতে কলম তুলে নিয়েছিলেন। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাবের তুলনায় ইয়ং বেঙ্গলের এই দান সামান্য। 'জ্ঞানোদয়' (খ্রীঃ ১৮৩১-৩২) তরুণ শিক্ষার্থীদের জন্য প্রচারিত মাসিকপত্র হিসাবে উল্লেখযোগ্য।

(২) সে পর্বের প্রধান ঘটনা বরং **'সম্বাদ প্রভাকরের'** (খ্রীঃ ১৮৩১) মারফৎ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের আত্মপ্রকাশ, তাতে বাঙলা পদ্যের নূতন পত্তন হয়। 'প্রভাকরের' প্রথম প্রকাশ সাপ্তাহিক রূপে ২৮শে জানুয়ারী, ১৮৩১ (১৫ই মাঘ, ১২৩৭ বাং সাল)। পাথুরিয়াঘাটার যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুর ছিলেন তার পৃষ্ঠ-পোষক—এবং 'তৎপ্রকাশক' হিন্দুধর্মনাশেচ্ছুদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পারেন'—প্রথম সংখ্যা দেখে 'চন্দ্রিকা' এরূপ সিদ্ধান্ত করেন। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 'স্বদেশীয়' ভাবে উদ্বুদ্ধ হলেও উন্নতিকামীও ছিলেন,—প্রারম্ভে হয়ত

প্রভাকর 'ইয়ং বেঙ্গলের' বিপক্ষেই ছিল। তার লেখকদের তালিকায় পরবর্তী কালে (১২৫৪, ২রা বৈশাখ) সকল মতের লেখকেরই নাম দেখতে পাই। 'প্রভাকরের' প্রথম পর্ব দেড় বৎসর স্থায়ী হয়। অতএব, ১৮৩২-এর মধ্য ভাগ থেকে ১৮৩৬ পর্যন্ত তার নাম আর নেই। দ্বিতীয় পর্বের 'সম্বাদ প্রভাকর' ১৮৩৬ সনের ১০ই আগষ্ট (২০শে শ্রাবণ, ১২৪৩) বারত্রয়িক রূপে প্রকাশিত হয়। (প্রথম পর্বের 'প্রভাকর' আজ আর পাওয়া যায় না—এমন কি, ১২৪৭-এর পূর্বের 'প্রভাকর'ও প্রায় দুর্লভ)। ১৮৩৯ সনের ১৪ই জুন তা দৈনিক হল —আর বাঙলা ভাষায় 'প্রভাকর' প্রথম দৈনিক পত্র। এ সময় থেকে তার গৌরব অম্লান থাকে—সেকালের গণ্যমান্য লোকেরা তার লেখক ছিলেন। কিন্তু আজকের দিনে 'প্রভাকর' সর্বাধিক স্মরণীয় তার ১৮৫৩ সন থেকে প্রকাশিত মাসিক সংস্করণের জন্য—সেই মাসপয়লা কাগজগুলিতে শুধু সংবাদের সারমর্ম নয়, ঈশ্বর গুপ্ত নীতিকাব্য ও প্রাচীন লেখকদের জীবনী প্রকাশ করেছিলেন। অবশ্য 'সম্বাদ প্রভাকরে'ও 'কলেজীয় কবিতাযুদ্ধের' যুগ আসে এই ১৮৪৩-এর পরে। নিশ্চয়ই গুপ্ত কবি মৌলিক সাহিত্যকার। গদ্যে তিনি ভারতচন্দ্র প্রমুখ যে সব পুরাতন লেখকের জীবনী সংকলন করেন আজও তা আমাদের বিশেষ অবলম্বন—সেই সূত্রে আমরাও তাঁর গদ্য লেখা উদ্ধৃত করেছি। কিন্তু অনুপ্রাস, দীর্ঘ বাক্য ও আলঙ্কারিক শব্দযোজনার দোষে সে গদ্য প্রায়ই প্রাঞ্জল নয়। 'গুপ্তকবির' গদ্য—গদ্য সাহিত্যের গদ্য নয়। অথচ তাঁর সেই কবি-জীবনীসমূহ বিষয় গৌরবে মহামূল্য। অবশ্য 'সম্বাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয়' (খ্রীঃ ১৮৩৫) বাঙলা ভাষায় প্রথম সাহিত্যিক মাসিক পত্র চালনার চেষ্টা। পরে তা সাপ্তাহিক পত্রে রূপান্তরিত হয়। বাঙলা মাসিক পত্র বাঙলা সাহিত্যের আসর হতে থাকে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ' (খ্রীঃ ১৮৫১) ও প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদারের 'মাসিক পত্রে'র (খ্রীঃ ১৮৫৪) সময় থেকে। আসলে 'বঙ্গদর্শনে'রই (খ্রীঃ ১৮৭২) কীর্তি—'সাহিত্যপত্রের ইতিহাস সৃষ্টি।

(৩) প্রসন্নকুমার ঠাকুরের উৎসাহে বাঙলার রঙ্গমঞ্চ গঠনের চেষ্টাও খ্রীঃ ১৮৩১-এ আরম্ভ হয়। কিন্তু পরবর্তী অভিনীত বই প্রায়ই ছিল পদ্য ও গীতবহুল। নাট্যপ্রসঙ্গেই পরবর্তী পরিচ্ছেদে নাটকের গদ্যও আলোচ্য।

(৪) গদ্যগ্রন্থের দিক থেকে অবশ্য মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'প্রবোধ চন্দ্রিকা'

এ সময়েই প্রকাশিত (খ্রীঃ ১৮৩৩-এ প্রকাশিত, লিখিত খ্রীঃ ১৮১৩ ?) হয় এবং তার প্রভাব অনেককাল অক্ষুণ্ণ থাকে (পূর্বে দ্রষ্টব্য)। তাছাড়া কালী-প্রসন্ন কবিরাজের 'চন্দ্রকান্ত' (খ্রীঃ ১৮২২) গদ্যে পদ্যে রচিত হয়েছিল। কালীকৃষ্ণ দাস রচিত এক জাতীয় এ্যাডভেঞ্চার গল্প 'কামিনীকুমার' খ্রীঃ ১৮৩৬-এ রচিত হয়। সাহিত্যের রুচি গঠনের পূর্বে আদিরস অনেকদিন সাহিত্যরস বলে চলেছে। এ সব গ্রন্থে আধুনিক উপন্যাসের বীজ অন্বেষণ করা অপেক্ষা পূর্বযুগের ফারসি রম্য উপাখ্যানের জের দেখাই সমুচিত পর অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য)।

(৫) এ পর্বেও পাঠ্যপুস্তকই প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে প্রধান। সাহিত্য ও বিজ্ঞানের নানা শাখার গ্রন্থ কখনো সংকলিত কখনো অনূদিত হয়েছে। তার মধ্যে ইতিহাসও ছিল (পূর্বে দ্রষ্টব্য)। অথচ সে পর্বেই প্রিন্‌সেপ্‌ ব্রাহ্মীলিপির পাঠোদ্ধার করেছেন, ইংরেজিতে প্রাচীন ভারতের গৌরব পুনরুদ্ধার আরম্ভ হয়েছে কিন্তু বাংলায় তার চিহ্ন প্রায় দেখা যায় না।

(৬) পাঠ্যপুস্তক ছাড়া প্রকাশিত হচ্ছিল প্রধানতঃ প্রচার-গ্রন্থ—পাদ্রিরাই তাতে উদ্যোগী। কিন্তু সে যুগের প্রধান পাদ্রি ডাফ্‌-এর প্রভাব প্রধানত বিস্তৃত হয়েছিল ইংরেজির মারফতে ইংরেজি শিক্ষিতের মধ্যেই।

প্রচার-রচনা অপেক্ষা সাহিত্যগঠনে অনুবাদ-রচনার গুরুত্ব বেশি। পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও সাহিত্য অনুবাদ আরম্ভ হয়েছিল—ফেলিক্স কেরির 'পিলগ্রিমস্‌ প্রোগ্রেস'-এর অনুবাদের কথা পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে। তবে এর মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য টম পেন-এর 'এজ অব রিজন'-এর অনুবাদ (খ্রীঃ ১৮৩৪)। টম পেন বিপ্লবের দূত। তাঁর ইংরেজি লেখা সেদিনের ইয়ং বেঙ্গলকে' পাগল করেছিল। বাঙলা অনুবাদে তার কি ফল হয়েছিল আর অনুবাদ কিরূপ হয়েছিল জানবার উপায় নেই। ইংরেজি ছাড়া, সংস্কৃত থেকে ও ফারসি থেকেও অনুবাদের চেষ্টা দেখা যায়।

পর্ব-পরিশিষ্ট

(১) অনুবাদ গ্রন্থ :

অনুবাদের সাহিত্য দিয়েই বাঙলা গদ্যের প্রথম দিক পরিপুষ্ট হয়েছে। এর মধ্যে প্রধানত পাওয়া যায় তিন ধরণের অনুবাদ—(১) প্রচারমূলক অনুবাদ—ইংরেজি বা অন্ত পাশ্চাত্ত্য ভাষা

এ সময়েই প্রকাশিত (খ্রীঃ ১৮৩৩-এ প্রকাশিত, লিখিত খ্রীঃ ১৮১৩ ?) হয় এবং তার প্রভাব অনেককাল অক্ষুণ্ণ থাকে (পূর্বে দ্রষ্টব্য)। তাছাড়া কালী-প্রসন্ন কবিরাজের 'চন্দ্রকান্ত' (খ্রীঃ ১৮২২) গদ্যে পদ্যে রচিত হয়েছিল। কালীকৃষ্ণ দাস রচিত এক জাতীয় এ্যাডভেঞ্চার গল্প 'কামিনীকুমার' খ্রীঃ ১৮৩৬-এ রচিত হয়। সাহিত্যের রুচি গঠনের পূর্বে আদিরস অনেকদিন সাহিত্যরস বলে চলেছে। এ সব গ্রন্থে আধুনিক উপন্যাসের বীজ অন্বেষণ করা অপেক্ষা পূর্বযুগের ফারসি রম্য উপাখ্যানের জের দেখাই সমুচিত পর অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য)।

(৫) এ পর্বেও পাঠ্যপুস্তকই প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে প্রধান। সাহিত্য ও বিজ্ঞানের নানা শাখার গ্রন্থ কখনো সংকলিত কখনো অনূদিত হয়েছে। তার মধ্যে ইতিহাসও ছিল (পূর্বে দ্রষ্টব্য)। অথচ সে পর্বেই প্রিন্‌সেপ্‌, ব্রাহ্মীলিপির পাঠোদ্ধার করেছেন, ইংরেজিতে প্রাচীন ভারতের গৌরব পুনরুদ্ধার আরম্ভ হয়েছে কিন্তু বাংলায় তার চিহ্ন প্রায় দেখা যায় না।

(৬) পাঠ্যপুস্তক ছাড়া প্রকাশিত হচ্ছিল প্রধানতঃ প্রচার-গ্রন্থ —পাদ্রিরাই তাতে উদ্যোগী। কিন্তু সে যুগের প্রধান পাদ্রি ডাফ্‌-এর প্রভাব প্রধানত বিস্তৃত হয়েছিল ইংরেজির মারফতে ইংরেজি শিক্ষিতের মধ্যেই।

প্রচার-রচনা অপেক্ষা সাহিত্যগঠনে অনুবাদ-রচনার গুরুত্ব বেশি। পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও সাহিত্য অনুবাদ আরম্ভ হয়েছিল—ফেলিক্‌স কেরির 'পিলগ্রিমস্‌ প্রোগ্রেস'-এর অনুবাদের কথা পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে। তবে এর মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য টম পেন-এর 'এজ অব রিজন'-এর অনুবাদ (খ্রীঃ ১৮৩৪)। টম পেন বিপ্লবের দূত। তাঁর ইংরেজি লেখা সেদিনের ইয়ং বেঙ্গলকে' পাগল করেছিল। বাঙলা অনুবাদে তার কি ফল হয়েছিল আর অনুবাদ কিরূপ হয়েছিল জানবার উপায় নেই। ইংরেজি ছাড়া, সংস্কৃত থেকে ও ফারসি থেকেও অনুবাদের চেষ্টা দেখা যায়।

পর্ব-পরিশিষ্ট

(১) অনুবাদ গ্রন্থ :

অনুবাদের সাহিত্য দিয়েই বাঙালা গদ্যের প্রথম দিক পরিপুষ্ট হয়েছে। এর মধ্যে প্রধানত পাওয়া যায় তিন ধরণের অনুবাদ—(১) প্রচারমূলক অনুবাদ—ইংরেজি বা অন্ত পাশ্চাত্ত্য ভাষা

থেকে, প্রচারমূলক অনুবাদ—সংস্কৃত বা ঐরূপ ভারতীয় ভাষা থেকে। দর্শনের বই-এর অনুবাদও এ শাখায় ধরা যেতে পারে। (২) পাঠ্যপুস্তক জাতীয় অনূদিত সাহিত্য ছাড়াও ভূগোল, ইতিহাস, প্রাকৃত-বিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের বইও অনূদিত হয়েছিল। (৩) সাহিত্য গ্রন্থের অনুবাদ—সংস্কৃত সাহিত্য গ্রন্থের অনুবাদ বা সংকলনই বেশি প্রকাশিত হয়েছে। তবে ইংরেজি সাহিত্য পুস্তকের অনুবাদও ক্রমশ দেখা দেয়। এসব অনুবাদ গদ্যেও হ'ত পদ্যেও হ'ত। উল্লেখযোগ্য সাহিত্যের অনুবাদ বলা যেতে পারে ফেলিক্স কেরির কৃত Bunyan-এর 'Pilgrim's Progress' (১৮২৯), Tom Paine-এর 'Age of Reason'-এর অনুবাদ (১৮৩৪)। Edward Forster কৃত 'Arabian Nights'-এর অনুবাদ, নাম 'আরবীয় উপন্যাস'। Ed. Forster কৃত Lamb রচিত Tales from Shakespeare-এর অনুবাদ এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। পরবর্তী কালে অনূদিত হয় জনসনের Rasselas (তারাশঙ্কর কবিরত্ন)। রাসেলাস প্রথম অনুবাদ করেছিলেন পদ্যে, খ্রীঃ ১৮৩৪এ, রাজা কালীকৃষ্ণ ঠাকুর। রামকমল ভট্টাচার্য কৃত Bacon-এর Essays-এর অনুবাদ 'বেকনের সন্দর্ভ' (খ্রীঃ ১৮৬১), দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ Advancement of Learning-এর অনুবাদ করেন 'সুবুদ্ধিব্যবহার' নামে। রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত (ফরাসী কবি) Fenelon-এর অনুবাদ 'টেলিমেকস্' (১৮৫৮-১৮৬০)। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য কৃত 'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ' (Romance of History অবলম্বনে) ও 'পৌল ও ভর্জিনি' (Paul & Virginia, 1868-69) প্রভৃতি বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে। স্বয়ং বিদ্যাসাগরও সেক্সপীয়রের Comedy of Errors-এর অনুবাদ করেছেন 'ভ্রান্তিবিলাস' নামে। নীলমণি বসাকের 'পারস্য ইতিহাস' (খ্রীঃ ১৮৩৪) ইংরেজি থেকে অনূদিত। বিশ্বেশ্বর দত্ত সাহনামার গদ্যানুবাদ (খ্রীঃ ১৮৪৭) করেছিলেন।

পরবর্তী কালেও বহু অনুবাদ প্রকাশিত হয়। বাঙলায় সাহিত্যসৃষ্টি আরম্ভ হলে অনুবাদের গুরুত্ব আর বেশি থাকে না। অবশ্য খ্রীঃ ১৮৫১ অব্দে 'ভার্নাকিউলার লিটারেচর কমিটি' বা বঙ্গানুবাদক সমাজ গঠিত হয়—তারই আনুকূল্যে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ' নামক মাসিক পত্রিকা খ্রীঃ ১৮৫১ থেকে প্রকাশিত হতে থাকে (দ্রঃ সুকুমার সেন—বাঃ সাঃ গদ্য, পৃঃ ১১৩), ঐ সমিতির আনুকূল্যে প্রকাশিত হয় মেকলের 'লর্ড ক্লাইব' (খ্রীঃ ১৮২৫), 'রবিন্সন্ ক্রুসোর ভ্রমণবৃত্তান্ত', এডবার্ড রোএর (Edward Roe) কৃত ল্যাম্বের সেক্সপীয়রের গল্পের অনুবাদ (খ্রীঃ ১৮৫৩), Anderson-এর শিশুপাঠ্য গল্পের মধুভূষণ মুখোপাধ্যায় কৃত অনুবাদ (খ্রীঃ ১৮৫৯) প্রভৃতি।

(২) ভাষারূপ-স্থিরীকরণ

বাঙলা সাহিত্যের মূল ভিত্তি, তার ভাষার অন্বয় প্রভৃতি, রূপ ও বর্ণবিন্যাস পদ্ধতি খ্রীঃ ১৮০০ অব্দের পূর্বে মোটেই সুস্থির ছিল না। এমনকি, 'প্রবোধ চন্দ্রিকা'-র সমস্ত শুধু ভাষা প্রয়োগের ত্রুটিই নয়, সংস্কৃত শব্দেরও বর্ণাশুদ্ধি দেখা যায়। এ বিষয়ে ফোর্ট উইলিয়মের পণ্ডিতেরাও নিরঙ্কুশ ছিলেন। যে সব কারণে ফারসির পরিবর্তে সংস্কৃতের সঙ্গে বাঙলা ভাষার যোগাযোগ পাকাপাকি গ্রাহ্য হল সে সবের মধ্যে প্রধান উল্লেখযোগ্য হচ্ছে অভিধানকার ও বৈয়াকরণদের কাজ, আর নিশ্চয়ই মুদ্রাযন্ত্রের নীতিশৃঙ্খলা। কয়েকটি প্রধান ঘটনা মাত্র উল্লেখ করা হল :

১। হালহেড্-এর বাঙলা ব্যাকরণে (খ্রীঃ ১৭৭৮) বাঙলাকে ফারসির প্রভাবিত বিকৃতি থেকে মুক্ত করবার ইঙ্গিত প্রথম দেখা যায়। ২। ফরস্টার-এর Vocabularyর (খ্রীঃ ১৭৯৯) ভূমিকায় একথা আরও জোর দিয়ে বলা হয়। ৩। কেরি দিনের পর দিন এই সত্যই বোঝেন—সংস্কৃতের সঙ্গেই বাঙলার প্রাণের যোগ।

অর্থ ও বানান নির্ণয়ে সে সময়কার কয়েকটি প্রধান ঘটনা—অভিধান রচনা : (i) Thakur's Bengali-English Vocabulary (খ্রীঃ ১৮০৫) (ii) পীতাম্বর মুখোপাধ্যায়ের শব্দসিন্ধু (খ্রীঃ ১৮০৯) (অমরকোষের অনুবাদ) (iii) কেরির অভিধান—৭৫ হাজার শব্দের ইংরেজি-বাঙলা অভিধান (খ্রীঃ ১৮১৫-১৮২৫)। (iv) মার্শম্যান উক্ত অভিধানের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশ করেন—খ্রীঃ ১৮২৭। (v) রামচন্দ্রের অভিধান (খ্রীঃ ১৮১৮), স্কুল বুক সোসাইটি প্রকাশিত, শব্দসংখ্যা ৬৫০০ মাত্র। এখানা পাদ্রি লঙ্-এর মতে প্রথম বাঙালী-কৃত অভিধান। সম্ভবত এর থেকে আরবী-ফারসি শব্দ পরিত্যক্ত হয়েছিল। (vi) তারাচাঁদ চক্রবর্তীর ইংরেজি-বাঙলা অভিধান (৭৫০০ শব্দ), খ্রীঃ ১৮২৭-এ প্রকাশিত। (vii) মার্শম্যানের বাঙলা-ইংরেজি ও ইংরেজি-বাঙলা ২৫০০০+২৫০০০ শব্দ, খ্রীঃ ১৮২৯ (?)। (viii) মেন্ডিস্-এর (Mendis-এর) ইংরেজি-বাঙলা অভিধান (জনসন-এর ইংরেজি অভিধানের ভিত্তিতে)—খ্রীঃ ১৮২৮। (ix) Haughton's (হটনের) বাঙলা-ইংরেজি অভিধান, খ্রীঃ ১৮৩৩। রামকমল সেনের (৫৮ হাজার শব্দের) ইংরেজি-বাঙলা অভিধান—খ্রীঃ ১৮৩৪।

ব্যাকরণের মধ্যে প্রধান উল্লেখযোগ্য : (১) হালহেড্ (ইং ১৭৭৮) (২) কেরি (ইং ১৮০১) (৩) কীথ্-এর বাঙলা ব্যাকরণ (স্কুলপাঠ্য, ইং ১৮২০) (৪) রামমোহনের ইংরেজিতে লেখা ব্যাকরণ (ইং ১৮২৬) ও তার বাঙলা রূপ (৫) গৌড়ীয় ভাষার ব্যাকরণ (ইং ১৮৩২ ?)

এ সব ব্যাকরণ অভিধানে বানান ও শব্দার্থ স্থির হতে থাকে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কালে আর সে সব ভ্রমের চিহ্ন বিশেষ থাকে না। অবশ্য ভাষার সারল্য সাধিত করার প্রয়োজন তখনো যথেষ্ট ছিল।

॥ ৪ ॥ বিদ্যাসাগরের পর্ব : বাঙলা গদ্যের প্রতিষ্ঠা :

(খ্রীঃ ১৮৪৩-খ্রীঃ ১৮৫৭)

পর্বের পরিচয়

প্রায় একশত বৎসর পূর্বে খ্রীঃ ১৮৫৬ অব্দের (১৭৭৮ শকাব্দের) 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়' রাজনারায়ণ বসু (খ্রীঃ ১৮২৬-খ্রীঃ ১৮৯০) বাঙলা ভাষা সম্বন্ধে আলোচনাকালে লিখিয়াছেন, "১০।১২ বৎসর পূর্বে বাঙ্গালা ভাষাতে বিবিধ বিষয়ে প্রস্তাব রচনা করা যেরূপ কঠিন বোধ হইত এক্ষণে সেরূপ

কঠিন বোধ হয় না। এই পরমোপকার জন্ত পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নিকট ও শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল মিত্র ইত্যাদি কতকগুলি সবিদ্যাশালী স্বদেশ-হিতৈষী মহাশয়দিগের নিকট এই দেশ কৃতজ্ঞতা-ঋণে বদ্ধ আছে।" এই কথাটি পাঠ করেও প্রথমেই আমরা অনুভব করি—গদ্যের ভাষা কেরির যুগ, রামমোহনের যুগ, এমন কি, 'সম্বাদ প্রভাকরে'র প্রভাব কাটিয়ে অন্ত এক যুগে উত্তীর্ণ হয়েছে। তবে বাঙলা গদ্যের যথোচিত বিকাশ এবার সুস্থির এখনো (১৮৫৬তে) তা বলা চলবে না। প্রকৃতপক্ষে একশত বৎসর পরেও (১৯৫৬) বলতে পারি না বাঙলা গদ্যের যথোচিত বিকাশ ঘটেছে। কিন্তু খ্রীষ্টীয় ১৮৫৬ অব্দের এই বাঙলা দেখে বুঝতে পারি—বাঙলা গদ্যের রূপ অনেকটা সুস্থির হয়েছে, তার বিকাশ-পথ এখন অস্পষ্ট নয়। 'দশ বার বৎসরের' মধ্যে যে তখন এদিকে সত্যই বিশেষ উন্নতি ঘটেছে তাতে সন্দেহ নেই। এটি 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার' বা বিদ্যাসাগরের পর্বের ফল।

সমসাময়িক যাঁদের নাম এ প্রসঙ্গে রাজনারায়ণ বসু উল্লেখ করেছেন তাঁদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্রের (খ্রীঃ ১৮২০-খ্রীঃ ১৮৯১) প্রথম গ্রন্থ 'বেতাল পঞ্চবিংশতি প্রকাশিত হয় ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে (১৯০৩ সম্বতে)। অক্ষয়কুমার দত্তের (খ্রীঃ ১৮২০-খ্রীঃ ১৮৮৬) প্রথম গ্রন্থ 'তত্ত্ববোধিনী সভার' (খ্রীঃ ১৮৩৯) প্রকাশিত ছাত্রপাঠ্য ভূগোল প্রকাশিত হয় ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে। দু জনাই 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার' প্রধান দুই লেখক। কিন্তু রাজেন্দ্রলাল মিত্রের (খ্রীঃ ১৮২২-খ্রীঃ ১৮৯১) মাসিক পত্র 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে প্রকাশিত হতে থাকে। রাজনারায়ণ বসু আরও যে দু'একজন সমসাময়িকের নাম করতে পারতেন, তার মধ্যে 'ইয়ং বেঙ্গলের কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (খ্রীঃ ১৮১৩-খ্রীঃ ১৮৮৫) একজন। বাঙলা গদ্যের বিকাশে তাঁকে বাদ দিলেও পরবর্তী কালের হিসাব সম্মুখে থাকলে রাজনারায়ণ বসু নিশ্চয়ই বলতেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (খ্রীঃ ১৮১৭-খ্রীঃ ১৯০৫) শুধু 'তত্ত্ববোধিনীর' প্রতিষ্ঠাতা নন, তাঁর 'আত্মচরিতের' জন্ত বাঙলা গদ্যের অসামান্ত লেখক এবং প্যারীচাঁদ মিত্রও ('টেকচাঁদ ঠাকুর', খ্রীঃ ১৮১৪-১৮৮৩) 'আলালের ঘরের দুলালের' লেখক হিসাবে কথা-মূলক বাঙলা স্বচ্ছন্দ গদ্যের প্রথম শিল্পী। অভিনয়ের উদ্দেশ্যে বাঙলা নাটক রচনায়ও তখন তাগিদ পড়েছে—'কুলীনকুল-সর্বস্ব' প্রভৃতির বাক্যালাপে কথিত বাঙলার রূপ লক্ষিত না হয়ে পারে না। অবশ্য

অন্য দিকে বিদ্যাসাগরের অনুগামী, 'সংস্কৃত কলেজের ছাত্ররা' অনেকে তখন বাঙলা লেখায় হাত দিচ্ছেন। এঁদের আদর্শ ছিল বিদ্যাসাগরের রচনা অপেক্ষাও বিদ্যাসাগরের অভিমত, সেই সংস্কৃতপুষ্ট ভাষা। তা ছাড়া, পুরাতন হিন্দু কলেজের নূতন 'ছাত্ররা' (কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, রাধানাথ শিকদার প্রভৃতি 'ইয়ংবেঙ্গল' ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও হিন্দু কলেজেরই পূর্বপর্যায়ের ছাত্র), মধুসূদনের সহপাঠী রাজনারায়ণ বসু (খ্রীঃ ১৮২৬ ১৯০০) ও ভূদেব মুখোপাধ্যায় (খ্রীঃ ১৮২৫-১৮৯৪) বাঙলা রচনায় অগ্রসর হয়েছেন। তাঁরা ইংরেজি-পড়া কৃতী যুবক, সংস্কৃত গদ্যসাহিত্য অপেক্ষা ইংরেজি গদ্য-সাহিত্যের গুণাবলীই তাঁদের লক্ষ্য হওয়া স্বাভাবিক, আর তাই হয়েছিল।

(১) জাগরণের যুগের উন্মেষ

আসল কথা, বাঙলা সাহিত্যের 'প্রস্তুতির পর্ব' তখন (১৮৫৮) সম্পূর্ণ হয়ে আসছে। তাই কেউ যদি খ্রীঃ ১৮৪৩ থেকে খ্রীঃ ১৮৫৭ বা ১৮৫৮ কালকে 'বাঙলার রিনাইসেন্সে'র উন্মেষকাল বলেন, তা হলেও ভুল হবে না—অনেকে এরূপ গণনাই অনুমোদন করেন। রাজনারায়ণ বসুর কথিত এই '১০।১২ বৎসরকে' (খ্রীঃ ১৮৪৩-এ) 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রথম প্রকাশকাল থেকে না ধরে (খ্রীঃ ১৮৩৯-এর) 'তত্ত্ববোধিনী সভার' প্রতিষ্ঠাকাল থেকেও ধরা যায়—অবশ্য খ্রীঃ ১৮৩৮ থেকে খ্রীঃ ১৮৪৩-এর মধ্যে 'প্রভাকরের' পুনঃপ্রকাশ ব্যতীত উল্লেখযোগ্য কোনো সাহিত্যিক প্রকাশ নেই। সাহিত্যে তা ঈশ্বর গুপ্তের 'সম্বাদ প্রভাকরের' কাল। সমাজে তা 'ইয়ং বেঙ্গলের' কাল, ভাব-বিপর্যয়ের ঘূর্ণি তখন প্রবল। খ্রীঃ ১৮৩৮-এর সময় থেকে প্রশাসনিক পরিবর্তনও ঘটছিল, তা দেখেছি। খ্রীষ্টধর্মের আক্রমণের বিরুদ্ধে 'তত্ত্ববোধিনী সভা' এবং বাঙলা শিক্ষার প্রয়োজনে 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা' প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল, এ ঘটনাও সামান্য নয়। ১৮৪৩-এ 'ইয়ং বেঙ্গলের' প্রাথমিক উদ্দামতার শেষে এই আত্ম-সংগঠনের প্রয়াসই ক্রমশ 'ইয়ং বেঙ্গলের' ও অন্যান্যের মধ্যে সুস্থির হয়। রাজনৈতিক দৃষ্টির স্পষ্ট প্রমাণও পাওয়া যায় ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে—তা আমরা উল্লেখ করেছি। এ রাজনৈতিক চেতনার আরো পরিচয় আমরা গ্রহণ করছি। রাজনীতি ছাড়া সমাজনীতিতে আসে তত্ত্ববোধিনীর জিজ্ঞাসার ও বিধবা-বিবাহের আন্দোলন।

শিক্ষাতেও আসে নতুন সম্ভাবনার কাল। মোট কথা খ্রীঃ ১৮৪৩ থেকে খ্রীঃ ১৮৫৭-৫৮ (সিপাহী যুদ্ধ) পর্যন্ত প্রায় পনেরো বৎসর কালকে বাঙলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসে আধুনিক যুগের 'উন্মেষ-কালও' বলা যায়। অবশ্য তা বলে পূর্বেকার খ্রীঃ ১৮০০ থেকে খ্রীঃ ১৮৪৩ পর্যন্ত কাল থেকেও এ পর্ব বিচ্ছিন্ন নয়, বরং সামাজিক-রাজনৈতিক অর্থে ১৮৩১-১৮৪৩এর 'ইয়ং বেঙ্গলের' কালের এইটিই হল পরিণত রূপ। আবার পরবর্তী ১৮৫৮-৫৯এর প্রারব্ধ সৃষ্টি-সমারোহের কাল থেকেও এ পর্ব বিচ্ছিন্ন নয়। আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ও খ্রীঃ ১৮৫৬-১৮৬১কেই বলেছেন বাঙালী সমাজের জীবনের 'মাহেন্দ্রক্ষণ'।

এযুগের শিক্ষিত বাঙালী সিপাহী যুদ্ধকে বাঙালী সমাজের যুগ পরিবর্তনে তত গুরুত্ব দেননি,—আমরা তা দিই। কারণ তার পর ভারত শাসনে যে ব্রিটিশ শিল্প-পুঁজির প্রাধান্য স্থাপিত হবে, আধুনিক কালের সামাজিক-অর্থনৈতিক ও ভাবগত বিপর্যয় ঔপনিবেশিক পদ্ধতিতে অগ্রসর হবে, সিপাহী যুদ্ধের পরে (১৮৫৮) তাতে আর কোনো সন্দেহ রইল না। সিপাহী যুদ্ধ বাঙালীর জীবনে গুরুতর ঘটনা নয়। কিন্তু ভারতব্যাপী রাজনৈতিক-প্রশাসনিক পট-পরিবর্তনের তা একটি মূল কারণ। আর বাঙলাই তখন ভারতের প্রাণকেন্দ্র—শুধু শাসনের নয়; শিক্ষায়, সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনায় বাঙলা অগ্রগণ্য। তাই সেই পট-পরিবর্তনের ফলে বাঙলার রাজনৈতিক ক্ষেত্র ছাড়া সামাজিক-মানসিক ক্ষেত্রেও পরিবর্তনের স্রোত অবারিত হয়ে ওঠে—পাশ্চাত্ত্য জীবনধারা ও চিন্তাধারার প্রসার ক্ষিপ্র থেকে ক্ষিপ্রতর হতে থাকে—এই কারণেই আমরা বাঙালীরাও সিপাহী যুদ্ধকে গুরুত্ব দিতে বাধ্য। তাই মোটামুটি খ্রীঃ ১৮৪৩ থেকে খ্রীঃ ১৮৫৭-৫৮ পর্যন্ত কালকে একটি পর্বকাল বলে গ্রহণ করতে পারি। আর সে পর্বের নাম দিতে পারি—'তত্ত্ববোধিনীর পর্ব' বা 'বিদ্যাসাগরের পর্ব'।

তত্ত্ববোধিনী বাঙলা পত্রিকা ও সাহিত্যের জগতে প্রবেশ করে খ্রীঃ ১৮৪৩-এ, এবং খ্রীঃ ১৮৬৫ পর্যন্ত তা নানা সম্পদ জোগায়—তার পরেও তার দান নানা দিকে স্মরণীয়। কিন্তু খ্রীঃ ১৮৫৮-এর পরে যে অদ্ভুত সাড়া সাহিত্যে জাগে এবং দেখতে-না-দেখতে প্রসারিত হয়, তাকে 'তত্ত্ববোধিনী সভার' সৃষ্টি না বলাই শ্রেয়ঃ। বিদ্যাসাগর তো খ্রীঃ ১৮৪৭-এর পূর্বে কিছুই প্রকাশ

করেননি, আর তাঁর প্রধান কিছু কিছু লেখাও খ্রীঃ ১৮৫৮-এর পরে প্রকাশিত হয়। শিক্ষায়-দীক্ষায় জাগরণের যুগেও সেই অদ্ভুতকর্মা মহাপুরুষ আরও ৩০ বৎসরের ঊর্ধ্বকাল আপন কর্তব্যে অবহিত ও আপন শক্তিতে অপরাজেয় থাকেন। কিন্তু সমাজ ও সাহিত্য বিদ্যাসাগরের প্রধানতম দান গ্রহণ করেছে খ্রীঃ ১৮৫৭ পর্যন্ত। তারপর থেকে একদিকে ধর্ম-সংস্কারে (যেমন, কেশবচন্দ্র-দেবেন্দ্রনাথ) অন্যদিকে সাহিত্য-সৃষ্টিতে (মাইকেল-দীনবন্ধু-বঙ্কিম) অন্য কৃতী বাঙালীরা প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। কিন্তু বাঙলা গদ্য ১৮৪৩-'৫৭এর মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়। কেউ একা সে কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন না; তথাপি বিদ্যাসাগরকেই বাঙলা গদ্যের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা বলতে হবে। আর কেউ তা নন, —কেরি নন, রামমোহন নন, মৃত্যুঞ্জয়ও নন। বিদ্যাসাগর শিক্ষা-পুস্তক রচনায় ও প্রচার-গ্রন্থ রচনায় জীবনের শ্রেষ্ঠ দান উৎসর্গ করেছেন। কিন্তু তা নীরস পাঠ্যপুস্তক নয়, যুক্তিসমৃদ্ধ পরিচ্ছন্ন গ্রন্থ, রসাভিষিক্ত চমৎকার রচনা—এই কারণেও তিনি এই কালের যুগ-প্রধান হতে পারতেন। তদুপরি. যিনি বিধবা বিবাহের প্রধান কেন, প্রায় একমাত্র প্রবর্তক, যিনি প্রতিটি রচনায় ও প্রচেষ্টায় পুরুষার্থ ও মানবীয় মহত্বকেই প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন, তিনি এ-যুগের প্রথম 'হিউম্যানিস্ট'। তাই নিশ্চয়ই আধুনিক যুগের 'যুগ-প্রধান' বলে তাঁকেই গণ্য করা কর্তব্য—সমস্ত উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলায়ও আর এমন দ্বিতীয় মানুষ নেই।

আধুনিক যুগধর্ম যে তিনটি বিশিষ্ট পর্যায় অতিক্রম করে ইউরোপে বিকশিত হয়েছিল তাকে রিনাইসেন্স, রিফর্মেশন ও ফরাসী (বা বুর্জোয়া) বিপ্লব বলা চলে। সাধারণভাবে বলা যেতে পারে, রিনাইসেন্সের মূল অর্থ জীবন-জিজ্ঞাসায় আগ্রহ; রিফর্মেশনের অর্থ—ধর্ম ও সমাজ সংস্কারে উৎসাহ; আর ফরাসী বিপ্লবের সার কথা—গণতান্ত্রিক মধ্যবিত্তের রাষ্ট্রক্ষেত্রে ক্ষমতালাভ। এই সুপরিণত যুগধর্মের সঙ্গে বাঙালীর ও ভারতবাসীর একই কালে পরিচয় ঘটে খ্রীঃ ১৮০০ অব্দের সময় থেকে। অবশ্য পরাধীন জাতি বলে স্বাধীনভাবে এই বুর্জোয়া শিক্ষা তারা স্বাঙ্গীকৃত করতে পারেনি. পারবার কথাও নয়;—এ কথা একবারও আমাদের বিস্মৃত হলে চলবে না। তথাপি রামমোহন রায়ও এই জ্ঞানপ্রসার, ধর্ম- ও সমাজ-সংস্কার এবং রাজনৈতিক আন্দোলন—যুগধর্মের এই ত্রিধারা সম্বন্ধে সচেতন ও সক্রিয় হয়েছিলেন। তারপর থেকে রাজনৈতিক

চেতনা আরও দানা বেঁধে ওঠে, জ্ঞানজিজ্ঞাসা, ধর্মসংস্কার ও সমাজ-সংস্কারও আরও অগ্রসর হয়। এই খ্রীঃ ১৮৪৩ থেকে খ্রীঃ ১৮৫৭-এর পর্বে এসে সেই সমস্ত ধারা সংগঠিত রূপ লাভ করে, যুগধর্ম একটা সুস্পষ্ট আকারে অঙ্কুরিত হয়, এ কথা আমরা পূর্বেই বলেছি।

(ক) রাজনৈতিক চেতনার প্রকাশ

যে রাজনৈতিক ও সামাজিক ঘটনাবলীতে এ পর্বে ভারতীয় জীবনধারা চঞ্চল হয়ে ওঠে এখানে তা বিশদ করে বলা অসম্ভব। শুধু এইটুকুই নির্দেশ করা যায় যে—এলেনবরার যুগ ছাড়িয়ে, ভারতীয় শাসনতন্ত্র ডালহৌসির যুগে উত্তীর্ণ হল। ক্ষমতাচ্যুত দেশীয় সামন্ত রাজাদের রাজ্যচ্যুত করে ডালহৌসি ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ শাসনের একচ্ছত্র আধিপত্যে আনয়ন করলেন। সে সমস্ত সামন্ত-প্রধানদের মনে এ কারণে বিদ্রোহের বহ্নি জ্বলতে লাগল। তাঁদের হাতে ছিল—সাধারণ কৃষকের, বঞ্চিত কারুবিদের যুগ-সঞ্চিত ক্ষোভ। কোম্পানির লুণ্ঠনের যুগে যে প্রজাপীড়ন ও কৃষক-শোষণ অব্যাহত চলেছে তাতে বহুদিন ধরেই অগ্ন্যুৎপাতের উপকরণ জমে ছিল। কোম্পানির সনদ পরিবর্তনের সময় (খ্রীঃ ১৮৫৩) থেকে একদিকে নূতন শিক্ষানীতি ও ইংরেজি শিক্ষার প্রসার, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি আধুনিক ভাবধারার কেন্দ্রসমূহ বিস্তারের চেষ্টা চলল, অন্যদিকে টেলিগ্রাফ (খ্রীঃ ১৮৫৩), রেলওয়ে প্রভৃতি প্রবর্তনের দ্বারা ভারতের আর্থিক জীবন ও ব্রিটিশ শিল্প-জীবনের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করা হল। আধুনিক জীবন-যাত্রায় ভারতীয় বণিক, ভারতীয় কারুবিদ্, ভারতীয় কৃষক সকলেই বঞ্চিত থাকবে, অথচ সেরূপ জীবন-যাত্রার বাহন-সমূহের বিস্তার আরম্ভ হল—ঔপনিবেশিকতার অসঙ্গতি এমন অদ্ভুত। সেই ঘটনাধারার সঙ্গে একদিকে যোগ হয়েছিল আক্রমণমুখী খ্রীষ্টধর্মের ঔদ্ধত্য, অন্যদিকে বিদ্যাসাগর প্রমুখ নবজাগ্রত সমাজ-সংস্কারকদের সরকারী সহায়তায় বিধবা-বিবাহের অনুমোদনে আইন প্রণয়ন। সামন্তযুগের ধর্মান্ধতা-গ্রস্ত হিন্দু জনসাধারণের মনে এসবও বিক্ষোভের সঞ্চার করল। মুসলমান জনসাধারণের মনে পূর্বেই বিক্ষোভ ছিল বাদশাহী নবাবী উজীরী-আমীরী হারানোতে। আয়মা-জমি ও রাজকর্মে ফারসির বিদায়ের সঙ্গে তাদের মধ্যে ওহাবী মনোভাব আরও

বিস্তৃত হয়, তা ক্রমে সুদৃঢ় ব্রিটিশ-বৈরিতায় পরিণত হয়েছিল। অতএব, ডালহৌসি বিদ্রোহের মুখেই ভারতবর্ষকে ঠেলে দিলেন।

বোঝবার মত কথা শুধু এই যে, বাঙলা দেশে পরাজিত জীবনের অসন্তোষকে সংস্কারবাদী শিক্ষিত হিন্দুগণ প্রায় ৪০ বৎসর ধরে (রামমোহনের সময় থেকে) একটা আধুনিক চেতনায় প্রবুদ্ধ রাজনৈতিক আন্দোলনে সংগঠিত করতে সচেষ্ট ছিলেন। রামমোহন ও 'ইয়ং বেঙ্গলের' পর্বের শেষে খ্রীঃ ১৮৩৩ থেকে রাজনৈতিক চেতনা প্রবলতর হয়ে উঠেছিল—জুরি প্রথার দাবীতে ও মরিসাসে কুলি প্রেরণের বিরুদ্ধে বাঙালী নেতারা আন্দোলন করেন। সরকারী বেগার খাটার বিরুদ্ধে রাধানাথ শিকদারের চেষ্টাও সার্থক হয়। ১৮৪৯-এর সাধারণ বিচার-পদ্ধতিতে ইউরোপীয়দের বিচার-ব্যবস্থার সরকারী প্রস্তাব ("ব্ল্যাক্ বিল্স্) ওঠে; তার সমর্থনে রামগোপাল ঘোষের বাগ্মিতা সকলকে প্রবুদ্ধ করে। খ্রীঃ ১৮৫১ অব্দেই নিষ্ক্রিয় জমিদার সভা ও নিষ্ক্রিয় ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি দুই মিলিয়ে তৈরী হয় "ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান্ অ্যাসোসিয়েশন।" দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তার সম্পাদক হন। রাজনৈতিক কর্মে সদস্যদের উদ্যোগী হতে বলে বিভিন্ন প্রদেশের ভারতীয় নেতাদের তিনি আহ্বান করেন। খ্রীঃ ১৮৫৩ সনে সনদ পরিবর্তনের পূর্বে (খ্রীঃ ১৮৫২) হরিশ মুখুজ্জে কোম্পানির নীল চাষের ও সোরার একচেটিয়া অধিকার রহিত করা, সরকারী উচ্চকর্মে ভারতবাসীর নিয়োগ, এমন কি, ভারতীয় সংখ্যাধিক্যে ভারতীয় আইন-সভা স্থাপনের দাবী উত্থাপন করে জনমত গঠন করেন। মনে রাখা প্রয়োজন, ১৮৮৫ থেকে প্রায় ১০।১৫ বৎসর পর্যন্ত ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসও এর থেকে বেশি রাজনৈতিক দাবী উত্থাপন করতে পারে নি। ১৮৫৩-৫৪তে মধ্যবিত্ত বাঙালী শিক্ষিতদের এসব লিবারল (উদারনৈতিক) দাবী শাসক-গোষ্ঠীও একেবারে অবহেলা করতে পারে নি। আরও লক্ষণীয়, খ্রীঃ ১৮৫৬-তে মিশনারিরা জমিদারী-তন্ত্রের অধীনে রায়তদের অবস্থা অনুসন্ধানের জন্য আবেদন করলে ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়ার অ্যাসোসিয়েশনের জমিদারবর্গও তা সমর্থন করেন—অভিযোগ প্রধানত জমিদারশ্রেণীর বিরুদ্ধে তা জেনেও তাঁরা এ দাবীতে আপত্তি করলেন না। অর্থাৎ বাঙলার ইংরেজ-সৃষ্ট ভূম্যধিকারীরা ইংরেজি-শিক্ষিত মধ্যবিত্তের (হরিশ মুখুজ্জে, রামগোপাল ঘোষের) নৈতিক নেতৃত্ব তখন থেকেই স্বীকার করতে আরম্ভ করেছেন। আর,

সেই ইংরেজি-শিক্ষিত মধ্যবিত্তই বাঙালী উচ্চবিত্তদের নিয়ে আধুনিক দৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ একটা রাজনৈতিক আন্দোলন বাঙলাদেশে গঠন করে তার নেতৃত্ব লাভ করছে। মনে হয়, খ্রীঃ ১৮৫৭ সালে উত্তর ভারতের অন্য প্রদেশের থেকে তাই বাঙালী সমাজ—অভাবে (Negative) ও প্রভাবে (Positive)—দু'দিকেই একটু বিশিষ্ট ছিল। উত্তর ভারতে পুরাতন সামন্তশ্রেণী ক্ষমতাচ্যুত হলেও সে অঞ্চলে তখনো প্রবল সামন্ত মনোভাব ব্যাপক ছিল, এবং সামন্ত নেতৃত্বও তখন পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। বাঙলায় সেরূপ সামন্তশ্রেণীর অভাব ছিল ; আর আধা-সামন্ত (জমিদারী-তন্ত্রের) মনোভাব ব্যাপক হলেও তত বেশী প্রবল নয়। মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণী ক্ষুদ্র হলেও বাঙলায় তখন তাঁরা প্রভাবশালী, আধুনিক দৃষ্টিও সমাজে প্রসারশীল। শিক্ষিত শ্রেণী রাজনৈতিক আন্দোলন ও সংগঠন দুয়েরই পথ আবিষ্কার করেছে ; অন্ধ অগ্র-পশ্চাৎভাবনাহীন বিক্ষোভে আত্মহারা হবে না। ১৮৫৭-এর বিদ্রোহের স্বরূপ যাই হোক, বাঙলার বাঙালী তার বিরাট রূপ প্রায় দেখতেই পায়নি। বিদ্রোহী সিপাহীদের যেটুকু তারা দেখেছে বা শুনেছে তাতে তারা আশ্বস্ত বোধ করতে পারেনি। ভারতের প্রথম ব্যাপক স্বাধীনতা-প্রয়াসেও যে বাঙালী সমাজে প্রায় কোন চাঞ্চল্য এল না তার কারণ বাঙলায় তখন আধুনিক যুগের গোড়াপত্তন হয়েছে ; বিদেশী বুর্জোয়া শক্তির হাত থেকে এভাবে দেশীয় অসংগঠিত সামন্ত শক্তি ও পশ্চাৎপদ জন-শক্তি বিদ্রোহ করে স্বাধীনতা লাভ করতে পারে না, এ বিশ্বাসও প্রবল ছিল। স্বাধীনতার নামেও সেই ব্যর্থ অভ্যুত্থানে তাই বাঙালী শিক্ষিত-সমাজ আত্ম-বিস্মৃত হতে চায়নি। কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের মহৎ দিকটিকে মনে মনে অবজ্ঞা করতেও তারা পারেনি, তার প্রমাণও রয়েছে। অন্তত দশ বৎসরের মধ্যেই সিপাহী বিদ্রোহকে তারা স্বাধীনতার যুদ্ধ হিসাবে মনে মনে গণ্য করতে আরম্ভ করেছিল—তার প্রমাণও বাঙলা সাহিত্যে প্রচুর। (দ্রষ্টব্য : লেখকের *Bengali Literature Before and After 1857.*)

(খ) জ্ঞানবিস্তার

জ্ঞানপিপাসায় ও জ্ঞানবিস্তারেই বাঙালীর এই চেতনা খ্রীঃ ১৮১৭ থেকে প্রথম দেখা দিয়েছিল। ইংরেজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান (খ্রীঃ ১৮৩৫এ) শিক্ষাপথ রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করলে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কেন, রাধাকান্ত দেব,

রামকমল সেন প্রমুখদেরও অন্যতম প্রয়াস হয়—বাঙলা শিক্ষা যাতে অবজ্ঞাত না হয়, দেশীয় ভাষা ও ঐতিহ্যের জ্ঞান থেকে যাতে এই শিক্ষিতবর্গ বঞ্চিত না হয়, যাতে শিক্ষিত যুবকগণ দেশের প্রতি শ্রদ্ধা না হারায়। এ উদ্দেশ্যেই দেবেন্দ্রনাথ 'তত্ত্ববোধিনী সভা' ও 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা' প্রতিষ্ঠা করেন; অক্ষয়কুমার দত্তকে আপনার সহকারী রূপে গ্রহণ করেন। অন্তদিকে, খ্রীঃ ১৮৫৩-এর সনদ পরিবর্তনের পরে খ্রীঃ ১৮৫৪তে বাঙলার ছোটলাট ফ্রেডারিক জে. হ্যালিডের শিক্ষাবিষয়ক মন্তব্যে (মিনিটে) দেশীয় ভাষায় নিম্নতর শিক্ষা-বিস্তারের প্রস্তাব ছিল। এ প্রস্তাবের সঙ্গে সংযুক্ত হয় তখনকার সংস্কৃত কলেজের প্রিন্‌সিপ্যাল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের লিখিত একটি খসড়া। তার মর্ম এই—মাতৃভাষায় ভিন্ন সাধারণের শিক্ষা সম্ভব নয়। আর এ খসড়ায় মাতৃভাষা মারফতে শিক্ষণীয় বিষয় সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর যা নির্দেশ করেন কোনো ইংরেজিওয়ালা বৈজ্ঞানিকেরও তাতে আপত্তি করা অসম্ভব। সেই খসড়া হচ্ছে প্রথম ভারতীয় শিক্ষাবৈজ্ঞানিকের মানবধর্মবাদসম্মত (Humanist) শিক্ষা-প্রস্তাব (দ্রঃ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোঃ 'বিদ্যাসাগর', সাঃ সাঃ চরিতমালা)। এর পরে অবশ্য বিদ্যাসাগর 'বঙ্গবিদ্যালয়' স্থাপনের ভার নিয়ে ও স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্য 'বালিকা বিদ্যালয়' স্থাপনের কাজ নিয়ে অদ্ভুত উদ্যমের সঙ্গে কার্যক্ষেত্রেও অগ্রসর হন। এই সময়েই (খ্রীঃ ১৮৫৬) তিনি বিধবা-বিবাহের আন্দোলনও আপনার জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেন। অন্তদিকে, 'উডের ডেসপ্যাচের' ফলস্বরূপ আধুনিক ভারতের সরকারী শিক্ষানীতি প্রণীত হয়, জিলা স্কুল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং শিক্ষা বিভাগ সুগঠিত হয়; কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে ভারতের প্রথম তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত হয় (খ্রীঃ ১৮৫৭-এর প্রথম দিকেই), অর্থাৎ খ্রীঃ ১৮১৭-এর সেই শিক্ষাদীক্ষা খ্রীঃ ১৮৫৭তে মধ্যবিত্তের শিক্ষায়োজনে রূপায়িত হয়েছে।

(গ) সংস্কার আন্দোলন

রামমোহনের ঐতিহ্য : ধর্ম- ও সমাজ-সংস্কারের তর্ক কোনো সময়েই থামেনি। কিন্তু রামমোহনের অভাবে তাঁর ব্রহ্মোপাসনার মণ্ডলী প্রায় বিলুপ্ত হয়েছিল—আলেকজাণ্ডার ডাফের খ্রীষ্টধর্মের আন্দোলন ও 'ইয়ং বেঙ্গলে'র সংশয়বাদই তখন প্রবল। রামমোহনের ঐতিহ্যকে আশ্রয় করে এ দুয়ের

বিরুদ্ধেই দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথমত 'তত্ত্ববোধিনী সভা' (খ্রীঃ ১৮৩৯) স্থাপন করেন, নানা বিষয় তাতে আলোচিত ও ব্যাখ্যাত হত। তারপরে সভার অনুপস্থিত সদস্যদের প্রয়োজনে প্রতিষ্ঠিত করেন 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' (খ্রীঃ ১৮৪৩)—অক্ষয়কুমার তার প্রধান লেখক। এ পত্রিকার পাতায় অক্ষয়কুমার বিজ্ঞান, দর্শন ও পুরাবৃত্তের যুক্তিবাদী আলোচনা চালালেন, আর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও যুবক রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি বেদান্তপ্রতিপাদ্য ধর্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা করতে থাকেন। বিদ্যাসাগরও এই পত্রে লিখতেন, এবং খ্রীঃ ১৮৭৫তে তিনি 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদক রূপেও কাজ করেন। প্রধানত দেবেন্দ্রনাথের চেষ্টাতেই রামমোহন রায়ের ব্রহ্ম-আন্দোলন নূতন করে আবার জন্মগ্রহণ করল। প্রথমে তা 'বেদ অপৌরুষেয়' এই মত গ্রহণ করে 'বেদান্তপ্রতিপাদ্য ধর্ম' বলে নিজের পরিচয় দিত। পরে, কতকটা খ্রীষ্টান সমালোচকদের যুক্তির উত্তরে, কতকটা অক্ষয়কুমার প্রমুখদের যুক্তিতে দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখ ধর্ম-জিজ্ঞাসুরা বেদের অপৌরুষেয়তা-বাদ পরিত্যাগ করেন। এভাবে অবশ্য শুধু খ্রীষ্টান প্রচার নয়, 'ইয়ং বেঙ্গলে'র ধর্মহীন যুক্তিবাদও বাধাপ্রাপ্ত হয়। পরে কেশবচন্দ্র সেন এসে সেই ব্রাহ্মসমাজে বিপুল ভাবাবেগ সঞ্চার করলেন—তাই জাগরণের যুগে সেই ধর্ম- ও সমাজ-সংস্কারের আন্দোলন প্রবলতম একটা শক্তিরূপে জাতীয় জীবনে দেখা দিল।

ইয়ং বেঙ্গলের ঐতিহ্য : রামমোহনের এই ধর্ম-সংস্কারের ধারাকে এক হিসাবে প্রায় পাশ কাটিয়েই বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্ত রামমোহনের যুক্তিবাদী জিজ্ঞাসার ধারা ও সমাজ-সংস্কারের ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যান—'তত্ত্ববোধিনী সভা ও পত্রিকায়' ও তাঁদের কর্মক্ষেত্রে। ইয়ং বেঙ্গলের বিদ্রোহ, অসংযম ও বিজাতীয় আচার-ব্যবহার এঁরা কেউ এক মুহূর্তও সহ্য করতেন না। এঁরা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসুরও সহকারী। কিন্তু একদিক দিয়ে এঁরাই রামমোহনের সঙ্গে ইয়ং বেঙ্গলের, মধ্যবিত্তদের যুক্তিবাদের ও সংস্কারপ্রেরণার সামঞ্জস্য সাধন করেন, তা অনেকে বিস্মৃত হন। সমাজ-সংস্কারে, বিধবা-বিবাহ বিষয়ে, বহুবিবাহ বিরোধিতায় 'ইয়ং বেঙ্গল' এঁদের পূর্বেই যাত্রাপথে পদার্পণ করেছিলেন—তাঁদের উদ্দামতা নয়, কিন্তু তাঁদের যুক্তিবাদী ঐতিহ্য এঁদের গ্রাহ্য করতে হয়েছে। সর্বদিক দিয়ে দেখলে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে আধুনিক যুগধর্মের মূল সত্য যে মানব-নিষ্ঠ জীবন-

জিজ্ঞাসা ও কর্ম-প্রেরণা, বিদ্যাসাগরের তা'ই ছিল জীবনবেদ—রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তিনি একক এবং সেই বিস্ময়কর যুগেরও বিস্ময়।

বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার ও দেবেন্দ্রনাথ এই তিনজনই সিপাহী যুদ্ধের পরে বহু বৎসর পর্যন্ত নিজ নিজ দানে জাগরণের যুগকে সমুজ্জ্বল করেছেন। কিন্তু তখন অন্যান্য কর্মীও অগ্রসর হয়ে এসেছেন। অথচ খ্রীঃ ১৮৪৩ থেকে খ্রীঃ ১৮৫৭ এই উন্মেষ-ক্ষণের তাঁরাই যুগস্রষ্টা। তাই এই পর্বের আলোচনা কালেই তাঁদের রচনার বিষয়ে সমগ্রভাবে আলোচনাও শেষ করা হল। কিন্তু কাল হিসাবে বা ভাবপ্রবর্তক হিসাবে এই পর্বেই তাঁরা নিঃশেষিত হননি, তা মনে রাখা প্রয়োজন। এই কথা রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি মনস্বীদের সম্বন্ধেও সত্য—যদিও এই পর্বের প্রসঙ্গেই তাঁদের পরিচয়ও আমরা গ্রহণ করেছি। 'হিন্দু কলেজের লেখক-গোষ্ঠী' ও 'সংস্কৃত কলেজের লেখক-গোষ্ঠী'ও অনেকাংশেই এ সময় থেকে লেখা আরম্ভ করেন, তাও মনে রাখা প্রয়োজন।

(২) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

'তত্ত্ববোধিনী সভা' ও 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' বাঙলা দেশের সাংস্কৃতিক জীবনকে জাতীয় ধারায় সংগঠিত ও বাস্তববস্তুর জিজ্ঞাসায় সংহত করে। 'তত্ত্ববোধিনী সভা' স্থাপিত হয় খ্রীঃ ১৮৩৯, ৬ই অক্টোবর। 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা' (The Society for Acquisition of General Knowledge) তার কিছু পূর্বেই কার্যারম্ভ করেছিল (১৮৩৮, ৬ই মে)। তত্ত্ববোধিনী তার অপেক্ষা 'উদারতর অভিপ্রায়ে প্রবর্তিত হইয়াছিল' (ভূদেব মুখোপাধ্যায়)। শীঘ্রই তার সভ্যসংখ্যা পাঁচ শতের বেশি হয়ে যায়। তার আলোচনায় ধর্মতত্ত্ব, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতিই প্রাধান্য লাভ করে। দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজ পুনঃস্থাপিত করলেন (খ্রীঃ ১৮৪১); 'বেদান্তপ্রতিপাদ্য ব্রাহ্মধর্ম' স্বীকার করলেন; তারপর, ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে (১৭৬৫ শকাব্দ, ১লা ভাদ্র) ব্রাহ্মসমাজের ব্যাখ্যান অনুপস্থিত সদস্যদের নিকট প্রকটিত করবার উদ্দেশ্যে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশিত করলেন। এ পত্রিকায় প্রবন্ধাদি নির্বাচনের দায়িত্ব ছিল 'গ্রন্থাধ্যক্ষদের' হাতে—এ একটি উল্লেখযোগ্য কথা। একালের ভাষায় তাঁদের বলা চলে 'সম্পাদকমণ্ডলী'। তাঁদের মধ্যে ছিলেন অক্ষয়কুমার

দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি খ্যাতনামা মনস্বীরা। দেবেন্দ্রনাথের লেখাও তাঁরা প্রকাশিত করতে সময়ে সময়ে বাধা দিতেন। প্রথম ১২ বৎসর অক্ষয়কুমার দত্ত ছিলেন সম্পাদক। তাঁর বিজ্ঞান ও নীতিবিষয়ক আলোচনাই 'পত্রিকা'কে শীর্ষস্থানীয় করে তোলে। অক্ষয়কুমার অসুস্থতার জন্ত অবসর গ্রহণ করলে (খ্রীঃ ১৮৫৫) বিদ্যাসাগর পত্রিকার সম্পাদনভার গ্রহণ করেন। পূর্বাপরই তাতে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যাখ্যান, এবং রাজনারায়ণ বসু ও পরে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের লেখা প্রকাশিত হত। বাঙলা গদ্যের ক্ষেত্রে এঁদের কৃতিত্ব স্মরণে রাখলে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র দানও উপলব্ধি করা যায়—রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' ও 'রহস্য সন্দর্ভে'র সম্মুখে এ আদর্শই ছিল। আর তারপর প্রথম কল্পের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' বন্ধ (খ্রীঃ ১৮৬৫ ?) হলেও, 'বঙ্গদর্শন' আবির্ভূত হল (এপ্রিল, ১৮৭২)।

অক্ষয়কুমার সম্পাদিত 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' সম্বন্ধে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেছেন—" 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' সমস্ত বাঙলায় ইউরোপীয় ভাব-প্রচারের মিশনারি ছিল। বাঙালীর ছেলেদের মধ্যে ইংরেজির ভাব প্রবেশ করান সর্বপ্রথম অক্ষয়কুমার দত্ত দ্বারা সাধিত হয়।" বলা বাহুল্য এ কাজ তত্ত্ববোধিনীর প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অভীষ্ট ছিল না। তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় তত্ত্বজ্ঞান ও ভগবৎ-চিন্তা প্রচার দ্বারা য়ুরোপীয় ভাব-বন্যাকে সংযত করা, হয়ত বা প্রতিরোধ করা। অক্ষয়কুমার দত্তের প্রধান কৃতিত্ব সেই তত্ত্ববোধিনীর মারফতেই তিনি যুক্তিবাদে ও বৈজ্ঞানিক চিন্তায় বাঙালীকে দীক্ষিত করেছেন; আধ্যাত্মিক ভাবাদর্শে একেবারে কেন্দ্রচ্যুত হতে দেননি।

অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬)

অক্ষয়কুমার দত্তের জন্ম নবদ্বীপের নিকটস্থ চুপি গ্রামে (খ্রীঃ ১৮২০)। সে বৎসরই বিদ্যাসাগরও জন্মগ্রহণ করেন বীরসিংহ গ্রামে। দু'জনাই অনেকাংশে একই সাধনার সাধক—বাঙলা গদ্যে ও বাঙালীর চিন্তার ক্ষেত্রে তাঁরা পরিচ্ছন্নতা ও শক্তির সঞ্চার করে গিয়েছেন। কিন্তু দু'জনার মনের গঠন পৃথক। তাই অক্ষয়কুমার রেখে গিয়েছেন নিরাবেগ বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির বিশুদ্ধ

ঐতিহ্য—বিদ্যাসাগর সুদৃঢ় জীবননিষ্ঠা ও প্রাণরসে পুষ্ট মানবতা-বাদের মহৎ উত্তরাধিকার। আজ পর্যন্তও বলা চলে না বাঙলা সাহিত্য তাঁদের দান-ফল সম্পূর্ণ ভোগ করতে পেরেছে।

জীবন-কথা : অক্ষয়কুমারের পিতা কলকাতায় খিদিরপুরে কাজ করতেন। তাই অক্ষয়কুমার কলকাতায় শিক্ষালাভের সুযোগ পান। অবশ্য সে সুযোগ দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ওরিয়েণ্টাল সেমিনারিতে মাত্র তিন বৎসর তিনি পড়তে পান, তখন তাঁর পিতার মৃত্যু হয়; তিনি বিষয়কর্মের চিন্তায় বিদ্যালয় ত্যাগ করেন। কিন্তু তার বহু পূর্বেই বালক অক্ষয়কুমারের জ্ঞান-পিপাসা জেগেছিল; নানা ভাষা শিক্ষা ছাড়াও তাঁর অধিকতর আগ্রহ জাগে ভূগোলে, গণিতে ও প্রকৃতি-বিজ্ঞানে, নীতি-বিষয়ক নানা প্রশ্নে। বিদ্যালয় ত্যাগ করতে বাধ্য হলেও তিনি অধ্যয়ন-স্পৃহা কিছুমাত্র ত্যাগ করলেন না। এমন কি, সে সুযোগ ছাড়তে হবে এমন কোন বৃত্তিও গ্রহণ করতে চাইলেন না। এরূপ অবস্থায় তাঁর পরিচয় ঘটে 'সম্বাদ-প্রভাকরে'র সম্পাদক ঈশ্বর গুপ্তের সঙ্গে। গুপ্ত কবির অনুসরণে এক-আধটি পদ্য রচনার পরে অক্ষয়কুমার তাঁর পত্রিকায় কিছু কিছু গদ্য রচনা লিখলেন। ঈশ্বর গুপ্তই তাঁকে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দেন। দেবেন্দ্রনাথ নিজ পৈতৃক ভবনে তখন (খ্রীঃ ১৮৩৯) 'তত্ত্ববোধিনী সভা' প্রতিষ্ঠা করে জ্ঞান ও অধ্যাত্মবিদ্যার আলোচনায় অগ্রসর হয়েছেন। অক্ষয়কুমার প্রথম 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালায়' শিক্ষক নিযুক্ত হন। সেই সভার উদ্যোগেই 'পাঠশালার' পাঠ্যরূপে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম গ্রন্থ ভূগোল। তারপর 'বিদ্যাদর্শন' নামক একখানা মাসিক পত্রিকারও কয়েক সংখ্যা অক্ষয়কুমার প্রকাশিত করেন—এ 'বিদ্যাদর্শনে'র নামের রেশ পরবর্তী 'বঙ্গদর্শনে', 'আর্যদর্শনে'ও দেখতে পাওয়া যাবে। কিন্তু অক্ষয়কুমারের মনীষার পথ উন্মুক্ত হল খ্রীঃ ১৮৪৩ সালে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র প্রকাশে। তিনিই তার প্রথম সম্পাদক ও প্রধান লেখক পদে বৃত হন। আর ক্রমাগত ১১ বৎসর (খ্রীঃ ১৮৫৫ পর্যন্ত) তিনি এ কাজ অক্লান্ত যত্নে সম্পাদান করেন। তাঁর অধিকাংশ গ্রন্থের প্রবন্ধাবলীই প্রথম এ পত্রিকার পাতায় প্রকাশিত হয়েছে। তত্ত্ববোধিনীর লেখক রাজনারায়ণ বসু (বাঃ ভাঃ ও সাঃ বিঃ বক্তৃতা, ১৮৭৮) বলেছেন—প্রথম প্রথম তাঁর লেখাতে কাঠিন্য ও ত্রুটি থাকত, তা দেবেন্দ্রনাথ ও বিদ্যাসাগর সংশোধন করে দিতেন। "অক্ষয়বাবু কিন্তু সংশোধনের অতীত

হইয়া অসাধারণ প্রভায় দীপ্তি পাইয়াছিলেন।" কঠিন শিরঃপীড়ার জন্ত যখন অক্ষয়কুমার তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদনা-কর্ম ত্যাগ করতে বাধ্য হন, তখন বিদ্যাসাগর এসে সে ভার গ্রহণ করেন (খ্রীঃ ১৮৫৫)। বিদ্যাসাগরের অনুরোধেই অক্ষয়কুমার নবপ্রতিষ্ঠিত নর্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষকপদ গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু শিরঃপীড়ার জন্ত এক বৎসর পরেই তা ত্যাগ করেন। পীড়া সত্ত্বেও তাঁর জ্ঞানস্পৃহা ব্যাহত হয়নি, এবং রচনাও একেবারে বন্ধ হয়নি। এই সময়েই বরং তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের' প্রধানতম অংশসমূহ রচিত হয়। অবশেষে খ্রীঃ ১৮৮৬ সালে বহুদিন-স্বাস্থ্যহীন অক্ষয়কুমার পরলোক গমন করেন। তাঁর অনেক লেখা তখনো 'তত্ত্ববোধিনীর পাতা'তেই নিবদ্ধ থেকে গিয়েছিল, সব লেখা এখনো প্রকাশিত হয়নি—যেমন, তাঁর (ও বিদ্যাসাগরের ?) জমিদারী প্রথার বিরুদ্ধে সমালোচনা।

'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' অক্ষয়কুমার দত্তের পরিচিত গ্রন্থাদির মধ্যে সর্বাগ্রে প্রকাশিত হয়। প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয় খ্রীঃ ১৮৫২ অব্দে, দ্বিতীয় ভাগ খ্রীঃ ১৮৫৩তে। জর্জ কুম (George Combe) নামক ইংরেজ লেখকের 'মানুষের গঠন' (Constitution of Man) নামক ইংরেজি গ্রন্থ অবলম্বন করে অক্ষয়কুমারের এ গ্রন্থ রচিত। কিন্তু অক্ষয়কুমার তাতে বিবেচনা অনুযায়ী সংযোজন ও পরিবর্তন যথেষ্ট করেছেন। গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য এই যে, ভগবানের নিয়ম লঙ্ঘন করলেই মানুষের দুঃখ, সেই নিয়ম পালনে তার সুখ। বিধাতার যে নিয়মসমূহ বিশ্ববিধানে দেখা যায় তা কী কী, কোন্ নিয়ম পালনে সুখ, কোন্ নিয়ম লঙ্ঘনে কী দুঃখ, তাই লেখকের আলোচ্য। গ্রন্থের প্রথম ভাগে প্রাকৃতিক নিয়ম, মানুষের শারীর বৃত্তি ও মানস বৃত্তির ও জীবনযাত্রার নীতিপদ্ধতি আলোচনা করে অক্ষয়কুমার নিরামিষ ভোজনের সুফল ব্যাখ্যা করেছেন। দ্বিতীয় ভাগে ধর্ম ও সামাজিক নিয়ম, নিয়ম পালনের ফল, নানা প্রাকৃতিক নিয়মের সমবেত কার্য, ব্যক্তির পক্ষে তার ফলাফল, সুরাপানের কুফলতা—এ সব বিষয় আলোচিত হয়েছে। এসব আলোচনা যতই মূল্যবান ও প্রয়োজনীয় হোক্, 'রম্যরচনা'র মত মুখরোচক হতে পারে না। তথাপি অক্ষয়কুমারের প্রধান কৃতিত্ব এই যে এসব প্রয়োজনীয় আলোচনায় তিনি বাঙালীকে উৎসাহিত করেছেন, আর বাঙলা গদ্যের সেযুগে তিনি এরূপ আলোচনা অনুসৃত করতে পেরেছিলেন। সেদিনের

ইংরেজি-জানা লোকেরা এ আলোচনা পাঠ করে এর যুক্তিধারায় বিস্মিত হন, যুবকেরা তার নীতি-ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হন,—সেই সূত্রে 'ইয়ং বেঙ্গলের' যুক্তিবাদ উচ্ছৃঙ্খলতা-মুক্ত হয়ে উঠবার সুযোগ লাভ করে,—তাঁদের লক্ষ্যই শ্রেয়তর পথে সাধিত হতে থাকে।

'ধর্মনীতি' নামে অক্ষয়কুমারের গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয় অক্ষয়কুমারের অসুস্থ অবস্থায়, খ্রীঃ ১৮৫৬ অব্দে। সে গ্রন্থ যেন এই 'বাহ্যবস্তুর তৃতীয় ভাগ স্বরূপ। কর্তব্যাকর্তব্য, ধর্মাধর্ম থেকে দাম্পত্যজীবন, সন্তানপালন, ভ্রাতা-ভগ্নীর আচরণ, দাসদাসীর সহিত ব্যবহার প্রভৃতি গৃহধর্মের বহু প্রশ্নই এতে আলোচিত হয়েছে। এ বইও শিক্ষিত সাধারণের সমাদর লাভ করে। এসব গ্রন্থে অক্ষয়কুমার যে ধর্মনীতি ব্যাখ্যা করেছেন তা অধ্যাত্মধর্ম নয়, প্রধানত মনুষ্যধর্ম। এরূপ নতুন নীতিবোধ বা মূল্যবোধ আধুনিক যুগধর্মই পরিস্ফুট করে। ন্যায়-নীতি এ যুগে ঐহিক (secular) বিচার-বুদ্ধির দ্বারা স্থির হয়। পূর্ব-পূর্ব যুগে তা পারত্রিক ও পারমার্থিক পাপ-পুণ্যের ধারণার দ্বারাই স্থির হত।

অক্ষয়কুমারের প্রকাশিত পুস্তকের মধ্যে সর্বাধিক পরিচিত 'চারুপাঠ' ১ম, ২য় ও ৩য় ভাগ। প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয় খ্রীঃ ১৮৫২ অব্দে (১৭৭৪ শকাব্দে); দ্বিতীয় ভাগ খ্রীঃ ১৮৫৪ অব্দে (১৭৭৬ শকাব্দে); তৃতীয় ভাগ খ্রীঃ ১৮৫৯ অব্দে (১৭৮১ শকাব্দে)—তখন অক্ষয়কুমার কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। এ গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের তথ্য বিস্তার। উন-বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে প্রধান পাঠ্য পুস্তক হিসেবে 'চারুপাঠ বাঙালী শিক্ষার্থীদের মনকে তথ্যনিষ্ঠ করতে বিশেষ সহায়তা করেছে—বিংশ শতকেও তথ্যনিষ্ঠ পাঠ্য-পুস্তকের প্রয়োজন শেষ হয়নি—'চারুপাঠ' সে হিসাবে এখনো উল্টিয়ে দেখার মত।

'চারুপাঠে'ও পূর্বাপর সেই বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞান ও নীতিধর্ম প্রচারই অক্ষয়কুমারের উদ্দেশ্য ছিল।, তথাপি তিনি যে একেবারে কল্পনাবিমুখ লোক ছিলেন না তার প্রমাণ তৃতীয় ভাগের 'স্বপ্নদর্শনের' তিনটি প্রবন্ধ। ইংরেজ সুলেখক অ্যাডিসন-এর (Addisou) 'মির্জার স্বপ্ন' (Vision of Mirza) নামক বিখ্যাত কথাটি অবলম্বন করেই তা রচিত। অষ্টাদশ শতকের ইংরেজি সাহিত্য ও বস্তুনিষ্ঠ মনোভাব যদি বাঙলা গদ্যের গঠন-যুগে আরও অধিক প্রভাব বিস্তার করত, তা হলে বাঙলা গদ্য-সাহিত্যের উপকারই হত। সে দৃষ্টি ও

মনোভাব অন্তত অক্ষয়কুমার দত্ত যে আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন তার প্রমাণ শুধু উপরের গ্রন্থ কয়খানি নয়—তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়'।

ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় শুধু অক্ষয়কুমারের শ্রেষ্ঠ রচনাই নয়, এটি বাঙালীর গবেষণা-মূলক সাহিত্যের এক প্রধান ও প্রথম নিদর্শনও। আজও এর সমতুল্য গ্রন্থ এদিকে বাঙলায় রচিত হয়নি। 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' দুই ভাগে সমাপ্ত। প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয় খ্রীঃ ১৮৭০এ, দ্বিতীয় ভাগ খ্রীঃ ১৮৮৩তে—অর্থাৎ বাঙলা সাহিত্যে যখন সৃষ্টির সমারোহ। তৃতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়নি, তার কিছু কিছু প্রবন্ধ একালের মাসিকপত্রে প্রকাশিত হয়েছে (দ্রঃ ব্রজেন্দ্র—সাঃ সাঃ চঃ ১২)। এ গ্রন্থের সূচনা হয় 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার' পাতায়, তবে যথার্থ রচনা সম্পন্ন হয় যখন ভগ্নস্বাস্থ্য লেখক রোগ-যন্ত্রণায় প্রায় অচল। সেদিক থেকেও বাঙালীর জ্ঞাননিষ্ঠা ও অদম্য কর্মশক্তির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়। আর বিষয়গৌরবে ও লিপিকুশলতায় সত্যই তা 'masterpiece' (সুকুমার সেন—বাঃ সাঃ গদ্য, পৃঃ ৭৮)—'গুরু অবদান'।

অক্ষয়কুমারের প্রায় লেখার মূলেই ইংরেজি গ্রন্থ বা প্রবন্ধাদির আদর্শ আছে। সে হিসাবে 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের'ও মূল বা আদর্শ উইলসন (H. H. Wilson) রচিত 'হিন্দু ধর্ম সম্প্রদায় বিষয়ক চিত্রাবলী' ('Sketches on the Religious Sects of the Hindus) নামক ইংরেজি নিবন্ধসমূহ। তিনিও সহায়তা-লাভ করেছিলেন ফারসি ও নাভাজীর 'ভক্তমাল' থেকে, অক্ষয়কুমারের গ্রন্থের 'উপক্রমণিকায়' তা উল্লেখিত হয়েছে। উইলসনের নিবন্ধ প্রথম Asiatic Researches নামক গবেষণা-পত্রে প্রকাশিত হয়, পরে ১৮৬১-১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে রোস্ট (Rost) কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। তখন উইলসনের গ্রন্থাবলীতে 'হিন্দুধর্ম বিষয়ক নিবন্ধ ও বক্তৃতাবলী' (Essays and Lectures on Hindu Religion) নামে দু'খণ্ডে তা প্রকাশিত হয়। কিন্তু কোনো গ্রন্থেরই অক্ষয়কুমার নিছক অনুবাদক নন। উইলসন এক্ষেত্রে পথপ্রদর্শক নিঃসন্দেহে। অক্ষয়কুমার অনুগামী হলেও যোগ্য উত্তরসাধক। একথা জানলেই তা বোঝা যাবে যে, উইলসনের গ্রন্থে মোট ৪৫টি সম্প্রদায়ের কথা ছিল,

অক্ষয়কুমার দত্তের গ্রন্থে আছে মোট ১৮২টি সম্প্রদায়ের বিবরণ। উইলসন ছাড়াও অন্যান্য দেশীয় লেখকদের লেখা থেকে তিনি কিছু কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু অক্ষয়কুমারের নিজের সংগ্রহ প্রচুর, আর উইলসনের মত পূর্ববর্তীদের তথ্যাদিতেও তিনি বহুরূপে সংশোধন ও সংযোজন করেছিলেন। গ্রন্থের দু'ভাগে (মোট প্রায় ৩০০ পৃষ্ঠার) দু'টি 'উপক্রমণিকাও' অশেষ মূল্যবান্। প্রথম ভাগের উপক্রমণিকায় মূল আর্য (হিন্দ্-ইউরোপীয়), আর্য (হিন্দ্-ইরাণীয়) এবং ভারতীয় আর্য (ছান্দস্ ও সংস্কৃত) ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস আলোচিত হয়েছে। ভাষা-বিজ্ঞানের আলোচনা ভারতবাসী কর্তৃক এই প্রথম (সু: সেন—বা: সা: গদ্য পৃ: ৭৮)। সর্বসমেত এ গ্রন্থ যখন প্রকাশিত হতে থাকে তখন রাজেন্দ্রলাল মিত্র (এমন কি বঙ্কিমচন্দ্রও) এসব বিষয়ে আলোচনায় অগ্রসর হয়ে এসেছেন। কিন্তু তত্ত্ববোধিনীর লেখক শুধু তাঁদের অগ্রজ নন, অগ্রবর্তীও। অক্ষয়কুমারের আরও দু'একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা আছে, কিন্তু তাঁর অনেক প্রবন্ধ জীবিতকালে প্রকাশিত হয়নি। মৃত্যুর বহু পরে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে সেরূপ কিছু লেখা 'প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা ও বাণিজ্য বিস্তার নাম দিয়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছিলেন। তবু তাঁর সহযোগী রাজনারায়ণ বসুর ('বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা) কথা স্মরণীয় : "অক্ষয়বাবুর প্রণীত 'বাহ্যবস্তু' ও 'ধর্মনীতি' তাঁহার সর্বোত্তম গ্রন্থ নহে, উহা অনেক পরিমাণে ইংরেজির অনুবাদমাত্র (তখনো 'ভারতীয় উপাসক সম্প্রদায়' প্রকাশিত হয়নি, তাই বক্তা তার উল্লেখ করতে পারেননি—লেখক). তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশিত প্রাচীন হিন্দুদিগের বাণিজ্য. পাণ্ডবদিগের অস্ত্রশিক্ষা কলিকাতার বর্তমান দুরবস্থা প্রভৃতি তাঁহার স্বকপোলরচিত প্রস্তাবই তাঁহার সর্বোত্তম রচনা।"

অক্ষয়কুমার দত্ত তাই বাঙলা সাহিত্যে প্রায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অগ্রে ও তাঁর সঙ্গেই স্মরণীয়। তাঁর প্রধান কীর্তি—(ক) তিনি "য়ুরোপীয় ভাব-প্রচারের মিশনারি", তথ্যনিষ্ঠ জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলন ও প্রচার তিনিই বাঙলায় প্রথম আরম্ভ করেন—অনন্যচিত্তে ও সার্থকভাবে। এ প্রসঙ্গেই হয়ত বলা প্রয়োজন—তাঁর যুক্তিবাদে ও আলোচনায় দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখ ব্রাহ্ম সহযোগীরা 'বেদ অপৌরুষেয়' এই মত ত্যাগ করে ব্রাহ্মধর্মকে অনেকটা যুক্তিবাদী করে তোলেন। অক্ষয়কুমার নিজে অবশ্য নিরাকার উপাসনা ত্যাগ করে ক্রমে

অজ্ঞেয়বাদী (agnostic) হয়ে পড়েন—এটি শুধু তাঁর বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির ফল নয়, তাঁর সুদৃঢ় নীতিবোধেরও পরিচায়ক। (খ) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় যথার্থই বলেছেন—"তিনিই বাঙালীর সর্বপ্রথম নীতি-শিক্ষক।" এই বিষয় মাহাত্ম্য, গবেষণা প্রয়াস ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ছাড়াও, অক্ষয়কুমার স্মরণীয়। (গ) বাঙলা গদ্যে বহুবিধ কঠিন তথ্যের ও ভাবের প্রকাশ দক্ষ লেখক রূপে। আজ তা আমরা বুঝতে পারব না; কারণ, বাঙলা গদ্য এখন দাঁড়িয়ে গিয়েছে। তাই অক্ষয়কুমারের বাঙলাকে এখন মনে হয় তৎসম-কণ্টকিত গদ্য; তার গতি ব্যাহত, আর প্রায়ই খণ্ডিত। অবশ্য 'ভারতীয় উপাসক সম্প্রদায়' তা অনেকটা বিষয়ানুরূপ ঋজুতা লাভ করেছে (তবে তা গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে বঙ্কিম আবির্ভূত হয়েছেন)। প্রকৃতপক্ষে গদ্যের যা প্রথম উপযোগিতা তা হচ্ছে সাধারণ কাজ চালানো। তারপর, গদ্য হচ্ছে Age of Reason-এর স্বভাষা। সেই 'কাজের কথার গদ্য' ও যুক্তির আশ্রয় গদ্যভাষায় রচনার প্রথম চেষ্টা করেন অক্ষয়কুমার। কিন্তু এডিসন প্রমুখ এরূপ ইংরেজি গদ্যের স্রষ্টারা এ জাতীয় গদ্যে চমৎকার রসিকতার যোগান দিয়েছেন; অক্ষয়কুমারের গদ্যে তার বিশেষ অভাব। রসিকতা কেন, অক্ষয়কুমারের গদ্যে সরসতাও নেই, তা বিশুদ্ধ যুক্তিবাদের ভাষা। রসিকতা অবশ্য বাঙলা গদ্যের দুর্লভ গুণ, তা বিদ্যাসাগরেও প্রায় নেই। কিন্তু বিদ্যাসাগরের গদ্য নীরস বা নিরাবেগ গদ্য নয়, অথচ তিনিও যুক্তিধর্মী। এইজন্য বিদ্যাসাগরের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার্য।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১)

'তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ'—একথা উনবিংশ শতকের কীর্তিমান বাঙালীদের মধ্যে যাঁর সম্বন্ধে সবচেয়ে বেশি সত্য তিনি বিদ্যাসাগর। তাঁর ব্যক্তিত্ব তাঁর প্রারব্ধ বহু প্রচেষ্টার অপেক্ষাও মহত্তর। এ মানুষের স্বরূপ না বুঝলে সেই শতকের বাঙালী-প্রয়াস বোঝা অসম্পূর্ণ থাকে (বিশদ জীবনচরিত না পেলে সাহিত্য-জিজ্ঞাসুর পক্ষে এজন্য অবশ্যপাঠ্য স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিদ্যাসাগর-বিষয়ক প্রবন্ধ দু'টি, শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের লিখিত নানা বিবরণ, আর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বিদ্যাসাগর-গ্রন্থাবলী')।

জীবনকথা: ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বীরসিংহ গ্রামে ইং ১৮২০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। বীরসিংহ এখন মেদিনীপুরের অন্তর্ভুক্ত, তখন ছিল হুগলী

জেলার মধ্যে। অক্ষয়কুমার দত্ত ও বিদ্যাসাগরের একই বৎসর জন্ম, খ্রীঃ ১৮২০। দু'জনাই চাকরিজীবী ভদ্রঘরের সন্তান। দু জনার দৃষ্টিভঙ্গিতেও কতকাংশে মিল আছে, কিন্তু পার্থক্যও অনেক, সেকথা সাহিত্যবিচারকালে দেখা যাবে। যে কথাটি এখানে লক্ষণীয় তা এই যে, ঈশ্বরচন্দ্র যে পরিবারে জন্মেন সেদিনের গণনায়ও তা দরিদ্র মধ্যবিত্তের পরিবার। যে শিক্ষা তিনি লাভ করেন সেই ইংরেজি বিদ্যার যুগে তা 'সেকেলে শিক্ষা। তথাপি সেদিনের ভারতীয় জীবনের প্রাণকেন্দ্র কলকাতায় বিদ্যাসাগর যে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন তা তাঁর সমসাময়িক কোনো অভিজাত ভাগ্যবানেরও সাধ্য হয়নি। ছাত্র-স্থানীয় শিবনাথ শাস্ত্রীকে তিনি বলেছিলেন—"ভারতবর্ষে এমন কোনো রাজা মহারাজা নেই যার মুখের উপর এই চটিপরা পায়ের ঠোক্কর দিতে পারি না।" একথা অবশ্য বড়াই নয়, আত্মসচেতন বলিষ্ঠ পুরুষের সত্যকার আত্মবিশ্বাসের পরিচায়ক। বাঙালী মধ্যবিত্ত যে বুর্জোয়া ব্যক্তি-সত্তাবাদের মূল সত্যকে গ্রহণ করতে পেরেছে এবং সমাজ-নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হতে সক্ষম হয়েছে, একথা তারই প্রমাণ।

ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন সামান্য বেতনের চাকুরে। তিনি কলিকাতায় বারো টাকা মাইনের চাকরি করে সংসার চালাতেন। মনে হয়, ঠাকুরদাস সাধারণ নির্বিরোধ প্রকৃতির মানুষ ছিলেন—ঈশ্বরচন্দ্রের বিপরীত প্রকৃতির। কিন্তু বিদ্যাসাগরের পিতামহ পণ্ডিত রামজয় তর্কভূষণ ছিলেন প্রবল-চরিত্র নির্ভীক পুরুষ, আর ঈশ্বরচন্দ্রের মাতা ভগবতী দেবী ছিলেন সেদিনের দয়াবতী মহীয়সী নারী-চরিত্র। বিদ্যাসাগর এঁদের তপস্যারই যোগ্য উত্তরাধিকারী। গ্রামের পাঠশালার পাঠ শেষ করে ঈশ্বরচন্দ্র নয় বৎসর বয়সে পিতার সঙ্গে কলকাতায় পড়তে আসেন—তখন (খ্রীঃ ১৮২৯) হিন্দু কলেজের গৌরবের দিন, ডিরোজিয়ানদের উন্মেষকাল। ব্রাহ্মণপণ্ডিতের বংশের ছেলে তবু সংস্কৃত কলেজেই কুলোচিত বিদ্যালাভের জন্য যোগদান করেন (এ পর্যন্ত কাহিনী তাঁর অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে অনেকেই পাঠ করেছেন)। সংস্কৃত কলেজে ঈশ্বরচন্দ্র বারো বৎসরে প্রায় সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করে কৃতিত্বের সঙ্গে সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তখন (খ্রীঃ ১৮৪১) তিনি বিদ্যাসাগর উপাধি লাভ করেন। অবশ্য সে কলেজেই তিনি ইংরেজি শিক্ষা লাভ করেছিলেন, এবং এর পূর্বেই 'ল-কমিটির' পরীক্ষায়ও পাস করেছিলেন।

খ্রীঃ ১৮৪১ সালে জীবিকাক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর সসম্মানে প্রবেশ করতে পেলেন —প্রথমে তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান পণ্ডিত ও বাঙলা বিভাগের সেরেস্তাদার পদ প্রাপ্ত হন। ইংরেজ শাসকদের বাঙলা পড়াবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তখন ইংরেজি ও হিন্দী আরও আয়ত্ত করে নেন ; পাঁচ বৎসর পরে (খ্রীঃ ১৮৪৬) তিনি সংস্কৃত কলেজের অ্যাসিস্টাণ্ট সেক্রেটারির কার্যে নিযুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু একগুঁয়ে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে সেক্রেটারি রসময় দত্তের মত-বিরোধ হল, বিদ্যাসাগর এক বৎসর পরেই ফিরে আসেন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ট্রেজরের কাজ গ্রহণ করে। এ সময়েই (খ্রীঃ ১৮৪৭) প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম রচনা—ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্যপুস্তক—"বেতাল পঞ্চবিংশতি'। কিন্তু সংস্কৃত কলেজেই আবার তাঁর ডাক পড়ল ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে,—এই যুবক-পণ্ডিতের চরিত্র-শক্তি তখন ইংরেজ কর্তৃপক্ষের চোখে পড়েছে। বিদ্যাসাগর সে কলেজে সাহিত্যের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন এই শর্তে যে, কলেজের পরিচালনায় তাঁর সুপারিশ মত সংস্কার সাধন করা হবে। বারো দিনের মধ্যেই তিনি তাঁর সংস্কার প্রস্তাব পেশ করেন। কলেজের পাঠ্যপদ্ধতির সংস্কার ছাড়াও তিনি চাইলেন সংস্কৃত কলেজকে সংস্কৃতের অধ্যয়ন-কেন্দ্র রূপে সুগঠিত করতে,—সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভাষারও সৃজন-ক্ষেত্ররূপে গঠিত করতে। বিদ্যাসাগরের কর্মশক্তিতে কর্তৃপক্ষের আস্থা ছিল, তাই তাঁরা এ প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। পূর্ব প্রতিশ্রুতি মত বিদ্যাসাগরকে এবার তাঁরা সংস্কৃত কলেজের প্রিন্‌সিপাল নিযুক্ত করলেন। বিদ্যাসাগর আপনার মনোমত কর্মক্ষেত্র পেলেন। সংস্কৃত কলেজের নিয়ম-কানুন ও ব্যবস্থাপনায় তিনি আমূল পরিবর্তন সাধন করলেন। এ ভাবেই সে কলেজে তাঁর অনুগামী এক বাঙালী লেখক-গোষ্ঠীও গঠনের আয়োজন হল ; অপর দিকে 'উপক্রমণিকা', 'ব্যাকরণ কৌমুদী', 'ঋজুপাঠ' প্রভৃতি প্রণয়ন করে তিনি আধুনিক কালের বাঙালীর পক্ষে সংস্কৃতের ঐশ্বর্য ভাণ্ডারের প্রবেশপথ সুগম করে দিলেন। বাঙলা সাহিত্যের পক্ষেও এসব বই যে কত কল্যাণকর হয়ে ওঠে তা আধুনিক ভারতের অন্যভাষীদের তৎসম শব্দের বানান ও ব্যাকরণ-জ্ঞানের অভাব না দেখলে ঠিক উপলব্ধি করা যায় না। এই কর্মীপুরুষের বাস্তব-বুদ্ধি ও সংগঠন-শক্তি তখন শিক্ষাক্ষেত্রে সুপ্রমাণিত হয়ে গিয়েছে। তাই এর পরে (খ্রীঃ ১৮৫৩-এর সনদ পরিবর্তন-কালীন) শিক্ষা-সংস্কারের প্রত্যেকটি প্রস্তাবে কর্তৃপক্ষ তাঁর অভিমত গ্রহণ

করতে থাকেন। তাঁরই প্রস্তাবিত লোকশিক্ষার (প্রাথমিক-শিক্ষার) প্রস্তাব গ্রাহ্য হল। তাঁকে কর্তৃপক্ষ শিক্ষা-প্রদর্শকের কার্যভারও দেন। তাঁর উপরেই অর্পণ করেন তাঁর পরিচালনায় একশত 'বঙ্গ-বিদ্যালয়', ও স্ত্রীশিক্ষার জন্য 'বালিকা-বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব। সরকারী অর্থ সাহায্যের অপেক্ষা না করেই বিদ্যাসাগর এসব বিদ্যালয় স্থাপন করে যান, কিছুদিন পর্যন্ত তার ব্যয়-ভারও বহন করেন, অথচ তখনো বিদ্যাসাগরের বেতন সর্বসাকুল্যে পাঁচশত টাকা। অবশ্য এর পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর 'শকুন্তলা' (খ্রীঃ ১৮৫৪)। আর সঙ্গে সঙ্গে (খ্রীঃ ১৮৫৪) প্রকাশিত হয় বিধবা-বিবাহ প্রস্তাব বিষয়ক তাঁর দু'খানি বিখ্যাত গ্রন্থ—বাঙলাদেশে যাতে বিরোধের তুমুল তরঙ্গ উঠল।

সে আন্দোলন কথায়, ছড়ায়, এমন কি পরবর্তী কথা-সাহিত্যেও তার জের রেখে গিয়েছে। সাহিত্য-আলোচনায়ও তাই বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের কথা মনে রাখতে হয়। এই আন্দোলনের জন্যই বিদ্যাসাগরের জীবন-নাশের চেষ্টাও হয়, তাঁর তীব্র কর্তব্যবোধ তাতে বরং বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। সেই এক-গুঁয়ে প্রকৃতি খ্রীঃ ১৮৫৬ সালে রাজপুরুষদের সহায়তায় বিধবা-বিবাহ আইন পাস না করিয়ে ছাড়ল না। দেশের লোকের অনুমোদন অপেক্ষা বিজাতীয় সরকারের অনুমোদনের উপর নির্ভর করতে গিয়ে সম্ভবত বিদ্যাসাগর ভুলই করেন। তাঁর পৌরুষ ও মনুষ্যত্ব তার পরেও কিন্তু নিবৃত্ত হল না; বিধবা-বিবাহ কার্যত প্রবর্তনে তাঁকে ঠেলে নিয়ত এগিয়ে নিয়ে চলল। অসামান্য আন্তরিকতা, উদ্যম ও আপন পরিশ্রম ও অর্থব্যয়ে যা সম্ভব বিদ্যাসাগর পরবর্তী জীবনে (১৮৫৬-১৮৯১) বিধবা-বিবাহ প্রচলনের জন্য অকাতরে তা করেছেন। কিন্তু নানা বিরোধে, বিশেষ করে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের অভাবে, বাঙালী হিন্দু-সমাজে বিধবা-বিবাহ তথাপি তখন গ্রাহ্য হয় নি। তা সহজগ্রাহ্য হল বিংশ শতকের তৃতীয় বা চতুর্থ শতকে—যখন রাজনৈতিক-সামাজিক পরিবর্তনে বিলাত-যাত্রা, আহার, আচার-নিয়ম প্রভৃতি সকল শাস্ত্রীয় সংস্কারই আলগা হয়ে গিয়েছে; মধ্যবিত্তের পক্ষে ক্রমদারিদ্র্যে গলগ্রহ-স্বরূপ বিধবাকে পালন করা দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে, স্ত্রীশিক্ষা অগ্রসর হয়েছে এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতার নীতিতে যুবক-যুবতী নিজ অভিপ্রায় অনুযায়ী বিবাহ করতে পরাঙ্মুখ নয়। বিধবা-বিবাহ ব্যাপারে এই বহু-বিলম্বিত ভাব-পরিবর্তন মনে রাখলে 'বিষবৃক্ষ' থেকে 'চোখের বালি' পর্যন্ত অনেক উপন্যাসের কোনো

কোনো কাহিনীগত প্রশ্ন ও সমাধান হয়ত সহজবোধ্য হয়। খ্রীঃ ১৮৫৬-১৮৫৭-এর পরবর্তী যুগে বিদ্যাসাগরের স্বাধীন বৃত্তিতে সাফল্য, সর্বস্বীকৃত মহানুভবতা, শিক্ষাবিস্তারে ও সাহিত্য-প্রচারে তাঁর অক্লান্ত প্রয়াস কেন বাঙালী-জীবনে যথোচিত প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি,—এমন কি, কেন বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখদের তা বিরোধিতা লাভ করেছে,—তাও কতকটা বোঝা যায়। অবশ্য বাঙলা সাহিত্য তখন মাইকেল-বঙ্কিমের দানে আর এক নূতন স্তরে উঠে গিয়েছে তাও স্বীকার্য; সেই সৃষ্টি-সমৃদ্ধিতে বিদ্যাসাগরের দান তেমন আর আবশ্যক নেই।

সেই পর্বে (ইং ১৮৫৭-১৮৯১) বিদ্যাসাগরের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনা হল এই : খ্রীঃ ১৮৫৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হল, তিনি তার অন্যতম ফেলো' মনোনীত হলেন। তত্ত্ববোধিনী সভার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক তখন প্রায় দশ বৎসর ধরে চলছে। তিনি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকারও সম্পাদকমণ্ডলীর একজন ছিলেন; ১৮৫৫তে অক্ষয়কুমারের পরে পত্রিকার সম্পাদন-ভার তিনি গ্রহণ করেন। খ্রীঃ ১৮৫৫ সালে তিনি 'তত্ত্ববোধিনী সভার'ও সম্পাদক হলেন। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পরে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা (ভাদ্র ১৮১৩ শকাব্দ, পৃ ৯৫-৯৬) লেখেন, "বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহাতে মহাভারতের অনুবাদ করিতেন, এবং এই পত্রিকায় যে সমস্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত তাহার সংশোধনের ভারও তাঁহার হস্তে ছিল।" খ্রীঃ ১৮৫৯ সালে তিনি সরকারী চাকরিতে পদোন্নতি নেই বলে ও চাকরিতে স্বাধীনতা নেই বলে চাকরি ছেড়ে ব্যবসায়ে নামলেন—যে কালে ইংরেজি শিক্ষিতরাও চাকরিকে করে তুলেছেন 'স্বর্গ'। বিদ্যাসাগর তখন 'সংস্কৃত প্রেস ডিপোজিটরি' ও 'সংস্কৃত বুক ডিপো' স্থাপন করেন, নিয়মনিষ্ঠার সঙ্গে ব্যবসায় পরিচালনা করে তাতে সাফল্য লাভ করেন। 'সর্বদর্শন-সংগ্রহ', 'কুমারসম্ভব', 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্'. 'মেঘদূতম্, প্রভৃতি সংস্কৃত পাঠ্যগ্রন্থ বিচক্ষণভাবে তিনি সম্পাদন করেন; বাঙলা পাঠ্য গ্রন্থ প্রণয়নেও তাঁর শিথিলতা ছিল না।

মাইকেলের মত অমিতব্যয়ী প্রতিভা, দেশের প্রত্যেকটি সৎসাহসী কর্মী, বিপন্ন পীড়িত দুর্দশাগ্রস্ত অসংখ্য নর-নারী, ছোট বড় সকলের পক্ষে তিনি তখন দয়ার সাগর (শিবনাথ শাস্ত্রীর 'আত্মচরিতে' তার প্রমাণ যথেষ্ট)। তা ছাড়া, মেট্রোপলিটান স্কুলের পরিচালন-ভার গ্রহণ করে আপন কর্মদক্ষতায়

তিনি তাতে খ্রীঃ ১৮৭২ সালে প্রথম কলেজ বিভাগ খুললেন, খ্রীঃ ১৮৭৯তে তা প্রথম শ্রেণীর কলেজে উন্নীত হল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বাঙালীর প্রথম বে-সরকারী কলেজ এই মেট্রোপলিটান কলেজ, এখনকার বিদ্যাসাগর কলেজ। হিন্দু কলেজ স্থাপন করেছিলেন কলিকাতার দেশীয় ও বিদেশীয় অভিজাতবর্গ একযোগে; মেট্রোপলিটান কলেজ স্থাপনা ও পরিচালনা করেন এই সংস্কৃত-পড়া পণ্ডিত—রাজা, মহারাজা, জমিদার, ব্যবসায়ীরা কেউ নন. শিক্ষিত এক আত্মনির্ভর মধ্যবিত্ত দরিদ্র ব্রাহ্মণের সন্তান বিদ্যাসাগর। পারিবারিক ও সামাজিক আশাভঙ্গে তখন এই মানব-প্রেমিকের হৃদয় ক্ষতবিক্ষত। তিনি অনেক সময়েই তাই আশ্রয় নিতেন কারমাটারে সাঁওতালদের মধ্যে। এর উপরে খ্রীঃ ১৮৮৬ অব্দে গাড়ি উল্টিয়ে পড়ে তাঁর স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে গেল। পাঁচ বৎসর আরও নীরবে অতিবাহিত করে খ্রীঃ ১৮৯১তে ৭০ বৎসর বয়সে তিনি বিদায় নিলেন।

খ্রীঃ ১৮৫৭-এর পরে তাঁর প্রধান বাঙলা রচনা :—খ্রীঃ ১৮৬০ অব্দে প্রকাশিত 'সীতার বনবাস'; খ্রীঃ ১৮৬৪-১৮৬৮ প্রকাশিত 'আখ্যান-মঞ্জরী'র দুই ভাগ, তৃতীয় ভাগ সংযোজিত হয় খ্রীঃ ১৮৮৮তে; খ্রীঃ ১৮৫৯ অব্দে প্রকাশিত সেক্‌স্‌পীয়রের 'কমিডি অব্ এররস্' (Comedy of Errors) অবলম্বনে রচিত 'ভ্রান্তি-বিলাস' এবং খ্রীঃ ১৮৭১ ও খ্রীঃ ১৮৭৩-এ প্রকাশিত বহুবিবাহের বিরুদ্ধে রচিত দু'খানি পুস্তক। এ ছাড়া, অপ্রকাশিত রচনা যা ছিল তার মধ্যে পাওয়া যায় তাঁর অসম্পূর্ণ আত্মজীবনী (মৃত্যুর পরে খ্রীঃ ১৮৯১ সালে 'সাহিত্যে' প্রকাশিত), অন্তত একটি ব্যক্তিগত নিবন্ধ 'প্রভাবতী সম্ভাষণ' (খ্রীঃ ১৮৯২ অব্দে 'সাহিত্যে' প্রকাশিত)। কয়েকটি বিতর্কমূলক ব্যঙ্গ-বহুল বেনামী রচনাও তাঁর বলে এখন গ্রাহ্য হয়। খ্রীঃ ১৮৭২-এ বঙ্কিমের 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু বিদ্যাসাগরের পরবর্তী রচনারীতি তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে এরূপ মনে হয় না। আর পূর্ববর্তী রচনা বিষয়বস্তুতে ও ভাষাসম্পদে তার নিজস্ব।

রচনা পরিচয় : অবশ্য বিদ্যাসাগরের (এবং অক্ষয়কুমারের) 'নিজস্বতা' কিছু ছিল কি না, তা একটা প্রশ্ন। বঙ্কিমচন্দ্র 'বেতাল পঞ্চবিংশতি', 'শকুন্তলা', 'সীতার বনবাস', 'ভ্রান্তিবিলাস' প্রভৃতি উপাখ্যান-গ্রন্থের উল্লেখ করে বলেছেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রতিভাশালী লেখক হলেও আখ্যায়িকা-সংগ্রাহক মাত্র।

কথাসাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র আখ্যান-উদ্ভাবনার মৌলিকত্বকেই একমাত্র মৌলিকত্ব মনে করতেন। আসলে এটি যুক্তি নয়, বঙ্কিমের বিদ্যাসাগর-বিরোধিতা। কারণ, বিদ্যাসাগর শুধু উপাখ্যান রচনা করেন নি ; শুধু তথ্য-বহুল পাঠ্যপুস্তক রচনা করেও ক্ষান্ত হন নি ; তিনি বিতর্কমূলক পুস্তক, সাহিত্য এবং প্রবন্ধও রচনা করেছেন। তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত তাঁর 'আত্মজীবনী', 'প্রভাবতী সম্ভাষণ' ও বেনামা বিদ্রূপ-রচনা সেই মহাপুরুষের অদ্ভুততর শিল্পশক্তির পরিচায়ক। এসব কোনো কোনো রচনা সর্বাংশেই মৌলিক। এবং যদিও বিদ্যাসাগরের অধিকাংশ রচনা সত্যই সংগৃহীত, এবং শিক্ষাব্রতীর উদ্দেশ্যানুরূপ পাঠ্যপুস্তক মাত্র, কিন্তু কোনো ক্ষেত্রেই তা স্বকীয়তা-বর্জিত নয়। আর পুনঃপরিবেশনেও কলা-অভিনবত্ব রয়েছে—যেমন তা আছে কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীদাসের মহাভারতের মত সংগ্রহ-গ্রন্থে, যেমন তা আছে 'বর্ণপরিচয়ের' 'জল পড়ে, পাতা নড়ে' থেকে 'আখ্যান-মঞ্জরী'র মত নিছক পাঠ্যপুস্তকের সুস্থির পরিকল্পনায়, সুঠাম ভাষাসম্পদে। বঙ্কিম নিজেও সাহিত্য-রচনা করতে করতে বারে বারে প্রচারে নেমেছেন, বিদ্যাসাগর জ্ঞানপ্রচার করতে করতে বারে বারে সাহিত্য-রচনা করে বসেছেন। 'বিশুদ্ধ সাহিত্যরস' সেই শতাব্দীর জাতীয় আত্মপ্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ মনস্বীদের কারও বিশেষ অভীষ্ট ছিল না।

বিদ্যাসাগরের প্রথম গ্রন্থ (খ্রীঃ ১৮৪৭) সংগৃহীত উপন্যাস, 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' হিন্দী 'বেতালপচিশী' থেকে তা সংগৃহীত। তা পাঠ্যপুস্তকও। কিন্তু তাতেও বিদ্যাসাগরের বিশিষ্ট প্রতিভার স্বাক্ষর রয়েছে। নিশ্চয়ই এর গদ্যভাষা নির্দোষ নয় ; সংস্কৃত শব্দ প্রচুর ; 'গমন করিলেন' 'শ্রবণ করিলেন' প্রভৃতি সংযুক্ত ক্রিয়াপদ প্রয়োগ প্রায় তার নিয়ম, আর অসমাপিকা ক্রিয়ার পরিবর্তে 'করতঃ', 'প্রযুক্ত' 'পুরঃসর' প্রভৃতি শব্দ যেন বাক্যকে রজ্জুবদ্ধ করে রাখে। অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দের অঙ্কুশ-পীড়াও আছে। কিন্তু এসব হচ্ছে বিংশ শতকের গদ্য-পাঠকের আপত্তি; তবে এ আপত্তি একেবারে উড়িয়ে দেবার কারণ নেই। কারণ খ্রীঃ ১৮৪৮-এ বিদ্যাসাগর যখন 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' রচনা করেছেন, তখন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'প্রবোধচন্দ্রিকা' তাঁর সম্মুখে ছিল। তার সর্বত্র না হোক্, উৎকৃষ্ট অংশে সংস্কৃত-সমৃদ্ধ ভালো গদ্যের নিদর্শন আছে। 'প্রবোধচন্দ্রিকা'র রচনার পরে প্রায় ৩০ বৎসরে বাঙলা গদ্য আরও

পরিণত হয়েছে। তখন 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার'ও তৃতীয় বৎসর সমাপ্ত হয়েছে; অক্ষয়কুমার, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখদের রচনা-রূপও বিদ্যাসাগরের নিকট সুপরিচিত। কাজেই বিদ্যাসাগরের পক্ষে একেবারে আদর্শের অভাব ছিল না। কিন্তু এসব সত্ত্বেও বিদ্যাসাগর প্রারম্ভেই যা নির্মাণ করলেন তা কি বিশেষত্ব-বর্জিত, না, খ্রীঃ ১৮৪৭-এর পূর্বে প্রকাশিত কোনো রচনার অপেক্ষা নিকৃষ্ট? এ জাতীয় উপাখ্যান রচনার জন্ম অক্ষয়কুমার-দেবেন্দ্রনাথ অপেক্ষা 'প্রবোধচন্দ্রিকাকারেরই' ভাষা তুলনীয়। মৃত্যুঞ্জয়ের শ্রেষ্ঠ রচনাতেও সংস্কৃত ভাষার সৌন্দর্যকে বাঙলা সাধুভাষায় পরিবেশন করার শিল্প-প্রয়াস ছিল। কিন্তু বিদ্যাসাগর তাঁর ও অন্য সকলের অপেক্ষা সার্থকতা এ গ্রন্থেও আয়ত্ত করলেন যেমন দেখছি—এক, বাঙলা গদ্যের রূপ এতদিনে স্থিরতর হয়েছে, বাক্যে অপরিমিত দীর্ঘতা ত্যক্ত হয়েছে। তাই বিদ্যাসাগরের সংস্কৃত-বিদগ্ধ রসদৃষ্টি সংস্কৃত ভাষার সৌন্দর্যকে সত্যই বাঙলায় আত্মসাৎ করতে পেরেছে। তা সম্ভব হয়েছে দ্বিতীয় এক বিশেষ কারণে—বিদ্যাসাগরই বাঙলা গদ্যের স্বাভাবিক ছন্দকে সর্বপ্রথম ধরে ফেললেন। এ সত্যটি রবীন্দ্রনাথ প্রথম নির্দেশ করেন, পরে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার সেন প্রমুখ ভাষাতাত্ত্বিকরা বিশ্লেষণ করেও তা দেখান। আর বিদ্যাসাগরের পাঠকমাত্রই এ তত্ত্ব না জেনেও সেই ছন্দোমাধুর্যে বারে বারে বিমুগ্ধ হয়েছেন (এ প্রসঙ্গে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী'তে উদ্ধৃত সীতার বনবাসের প্রথম অধ্যায়ের 'এই সেই জনস্থানমধ্যবর্তী প্রস্রবণ গিরি'র বর্ণনাংশ স্মরণীয়)। ১৮৪৭-এর লেখা বেতাল পঞ্চবিংশতি তেও এই ছন্দোবোধ দেখা যায়, অবশ্য পরবর্তী রচনা—'শকুন্তলায়', 'সীতার বনবাসে', বা 'প্রভাবতী সম্ভাষণে', 'আত্ম-জীবনী'তে তার আরও সুপরিণত দৃষ্টান্ত লাভ করা যায়, তা না বললেও চলে (দ্রঃ সুঃ সেন—বাঃ সাঃ গদ্য)। অবশ্য 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' তা সত্ত্বেও তত সুখপাঠ্য নয়, তার কারণ দোষ-ত্রুটিতে এই প্রথম রচনা মাঝে মাঝে খণ্ডিত।

বাঙলা গদ্যের ছন্দোবোধ ও আবিষ্কার বিদ্যাসাগরের প্রধানতম কীর্তি। তাই বুঝে নেওয়া দরকার যে বাঙলা গদ্যের ছন্দ কি। পদ্যের মতই গদ্যেরও ছন্দ আছে, ড্রাইডেন যাকে বলেছেন the other harmony of prose তা পদ্যের ছন্দ-সুষমা অপেক্ষাও সুস্পষ্টতর ও স্বাভাবিক। মানুষের শ্বাসবায়ু নিজের প্রয়োজনেই কথার মধ্যে ছোট-বড় ছেদ খুঁজে নিয়ে শক্তি সঞ্চয় করে, এবং

বাক্যকে এগিয়ে নিয়ে চলে। বাক্য নিতান্ত ছোট না হলে বাক্যের অভ্যন্তরেও এজন্ত যতি-অর্ধযতির ব্যবস্থা করতে হয়। তাতে স্বাভাবিকভাবেই বাক্যের মধ্যে 'পর্ব' বিভাগ আসে। কিন্তু প্রত্যেক ভাষারই গদ্যের এই পর্ব-বিভাগ বিভিন্ন ধরনের—কারণ প্রত্যেক ভাষারই স্বরাঘাত (accent), সুর (intonation) প্রভৃতি বিষয়ে বৈশিষ্ট্য আছে। বাঙলার যা স্বাভাবিক যতি-নিয়ম তা বিদ্যাসাগরের কানে প্রথম ধরা পড়ে; আর তাই লিখিত ভাষায় balance বা 'সুষম বাক্যগঠন রীতি' সজ্ঞান ভাবে তিনি প্রবর্তন করলেন। নিজের অজ্ঞাতেও তা প্রয়োগ করেছেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার তা আমরা জানি। কিন্তু এই ভাষা-সৌষ্ঠববোধ না থাকাতে তাঁর লেখায় সেই সুষম গতি ও ছন্দঃস্রোত দুর্লভ—অথচ তিনিও সংস্কৃত-সমৃদ্ধ সাধুভাষার রচয়িতা। এবার এবিষয়ে রবীন্দ্রনাথের কথাটি উল্লেখ করছি :—

"গদ্যের পদগুলির মধ্যে একটা ধ্বনি-সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া, তাহার গতির মধ্য দিয়া একটি অনতিলক্ষ্য ছন্দ-স্রোত রক্ষা করিয়া সৌম্য ও সরল শব্দগুলি নির্বাচন করিয়া বিদ্যাসাগর বাঙলা গদ্যকে সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতা দান করিয়াছেন। গ্রাম্য পাণ্ডিত্য ও গ্রাম্য বর্বরতা উভয়ের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া তিনি ইহাকে পৃথিবীর ভদ্রসভার উপযোগী আর্যভাষারূপে গঠিত করিয়া গিয়াছেন।"

'বেতাল পঞ্চবিংশতি' অপেক্ষা পরবর্তী রচনায় বিদ্যাসাগরের তৎসম-প্রধান ভাষা আরও পরিণত সুষমালাভ করেছে। বিদ্যাসাগরের দ্বিতীয় গ্রন্থ —'বাঙলার ইতিহাস' (খ্রীঃ ১৮৪৯) মার্শম্যানের ইংরেজি বই এর শেষাংশ অবলম্বনে রচিত। তৃতীয় গ্রন্থ—'জীবনচরিত' ও চেম্বার্সে'র বই (Biography) থেকে সংগৃহীত। এসবও পাঠ্যগ্রন্থ। 'জীবনচরিত' ও 'চরিতাবলী' (খ্রীঃ ১৮৫৬) অবশ্য জীবনীসাহিত্যের সূচনা বলে গণ্য হতে পারে, 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' প্রভৃতির থেকে এ সবের প্রভেদ অনেক। এ ভাষার প্রধান গুণ হল সংস্কৃত-প্রাধান্যযুক্ত প্রাঞ্জলতা। অবশ্য স্বরচিত পাঠ্যপুস্তকেও একেবারে প্রাথমিক সরল ভাষা থেকে এরূপ সংস্কৃতসমৃদ্ধ ভাষাও যথেষ্টই তিনি প্রয়োজন মত যোজনা করেছেন। সে সবের মধ্যে সর্বাধিক পরিচিত 'বর্ণপরিচয়' (খ্রীঃ ১৮৫৪); আজও পর্যন্ত বাঙলার এ জাতীয় শিশুশিক্ষার ও বর্ণশিক্ষার বই-এর আশ্রয় এই 'বর্ণপরিচয়'।—তারপরে পাঠ্য হল 'কথামালা' (খ্রীঃ ১৮৫৬)—সেই গোপাল-রাখালের গল্প। 'বর্ণপরিচয়ে'র 'জল পড়ে পাতা নড়ে' এই সামান্য

কথা দু'টিই রবীন্দ্রনাথের শিশুমনের ছন্দঃ-অনুভূতি ও কল্পনাকে উদ্রিক্ত করেছিল (দ্রঃ 'জীবনস্মৃতি')। কথামালার ভুবনের মাসির কাহিনী শিশুপাঠ্য হলেও সরস কথা-সাহিত্য। 'বর্ণপরিচয়ের' পূর্বেই 'বোধোদয়' রচিত হয় (খ্রীঃ ১৮৫১), আর 'আখ্যান-মঞ্জরী' পরে (খ্রীঃ ১৮৬৩-১৮৬৮)। বিদ্যাসাগরের সাহিত্য-বোধের অপেক্ষাও তাঁর শিক্ষাদর্শের প্রমাণ এসব পাঠ্যপুস্তকে স্পষ্টতর। অবশ্যই, তাঁর স্বাভাবিক রসানুভূতি ও কলা-কুশলতা এসব বইতেও আছে। কিন্তু লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য তার বিষয়-নির্বাচনে ও সেই বিষয়ের প্রাঞ্জল পরিবেশনে। 'বোধোদয়ে' এমন একটি নিবন্ধ নেই যা মানুষের সামাজিক জীবনের পক্ষে অনাবশ্যক, বা ঐহিক জীবনের অতীত কোনো পারমার্থিক আদর্শের উদ্দেশ্যে যা রচিত। সকলেই জানেন পদার্থ' বিষয়ক নিবন্ধ দিয়ে বিদ্যাসাগর এ গ্রন্থ আরম্ভ করেছেন এবং প্রথম সংস্করণে নিরাকার চৈতন্য-স্বরূপ 'ঈশ্বরের' কথাও ছিল না, পরে 'তত্ত্ববোধিনী'র সুহৃদ্‌দের (সম্ভবত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের) অনুরোধে দেবেন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত এই প্রসিদ্ধ শব্দসমুচ্চয় সংযোজিত হয়। সাগরের জলে যাত্রীসুদ্ধ 'সেণ্ট লরেন্স' ডুবিয়ে দিয়ে ভগবান তাঁর কি মহিমা প্রকাশ করেছেন, বিদ্যাসাগর কোনোদিন তা বুঝতে পারেন নি, অপরকেও বোঝাবার চেষ্টা করেন নি। এদেশে তখনো কেন, এখনো কথায় কথায় বুদ্ধি ও যুক্তিহীন ভগবানের দোহাই, পরলোকের নামে হিতাহিত বোধ বিসর্জন, কর্মফল বা অদৃষ্টের নামে পুরুষকারের অবমাননাই প্রায় আধ্যাত্মিকতা বলে পরিচিত। এমন দেশে ঈশ্বরচন্দ্র পূর্বাপর মানব-কেন্দ্রিক, জীবন-নিষ্ঠ জ্ঞান প্রেম ও নীতিধর্ম প্রচার করতে চেয়েছেন। 'হিউম্যানিজম' বা এই মানব-কেন্দ্রিক নূতন জীবনাদর্শের তিনিই পথিকৃৎ—বিদ্যাসাগর যেন উনবিংশ শতকের গৌতম বুদ্ধ। কোনো অলৌকিক বা ধর্ম-সম্পর্কিত ভাববাদের বাষ্পকেও তিনি তাঁর কোনো লেখায়, নিবন্ধে, কাহিনীতে প্রশ্রয় দিতে চান নি। এই সত্যের আরও জলন্ত প্রমাণ দেখি 'আখ্যান-মঞ্জরী' ও 'বোধোদয়ের' নির্বন্ধে কথায়। 'আখ্যান-মঞ্জরীতে' গল্প দিয়ে বক্তব্য রসোজ্জ্বল করা হয়েছে। অক্ষয়কুমার দত্তের নীতিকথা শুষ্ক তথ্যবহুল বলে বিদ্যাসাগর তা গল্প দিয়ে সরস করেছেন। সভ্য অসভ্য সর্বজাতির মানুষের নানা সত্য ঘটনা ও কাহিনী তিনি সংকলন করেছেন। পাশ্চাত্ত্য জাতিদের তুলনায় আরব বা আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার আদিম জাতিদের কোন কোন দিকে উচ্চতর

নীতিবোধের গল্পও তিনি যথার্থ মানব-বন্ধুর মত স্বচ্ছন্দচিত্তে বিবৃত করেছেন। কিন্তু 'আখ্যান-মঞ্জরী'র তিন ভাগে কোথাও নেই একটিও ভগবদ্‌ভক্তের কাহিনী এবং সম্ভবত সেই কারণেই নেই একটিও ভারতীয় কোন নারী-পুরুষের কাহিনী। অথচ বিদ্যাসাগর 'মহাভারতের' অনুবাদ আরম্ভ করেছিলেন (খ্রীঃ ১৮৪৯-এ তত্ত্ববোধিনীতে); পরে কালীপ্রসন্ন সিংহ সে কার্যভার গ্রহণ করাতে তিনি মহাভারতের উপক্রমণিকা অংশ অনুবাদ করে তা ছেড়ে দেন। আরও পরে, রমেশচন্দ্র দত্তের 'ঋগ্‌বেদ' অনুবাদে তিনি উৎসাহ ও সহায়তা-দান করেছেন। 'মেঘদূত', 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' প্রভৃতি সংস্কৃত কাব্যাদি ছাত্রদের জন্য সম্পাদনায়ও তিনি যথার্থ বিচার ও গুণগ্রাহিতার পরিচয় দান করেন—তাঁর স্বদেশ-প্রীতিতে সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু এই চটি-চাদর-ধারী পণ্ডিত মানসিক ক্ষেত্রে (মাইকেলের উক্তি স্মরণীয়) ইংরেজের অপেক্ষাও বড় ইংরেজ ছিলেন এজন্য যে, তিনি ইংরেজ-জাতির প্রথম সংলব্ধ বুর্জোয়া (বা নবযুগের) যুগধর্মকে মনেপ্রাণে বরণ করেছিলেন; এবং ভারতীয় মধ্যযুগের সমাজকে জ্ঞানে, কর্মে, প্রেমে প্রাণপণে সংস্কার করে সেই জীবন নিষ্ঠ সাধনায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। এজন্য 'তত্ত্ববোধিনী'র সদস্য হয়েও বেদান্তপ্রতিপাদ্য ধর্মের বা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ধর্মান্দোলনেও তিনি যোগদান করেন নি। এমন কি, 'জাতীয় মেলা'র জাতীয় উদ্বোধনসংকল্প ও 'ভারত সভার' রাজনৈতিক আন্দোলন থেকেও তিনি দূরে ছিলেন। এটি অবশ্য তাঁর উগ্র আত্মস্বাতন্ত্র্য ও সীমিত ইতিহাস বোধেরও পরিচায়ক—শিক্ষা-প্রচার সমাজ-সংস্কার প্রভৃতি কোনো প্রয়াসকেই জাতীয় আত্মপ্রতিষ্ঠার সর্বাঙ্গীণ প্রয়াস থেকে খণ্ড করে দেখা যায় না। এই রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা বিশেষ করে পরাধীন দেশের মানুষের পক্ষে একটা অস্বাভাবিক আত্ম-সংকোচন। বিদ্যাসাগরের চরিত্রের এইটি প্রধান ত্রুটি; দ্বিতীয় ত্রুটি—তাঁর একগুঁয়েমি, স্বমতপ্রিয়তা।

'আখ্যান-মঞ্জরী'র লেখক বিদ্যাসাগর গল্পের মূল্য জানতেন। উপাখ্যান রচনায়ও তিনি গল্প উদ্ভাবনা করেন নি, কিন্তু সরসভাবে গল্প বলেছেন। কালিদাসের কল্যাণে শকুন্তলা চিরমধুর। বিদ্যাসাগরের 'শকুন্তলা'য় (খ্রীঃ ১৮৫৪) সেই মাধুর্য রক্ষিত হয়েছে। বিদ্যাসাগরের সমকালে আরও কয়েকখানা শকুন্তলা নানা লেখক রচনা করেছিলেন; সে সবের সঙ্গে তুলনা করলে

বোঝা যায় -বিদ্যাসাগরের শকুন্তলা' শুধু কালিদাসের সার্থক অনুবাদ নয়, অভিনব রূপান্তরও। আধুনিক কালের রুচিবোধের সঙ্গে কালিদাসের কালের রূপ-মোহের সহজ সমন্বয় সাধন করেছে বিদ্যাসাগরের রসবোধ। 'সীতার বনবাস'ও (খ্রীঃ ১৮৬০) শুধু আহরণ নয়; ভবভূতি ও বাল্মীকির সমন্বিত রূপায়ণ। রাজনারায়ণ বসু সত্যই বলেছেন—"উহা তাঁহার একপ্রকার স্বকপোল-রচিত গ্রন্থ বলিলে হয়।" শকুন্তলার কাব্য-লালিত্য অপেক্ষা 'সীতার বনবাসে' স্বভাবতই এসেছে ভবভূতির বেদনা-গাম্ভীর্য ও বাল্মীকির করুণামাধুর্য'; বিদ্যাসাগরের উদ্বেল অশ্রুধারাও তাই সংস্কৃত শব্দের সংহত যোজনায় গম্ভীর ও সংযত-প্রবাহ। 'ভ্রান্তিবিলাস' (খ্রীঃ ১৮৬৯) প্রহসন-মূলক আখ্যায়িকা—বিদ্যাসাগরের সার্থক রচনার অন্তর্ভুক্ত নয়। তথাপি বিষয়গুণেই বিদ্যাসাগরের ভাষাও এখানে লঘুগতি। অর্থাৎ আখ্যায়িকার হিসাবেও দেখা যায় 'বিদ্যাসাগরী ভাষা'র ছন্দ কত বিচিত্র।

'বিদ্যাসাগরী ভাষা'র সম্বন্ধে যে ধারণা আমাদের মনে বদ্ধমূল হয়েছে, তা অনেকটা সংশোধন করতে হয় বিদ্যাসাগরের অন্যান্য রচনার কথা স্মরণ করলে। প্রধানত সে সব রচনা প্রচার-মূলক; কিন্তু শিক্ষাকে যাঁরা জীবনের ব্রত করেন, তাঁদের কোন্ রচনা প্রচারমূলক নয়? অবশ্য প্রচার ও শিক্ষায় পার্থক্য আছে, আর প্রচার ও প্রকাশে পার্থক্য আরো বেশি। বিদ্যাসাগরের এসব লেখা (রাজনারায়ণ বসুর ভাষায় তাঁর "স্বকপোল-রচনা"। তার মধ্যে প্রথম প্রকাশিত হয় (খ্রীঃ ১৮৫৩) বেথুন সোসাইটিতে খ্রীঃ ১৮৫১-তে পঠিত 'সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব'। বিদ্যাসাগরের পাণ্ডিত্য ও রসগ্রাহিতায় তা সমুজ্জ্বল। সাহিত্যের সমালোচনা এই প্রথম নয়। বেথুন সভায় ১৮৫২-এর ১৩ই মে তারিখে পঠিত রঙ্গলালের 'বাঙ্গলা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ' নামক ইংরেজি ও বাঙলা সাহিত্যের তুলনামূলক মূল্যবান প্রবন্ধটি মাঝখানে খ্রীঃ ১৮৫২ তে প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনায় বিদ্যাসাগরের লেখাটিই প্রথম সার্থক প্রবন্ধ (ডঃ সুকুমার সেনের এ মর্মের কথা নিশ্চয়ই সত্য)। নানা কারণেই এ প্রবন্ধের অপেক্ষা অনেক বেশি স্মরণীয় বিধবা-বিবাহের স্বপক্ষে রচিত বিদ্যাসাগরের গ্রন্থ দু'খানি—খ্রীঃ ১৮৫৫ এর প্রথম ভাগে রচিত 'বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব', এবং সে বৎসরেই এ পুস্তকের প্রতিবাদ-খণ্ডনে লিখিত

ও প্রকাশিত 'বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব, দ্বিতীয় পুস্তক।' এসব গ্রন্থে রামমোহন রায়ের অনুরূপে তিনিও শাস্ত্র-বচন দ্বারা যুক্তি প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি গ্রহণ করেন এবং শাস্ত্রজ্ঞান, যুক্তি-কৌশল, বিনয় ও মর্যাদা-বোধের যে পরিচয় এসব গ্রন্থে পাওয়া যায়, তাতেও রামমোহনের কথা মনে পড়ে। তবে রামমোহন উত্তর-প্রত্যুত্তরে তার্কিক (ডায়েলেক্‌টিশিয়ান্‌), আর বিদ্যাসাগর যুক্তি-নিপুণ প্রবন্ধকার। বিদ্যাসাগরের ভাষার পরিণতরূপ রামমোহনের কালে আশা করা অন্যায়। রামমোহন বা মৃত্যুঞ্জয় কেন, গম্ভীর যুক্তিসিদ্ধ রচনায় এই প্রাঞ্জলতা অক্ষয়কুমার দত্তের মত সহযোগীর লেখায়ও নেই। বহুবিবাহের বিরুদ্ধে রচিত বিদ্যাসাগরের গ্রন্থ দু'খানি পরবর্তীকালে রচিত; 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচার' প্রকাশিত হয় অনেক পরে খ্রীঃ ১৮৭১ অব্দে। আর ঐ নামের দ্বিতীয় পুস্তক' প্রকাশিত হয় খ্রীঃ ১৮৭৩ অব্দে। দু'খানিতেই বিদ্যাসাগরের এই বিচার-দক্ষতা ও ভাষারীতি সমভাবে প্রমাণিত হয়। এ দু' বিষয়ের পুস্তক ক'খানা হচ্ছে— 'সারগর্ভ যুক্তিসমেত রচনার নিকষস্থল।'

কিন্তু জীবিতকালে যে বিদ্যাসাগরের সন্ধান পেয়েও পাওয়া যায় নি তাঁর মৃত্যুর পরে সেই বিদ্যাসাগর আমাদের নিকট আরও প্রকাশিত হয়েছেন তাঁর কয়েকটি অপ্রকাশিত রচনা মারফৎ। এর মধ্যে তাঁর অসমাপ্ত 'আত্মজীবনী' শ্রেষ্ঠ ও ইদানীং তা সুপরিচিত। কিন্তু 'প্রভাবতী সম্ভাষণ' তত সুবিদিত ছিল না, বেনামী লেখাও দুষ্প্রাপ্য ছিল। পাঁচটি বেনামী রচনার মধ্যে 'কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য' প্রণীত প্রথম নিবন্ধ 'অতি অল্প হইল' (খ্রীঃ ১৮৭৩) দ্বিতীয় নিবন্ধ 'আবার অতি অল্প হইল' (খ্রীঃ ১৮৭৩) লেখা দুটি বহুবিবাহ বিষয়ে তারানাথ তর্কবাচস্পতির প্রতিবাদের বেনামী উত্তর-প্রত্যুত্তর। তৃতীয় রচনা 'কবিকুলতিলকস্য কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য প্রণীত' 'ব্রজবিলাস' (খ্রীঃ ১৮৮৫), নবদ্বীপের ব্রজনাথ বিদ্যারত্নের বিধবা-বিবাহ বিরোধী সংস্কৃত বক্তৃতার উত্তর। চতুর্থখানা 'কস্যচিৎ তত্ত্বান্বেষিণঃ' প্রণীত 'বিধবা-বিবাহ ও যশোহর হিন্দুধর্মরক্ষিণী সভা' (খ্রীঃ ১৮৮৪) বিদ্যারত্ন ন্যায়রত্ন স্মৃতিরত্ন উপাধিধারী তিনজন পণ্ডিতরত্নের প্রকৃত পরিচয় প্রদান করে বেনামীতে লেখা। পঞ্চম রচনা 'রত্নপরীক্ষা' (খ্রীঃ ১৮৮৬) 'কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপো সহচরস্য প্রণীত।' কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য (পুরাতন প্রসঙ্গ' ১ম পর্যায়, পৃ. ২১৩-১৬) ও

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ('বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ') দু'জনারই মতে এসব বিদ্যাসাগর মহাশয়েরই রচনা। এসব রচনায় যে ব্যঙ্গপ্রিয়, রঙ্গমুখর বিদ্যাসাগরকে দেখা যায় তিনি আর-এক মানুষ—এ ভাষাও যেন আর-এক ভাষা। এখনকার কথ্য-ভাষার রূপ তখনো লেখায় স্থির হয়ে ওঠেনি; কিন্তু এসব রচনায় বিদ্যাসাগরের সাধুভাষা যেন আপনার পোশাক ছেড়ে কথ্যভাষায় নেমে আসতে পারলে খুশী হয়। বিদ্যাসাগরের ভাষা যে কত বিচিত্র তা 'বিদ্যাসাগরী ভাষা' জানলেও জানা যায় না।

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য সত্যই বলেছেন, "এই রসিকতা সে কালের ঈশ্বর গুপ্ত বা গুড়গুড়ে ভট্টাচার্যের মত গ্রাম্যতা দোষে দূষিত নহে; ইহা ভদ্রলোকের সুসভ্য সমাজের যোগ্য; এবং পিতাপুত্রে একত্রে উপভোগ্য। এরূপ উচ্চ অঙ্গের রসিকতা বাঙ্গলা ভাষায় অল্পই আছে এবং ইহার গুণগ্রাহী পাঠকও বেশী নাই।" এ কথা তথাপি সত্য—এই বেনামী রচনার ভাষা বিদ্যাসাগরের ভাষার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন নয়; তবে তার একটি বিশিষ্ট দিক। বিশিষ্ট ও শ্রেষ্ঠ—এই দুই বিশেষণই প্রযোজ্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অন্য দু'টি লেখা—'**প্রভাবতী সম্ভাষণ**' (প্রকাশিত ১৮৯২) ও অসমাপ্ত আত্মচরিত '**বিদ্যাসাগর চরিত**' (প্রকাশিত ১৮৯১)। 'প্রভাবতী সম্ভাষণ' রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আড়াই বৎসরের বালিকা কন্যা স্নেহাস্পদা প্রভাবতীর মৃত্যুতে বিদ্যাসাগরের একটি শোকোচ্ছ্বাস—ব্যক্তিগত শোক, বেদনা ও অশ্রুজলের ধারায় প্রত্যেকটি ছত্র অভিষিক্ত। গদ্যকাব্য জাতীয় এ রচনা একটি পবিত্র রচনা—তাতে সাহিত্যিক মাত্রা ও সংযত কলা-কৌশলের একটু অভাব আছে, বলা যায়। কিন্তু 'বিদ্যাসাগর চরিত' আর এক ঠাটে বাঁধা—বিবরণের, আখ্যানের, জীবন-চরিতের ও উপন্যাসের মত চরিত্র-চিত্রের সম্পদে তা বিদ্যাসাগরের প্রাঞ্জল, সরস ভাষার অনুপম কীর্তি। রামজয় তর্কভূষণ, রাইমণি প্রভৃতি চরিত্রচিত্রের সঙ্গে যে কৌতুকপ্রদ সরসতার নিদর্শন বিদ্যাসাগর এ অসমাপ্ত গ্রন্থে রেখে গিয়েছেন, তা ঔপন্যাসিক বঙ্কিমেরও কাম্য হত। অন্তত এ সব গ্রন্থ পূর্বে প্রকাশিত হলে বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে বলা সম্ভব হত না—বিদ্যাসাগর সংস্কৃত শব্দ ঢুকিয়ে বাঙলা ভাষার গোড়ার দিকটা মাটি করে দিয়ে গিয়েছেন। এই আত্মজীবনীর ভাষা এখনো বাঙলার আদর্শ গদ্যভাষা। অবশ্য এ গ্রন্থ অনেক পরে রচিত, তার পূর্বে সম্ভবত বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে বাঙলা ভাষা সরলতা ও

স্বাচ্ছন্দ্য দুই-ই লাভ করেছে। খ্রীঃ ১৮৯৫-তে রচিত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের 'আত্মজীবনী'র রসগ্রহণ কালেও একথা বলা যায়। সে 'আত্মজীবনী' আধ্যাত্মিকতায় অনুপ্রাণিত আরেক ধারার লেখা, তা জীবনচিত্র নয়। বিদ্যাসাগরের 'আত্মজীবনী' সম্পূর্ণ হলে সম্ভবত তা শিবনাথ শাস্ত্রীর 'আত্মচরিতের' ধারার প্রথম ও প্রধান গ্রন্থ হয়ে থাকত—ঊনবিংশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হত।

সাহিত্যকীর্তি দিয়ে বিদ্যাসাগরের পরিমাপ হবে না, তা পূর্বেই বলেছি। তাঁর সাহিত্যকীর্তির যথার্থ পরিমাপ বঙ্কিমচন্দ্র করতে পারেন নি,—তা বঙ্কিমচন্দ্রের সামাজিক সংকীর্ণদৃষ্টির ফল। বঙ্কিমের ব্যক্তিগত দুর্ভাগ্য—তিনি উদার ছিলেন না। বিদ্যাসাগরের কীর্তির যথার্থ পরিমাপ করেছেন বঙ্কিমেরই গুণগ্রাহী রবীন্দ্রনাথ। আর, তিনি এ সত্যও বুঝেছিলেন—এ মানুষ আপন মহিমায় একক। সে মহিমা তাঁর পৌরুষ, তাঁর অখণ্ড মনুষ্যত্ব—এবং আজ যা আমরা বিশেষ করে বুঝি—তাঁর মানবধর্মিতা, যা ছিল তাঁর স্বধর্ম।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫)

সাহিত্যিক পরিচয়ে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিচয়ও সম্পূর্ণ হয় না। প্রসিদ্ধ পিতার পুত্র হয়েও তিনি বাঙলার ইতিহাসে প্রসিদ্ধতর পুরুষ,—আর সাহিত্যের খাতায় অসামান্য পুত্র-কন্যার পিতা হয়েও তিনি অসামান্য। কিন্তু সে সাহিত্য-যশোলাভে তিনি নিস্পৃহ ছিলেন। 'মহর্ষি' খ্যাতির জন্য দেবেন্দ্রনাথের সাহিত্যিক সাফল্যও কতকটা বিস্মৃত। না হলে তত্ত্ববোধিনী সভা ও পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে তিনিই সে পর্বের প্রধান পুরুষ বলে গণ্য হবার অধিকারী। বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার প্রভৃতির অপেক্ষাও তিনি দীর্ঘজীবী হয়েছিলেন। ধর্মান্দোলনে, হিন্দুসমাজের সংস্কারমূলক সংরক্ষণে, শিক্ষাবিস্তারে, এমন কি রাজনৈতিক চেতনা-প্রসারেও তিনি এই 'প্রস্তুতির পর্বে' বাঙালী জীবনের অদ্ভুতকর্মা পুরুষ। তাঁর জীবনের এ পর্বের (১৮ বৎসর থেকে ৪১ বৎসর) কথাই তাঁর 'স্বরচিত জীবনচরিতে'ও তিনি বিবৃত করেছেন। অবশ্য তাঁর মুখ থেকে সে জীবনচরিত ইং ১৮৯৪ অব্দে অনুলিখিত হয় ও প্রকাশিত হয় ইং ১৮৯৮ অব্দে। দেবেন্দ্রনাথের লিখিত গ্রন্থের মধ্যে একমাত্র 'ব্রাহ্মধর্ম' (১৭৭৩ শকাব্দ = ১৮৫১-৫২ ইং) ও 'আত্মতত্ত্ববিদ্যা' (ইং ১৮৫২) কাল

হিসাবে এ পর্বে প্রকাশিত। 'ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা' (ইং ১৮৬২) ও 'ব্রাহ্ম-ধর্মের ব্যাখ্যান' (ইং ১৮৬৯-১৮৭২) পরবর্তীকালে প্রকাশিত হয়;—তখন বাঙলা সাহিত্যের নবগঙ্গায় বান ডাকছে। কিন্তু তিনি ব্রাহ্মসমাজে উপদেশ ও বক্তৃতা উপলক্ষ্যে নানা উপদেশ ও ব্যাখ্যান পূর্বাপর দিচ্ছিলেন, তা 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়' সে সময়ে প্রকাশিত হত। যেমন (ইং ১৮৬০-এ প্রকাশিত) 'ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাস', (ইং ১৮৬১তে প্রকাশিত) দুর্ভিক্ষের সাহায্যে ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা,—ভাবে-ভাষায় তা তাঁর নিজস্ব ভাবুকতায় সমুজ্জ্বল। যাই হোক, তত্ত্ববোধিনীর পর্ব থেকে তত্ত্ববোধিনীর প্রতিষ্ঠাতাকে বাদ দেওয়া যায় না—এ-পর্বেই তিনি আলোচ্য। পরবর্তী পর্বে বহুদিন পর্যন্ত ব্রাহ্মধর্ম-সংগঠনে তিনি তেমনি উৎসাহী ছিলেন, কিন্তু বাইরের দিক থেকে ক্রমে আপনার কর্মভার কমিয়ে আনেন। যেমন, ১৮৫৯-এর পরে তাঁর ধর্মান্দোলনের কর্মে তিনি কেশবচন্দ্র সেনকে সহযোগীরূপে গ্রহণ করে তাঁকে প্রায় নেতৃত্বে অভিষিক্ত করেন। অন্যদিকে ক্রমেই দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ তাঁর পুত্ররাও উদ্যোগে-আয়োজনে ('জাতীয় মেলা', ১৮৬৭) অগ্রসর হয়ে আসতে থাকেন। দেবেন্দ্রনাথ অবশ্য আদি ব্রাহ্মসমাজের দায়িত্বভার ত্যাগ করলেন না, কিন্তু ক্রমেই অধ্যাত্মচিন্তাতে বেশি ব্যাপৃত হয়ে পড়েন। কাজেই, শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের সেই বহু-প্রয়াসে কল্লোলিত পর্ব অপেক্ষা প্রথমার্ধের এই প্রস্তুতির পর্বেই দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যিক দানের কথা আলোচ্য। আত্মজীবনীর ভাষায় বাঙলা গদ্যের যে অপূর্ব রূপ দেখি তা প্রথমাবধিই তাঁর রচনায় লক্ষ্য করা যায়। তবে কতকাংশে বাঙলা ভাষারও মধ্যবর্তীকালের (ইং ১৮৫৭-১৮৯৫ পর্যন্ত) বিকাশেরও একটা প্রমাণ সে গ্রন্থ। কিন্তু সে 'জীবন-চরিতের' গদ্যের অপূর্ব রস দেবেন্দ্রনাথেরই নিজস্ব—পুত্র-কন্যাদের সঙ্গে সেখানে তিনি সমধর্মী, তাঁদের ভাবুকতার মূল উৎস দেবেন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্য প্রয়াস।

দেবেন্দ্রনাথের অন্তর্মুখী জীবনও যে কালধর্মে কত বহুমুখী ধারায় প্রবাহিত হয়েছে, এখানে তা বলা সম্ভব নয়। (সেজন্য সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়ের সম্পাদিত জীবন-চরিত, অজিতকুমার চক্রবর্তীর লিখিত 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর' এবং অন্তত 'সাঃ সাঃ চ'-র ৪৫ সংখ্যক 'চরিত', যোগেশচন্দ্র বাগলের 'দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর' অবশ্য দ্রষ্টব্য।) 'প্রিন্স' দ্বারকানাথ ঠাকুরের তিনি জ্যেষ্ঠ

পুত্র ; অপ্রতুল ধনী দ্বারকানাথ ছিলেন রামমোহন রায়ের পক্ষাবলম্বী— সেদিনের উদ্যোগী বাঙালী বণিক। পিতৃ-বন্ধু রামমোহন রায়ের 'অ্যাংলো-হিন্দু স্কুলে' রামমোহনের কনিষ্ঠ পুত্র রমানাথ রায়ের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের শিক্ষারম্ভ হয়। পরে তিনি হিন্দু স্কুলে ৪ বৎসর কাল পড়েন—তখন ডিরোজিও সে স্কুল থেকে অপসৃত। ইংরেজি ভাব ও নাস্তিকতার বিরুদ্ধে তখন হাওয়া বইতে শুরু করেছে। রামমোহন রায়ের স্কুলের ছাত্ররা বাঙলা ভাষার অনু-শীলনেও অনুরাগী ছিল। তাদের (ইং ১৮৩২) প্রতিষ্ঠিত 'সর্বতত্ত্বদীপিকা' সভার সম্পাদক ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রমাপ্রসাদ রায়। বাঙলায় কথোপকথন ছিল এই সভার নিয়ম। হিন্দু স্কুল ত্যাগ করে (ইং ১৮৩৬ ?) দেবেন্দ্রনাথ পিতার 'কার-টেগোর কোম্পানি' (স্থাপিত ইং ১৮৩৪), 'ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক' (স্থাপিত ১৮২৯) প্রভৃতির তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা তাঁর কাজে যোগ দেন। বাঙলার শেষ কৃতী শ্রেষ্ঠী দ্বারকানাথ ; বুর্জোয়া পদ্ধতিতে ব্যাঙ্ক, ইনসিওরেন্স, আমদানী-রপ্তানী সবই তিনি করতেন। কিন্তু ইতিমধ্যেই এরূপ বাণিজ্যক্ষেত্রে দেশীয়দের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠছিল—ব্রিটিশ বণিকশক্তি তখন যন্ত্রযুগের পত্তন করে অপরিমিত বলের অধিকারী, ভারতের ক্ষেত্রে তারা সর্বজয়ী না হয়ে আসবে না। দ্বারকানাথও জমিদারী ক্রয় করে বিলাসে-আড়ম্বরে সকলের চমক লাগিয়ে বিলাতে মারা গেলেন। 'কার-টেগোর কোম্পানি' ১৮৪৭-এর সঙ্গেই শেষ হয়, 'ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক'ও ১৮৪৮-এর ১৫ই জানুয়ারী কাজ বন্ধ করে। এ ব্যাঙ্কের সঙ্গে শুধু বাঙালীর বৈষয়িক উদ্যোগ-আয়োজন নয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভাণ্ডার ('হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয়ের') পর্যন্ত জড়িত ছিল। এসব কারণে, ইং ১৮৩৮-এই চাকরির দিকে যে বাঙালী শিক্ষিতের দৃষ্টি পড়েছিল, ১৮৪৮-এর পরে তা আর ব্যবসায়ের দিকে ফিরে আসবার তেমন কারণ রইল না। হয় জমিদারি, নয় চাকরি বা শিক্ষিত বৃত্তি ('ওকালতী, ডাক্তারী' প্রভৃতি), শিক্ষিতদের জীবিকার এসবই অবলম্বন হয়ে উঠতে থাকে। বাইরের বৈষয়িক উদ্যোগ অপেক্ষা মানসিক চর্চায় তাঁদের আকর্ষণও বাড়ে। ঠাকুর পরিবার ব্যবসায়ী থেকে আবার জমিদারে পরিণত হলেন ; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তাঁরা কলকাতার 'বাবু-বিলাসে' মগ্ন হয়ে গেলেন না। সাধুতা ও ভাবুকতা দেবেন্দ্রনাথের প্রকৃতিগত বৈষয়িক ব্যাপারেও দেবেন্দ্রনাথ তাই বলে অপটু ছিলেন না। অবশ্য তৎপূর্বেই তিনি 'তত্ত্ববোধিনী

সভা' (ইং ১৮৩৯) স্থাপন করেছিলেন, ইং ১৮৪৩-এ (বাং ৭ই পৌষ, ১৭৬৫ শকাব্দে) ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষাও গ্রহণ করেন, 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' (ইং ১৮৪৩) ও 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা' (ইং ১৮৪০, ১৩ই জুন) স্থাপন করেন, হিন্দু সমাজের সকলকে একত্রিত করে 'হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয়' (১৮৪৬) প্রতিষ্ঠিত করেন। খ্রীষ্টানদের অভিযানের বিরুদ্ধে দেবেন্দ্রনাথ উদ্যোগী হয়ে ওঠেন। অন্যদিকে, সেদিনের 'জমিদার সভা' ও বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সোসাইটি সংযুক্ত করে 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' যখন রূপ গ্রহণ করে ও রাজনৈতিক জীবন গঠনে সে অ্যাসোসিয়েশন অগ্রসর হয় (১৮৫১), তখন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরই তার সম্পাদক নিযুক্ত হন। আবার তখনো তিনি রামমোহনের ঐতিহ্য অবলম্বন করে ব্রাহ্মধর্মের নেতা, তত্ত্ববোধিনীর তখন স্বর্ণ যুগ। ব্রাহ্মধর্মের তত্ত্বানুসন্ধানে ইং ১৮৪৯-এ 'ব্রাহ্মধর্ম' তিনি সংকলিত করছেন, 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' তাঁর মতের ও উপদেশের বাহন হয়। কিন্তু পত্রিকার 'গ্রন্থাধ্যক্ষ'দের সকলে অত অধ্যাত্মবাদী ছিলেন না— অক্ষয়কুমার ও বিদ্যাসাগরের কথা মনে রাখলেই তা বুঝতে পারি। দেবেন্দ্রনাথের বক্তৃতাদিও তাই সব সময়ে পত্রিকায় প্রকাশিত হত না। ক্ষুব্ধ দেবেন্দ্রনাথ তাই (রাজনারায়ণ বসু মহাশয়কে) পত্রে লেখেন (১৮৫৪, মার্চ) —"কতকগুলান নাস্তিক গ্রন্থাধ্যক্ষ হইয়াছে, ইহারদিগকে এ পদ হইতে বহিষ্কৃত না করিয়া দিলে আর ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের সুবিধা নাই।" নিজ গৃহেও পরিবারের পৌত্তলিক পূজাদি নিয়ম দেবেন্দ্রনাথ একেবারে দূর করতে পারলেন না। তাই ইং ১৮৫৬-এর অক্টোবর মাসে অধ্যাত্ম শান্তির সন্ধানে তিনি হিমালয়ে যাত্রা করেন। এর পরে সংসার-বিমুখ না হলেও তিনি 'ব্রাহ্মধর্ম' ভিন্ন অন্য কর্মে আর তত উদ্যম দেখান নি। ১৮৫৭-এর বিদ্রোহকালে তিনি সিমলা পাহাড়ে ছিলেন ; তাঁর 'স্বরচিত জীবন চরিতে' সেখানকার অবস্থার চমৎকার বর্ণনা লিপিবদ্ধ আছে। হিমালয় ভ্রমণ সম্পর্কে দু'খানা চিঠি 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়'ও প্রকাশিত হয়। ইং ১৮৫৮ এর নবেম্বরে দেবেন্দ্রনাথ কলিকাতায় ফিরে আসেন —পর্বত-অধোগামিনী নদীধারাতেই তিনি কর্মক্ষেত্রে অবতরণের সংকেত লাভ করেন। ইং ১৮৫৯-এর মে মাসে তিনি 'তত্ত্ববোধিনী সভা' তুলে দিলেন। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' তারপর (১৭৮১ শকাব্দের জ্যৈষ্ঠ থেকে) ব্রাহ্মসমাজের সম্পত্তিরূপে প্রকাশিত হত—বাঙালী সমাজ ও সংস্কৃতির ইতিহাসে

তার দান তখন গৌণ হয়ে আসে। সাহিত্যে 'তত্ত্ববোধিনীর পর্ব' শেষ হয়ে গেল, বলা যায়। এর পরবর্তী অধ্যায় অবশ্য কেশবচন্দ্র প্রমুখদের সঙ্গে দেবেন্দ্র-নাথের মিলন-বিরোধে সমাকীর্ণ। ব্রাহ্মসমাজের বিরোধ-বিচ্ছেদের কথা হলেও তা বাঙলার সামাজিক ইতিহাসেরই একটা বড় অংশ। জাতিভেদ প্রথার উচ্ছেদ, বিধবা-বিবাহ, অসবর্ণ-বিবাহ প্রভৃতি বিষয়ে কেশবচন্দ্র আন্তরিক উৎসাহ নিয়ে অগ্রসর হয়ে যেতে চান, দেবেন্দ্রনাথ তাতে সায় দিতে পারলেন না। ১৮৬৪-এর শেষে তাঁদের দু'জনার বিচ্ছেদ হল। দেবেন্দ্রনাথ সেখানে পরিণত প্রৌঢ়ত্বের গাম্ভীর্যে ও আভিজাত্যে অটল হয়ে থাকেন। তাঁর অনুবর্তী সুহৃদ্ রাজনারায়ণ বসু হন তাঁর মতের মুখপাত্র—শতাব্দীর এই দ্বিতীয়ার্ধে রাজনারায়ণ বসু এক প্রবল দেশপ্রেমিক ও বাঙলা ভাষার প্রবল সাধক হিসাবে তাঁর বন্ধুদের সঙ্গেই স্থান গ্রহণ করেছেন। এদিকে ব্রাহ্মগণ ইং ১৮৬৭ অব্দে দেবেন্দ্রনাথকে 'মহর্ষি' উপাধি দান করে আপনাদের ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। তখন তাঁর পুত্রেরা 'জাতীয় মেলা'র উদ্যোক্তা। ইং ১৮৮৬-তে 'শান্তিনিকেতন আশ্রম' প্রতিষ্ঠা করে দেবেন্দ্রনাথ তার ট্রাস্টপত্রাদি সুসম্পন্ন করেন। দীর্ঘ অবসরকালে তাঁর 'স্বরচিত জীবন-চরিত' প্রিয়নাথ শাস্ত্রী তাঁর মুখ থেকে শুনে লিপিবদ্ধ করেন, ১৮৯৭-তে (১৮৯৮?) তা প্রথম প্রকাশিত হয়। সুদীর্ঘ বার্ধক্য ভগবদ্‌চিন্তায় যাপন করে দেবেন্দ্রনাথ ১৯০৫-এ ৮৮ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করলেন।

বাঙলা সাহিত্যে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দান দু'তিন রকমের :—তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ও তত্ত্ববোধিনী সভার সাংস্কৃতিক দান, রামমোহনের ব্রাহ্মধর্মের পুনঃ-প্রতিষ্ঠা ও প্রচণ্ড খ্রীষ্টান অভিযানের বিরুদ্ধে হিন্দু সমাজের আত্মরক্ষা-বুদ্ধির উদ্বোধন,—এসব পূর্বেই আমরা বলেছি। তথাপি লক্ষ্য করা উচিত—পরবর্তী 'হিন্দু জাতীয়তাবাদের' একটা ভূমিকা দেবেন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতিও রচনা করেছিলেন। এদিক থেকে তাঁরা শুধু খ্রীষ্টানদের প্রতিপক্ষ নন; খ্রীষ্টীয় ভক্তিবাদ ও সংস্কারবাদের প্রবক্তা—নিজেদের সহযোগী—কেশবচন্দ্রেরও বিরোধী এবং শুধু যুক্তিবাদী 'ডিরোজিয়ান্' বিদ্রোহীদের প্রতিপক্ষ নন, এমন কি, তত্ত্ববোধিনীরও অক্ষয়কুমার-বিদ্যাসাগরেরও প্রতিপক্ষ। দ্বিতীয়তঃ, তিনিই বাঙলায় ভাবুকতার ধারার গদ্য (reflective prose) প্রথম রচনা করেন, আর সে ধারায় তাঁর তুলনা নেই। অবশ্য বাঙলা সাহিত্যে দেবেন্দ্রনাথের

শ্রেষ্ঠ দান—তাঁর লেখা নয়, তাঁর পুত্র-কন্যারা—দ্বিজেন্দ্রনাথ. সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, স্বর্ণকুমারী দেবী ও রবীন্দ্রনাথ।

দেবেন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ রচনা তাঁর আত্মজীবনী ('স্বরচিত জীবন-চরিত')—তা যে ১৮৯৪-তে রচিত, তা পূর্বেই বলা হয়েছে। এখানি তাঁর শেষ রচনা। গ্রন্থাকারে প্রথম বাঙলা রচনা 'ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ' (ইং ১৮৫১-৫২), তাকে সাহিত্য বলা চলে না। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় (১৭৭২ শকাব্দ=ইং ১৮৫০) যে সব প্রবন্ধ ও উপদেশ প্রভৃতি প্রকাশিত হয় তা গ্রথিত হয় 'আত্মতত্ত্ব-বিদ্যা'য় (ইং ১৮৫২)। এটিতেও ধর্ম-জিজ্ঞাসা যতটা ততটা সাহিত্য-সম্পদ নেই। কিন্তু এ গদ্য দেখেও বোঝা যায়—কী গুণ তাতে বিকশিত হবে। তিনটি বাক্যের একটি সংক্ষিপ্ততম উদ্ধৃতি নিই—অক্ষয়কুমার দত্তের বাহ্যবস্তুর জিজ্ঞাসার কথা মনে রেখে :

"লোকসকল বাহিরের বস্তুকে দেখে, আপনাকে দেখে না।...হায়! চতুর্দিকে বাহ্যবস্তু দ্বারা বেষ্টিত থাকিয়া, সর্বদাই বাহ্যবস্তুকে প্রত্যক্ষ করিয়া, লোকসকল মুগ্ধ হইয়া গিয়াছে।...এ বিবেচনা নাই যে আমি যদি না থাকিতাম, তবে কোথায় বা সূর্য, কোথায় বা চন্দ্র, কোথায় বা গ্রহনক্ষত্র, কোথায় বা এই জগৎ।"

এ সুর ভারতবর্ষের চিরদিনকার—রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এটি তাই পৈতৃক সম্পদ। দেবেন্দ্রনাথের নিজের রচনার এটি একটি মূল সুর। তাঁর 'ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান' (দুই প্রকরণ) ইং ১৮৬২ ও ইং ১৮৬৬ অব্দে প্রকাশিত হয়। তার পূর্বেই ব্রাহ্মসমাজের উপদেশসমূহ প্রকাশিত হয়েছিল। তাতেও এ ভাব ও এ ভাষার বিস্তার দেখি। রাজনারায়ণ বসু তাঁর অনুগামী সুহৃদ্। কিন্তু বাঙলা ভাষার সেই সাধক মিথ্যা বলেন নি—"দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যাখ্যান অতি প্রসিদ্ধ, উহা তড়িতের ন্যায় অন্তরে প্রবেশ করিয়া আত্মাকে চমকিত করিয়া তুলে এবং মনশ্চক্ষুকে অমৃতের সোপান প্রদর্শন করে।" এরূপ ভাবনায় পরিপ্লুত হলেও পশ্চিম প্রদেশের দুর্ভিক্ষ উপশমে সাহায্য সংগ্রহার্থে ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা (১৮৬১) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শুধু ধর্মবোধ নয়, জাতীয় দায়িত্ববোধও যে কতকটা বাঙালীর মনে জাগ্রত হয়েছিল, সে বক্তৃতা তারও একটি প্রমাণ—"আমার দেশ মরুভূমি হচ্ছে তাকে আমার বাঁচাতে হবে।"

দেবেন্দ্রনাথের রচনা সম্বন্ধে দ্বিতীয় কথা—ভ্রমণ-সাহিত্যের তিনি একটি দিক খুলে দেন। হিমালয় থেকে ব্রহ্মদেশ পর্যন্ত নানা দেশ তিনি পর্যটন করেন।

সে রচনায় অধ্যাত্মবোধই স্থায়ী সুর। কিন্তু প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপলব্ধিতে এসব ক্ষেত্রে ভাষা আরও গভীর ও ব্যঞ্জনাময়। 'আত্মজীবনী'তে এর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন অবশ্য অজস্র। কিন্তু ১৭৮০ শকাব্দের ভাদ্র মাসে (১৮৫৮) তত্ত্ববোধিনীর পৃষ্ঠায় ('কোন পর্যটক মিত্র প্রাপ্ত') সিমলা ভ্রমণের যে পত্র আছে, তাতে তার ছাপ রয়েছে (ডঃ সুকুমার সেন এ পত্রের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন —বাঃ সাঃ গন্ত, পৃঃ ১০০)। তবে বারবারই স্বীকার করতে হবে 'আত্মচরিতে'র তুলনা নেই—তা পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উদ্ধৃত করলেও যথেষ্ট হবে না। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের বঙ্কিম, হরপ্রসাদ প্রভৃতি গদ্যগুরুদের ভাষায় ও বানানে অনিশ্চয়তা কিংবা সাধু ও চলতি পদের মিশ্রণ দেখা যায়। সে তুলনায় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের এ রচনা অদ্ভুত রকমের দোষমুক্ত দেখছি। মুদ্রণ ও সম্পাদন কালে (ইং ১৮৯৮) এরূপে পরিমার্জিত না হয়ে থাকলে বলতে হবে তা বিস্ময়কর। এ সম্পর্কেই আর একটি কথা—রচনা-ক্ষেত্রে দেবেন্দ্রনাথের নিকট বিদ্যাসাগর উপকৃত বা বিদ্যাসাগরের নিকট দেবেন্দ্রনাথ উপকৃত, সমালোচকদের এই দু' শ্রেণীর কল্পনাই মূলতঃ আমাদের নিরর্থক মনে হয়। ভাষায় ও ভাবে দুই মনীষী দুই জগতের মানুষ।

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র দুই প্রধান লেখক রাজনারায়ণ বসু ও দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। রাজনারায়ণ বসু মধুসূদন-ভূদেবের সতীর্থ। দ্বিজেন্দ্রনাথ (ইং ১৮৪০-১৯২৬) সাহিত্যে প্রবেশ করেন ইং ১৮৬০-এ। শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধেই তাঁদের প্রতিভা বিকাশ লাভ করে ; সে সময়েই তাঁদের দান আলোচ্য।

(গ) **বিদ্যাকল্পদ্রুম (ইং ১৮৪৬-১৮৫১) ও রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (ইং ১৮১৩-১৮৮৫):** দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিদ্যার কঠিন সমালোচক ছিলেন রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (ইং ১৮১৩-১৮৮৫)। খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ (১৮৩১) করবার পর তিনি খ্রীষ্টধর্ম প্রচারে বিষম উৎসাহী। অপর পক্ষে খ্রীষ্টধর্মের প্রতিরোধ করতে দেবেন্দ্রনাথও বদ্ধপরিকর—পাশ্চাত্য যুক্তিবাদ দিয়েই 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় তাঁরা বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ব্রাহ্মধর্ম প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করতেন। পাদ্রি কৃষ্ণমোহনও তাই দেবেন্দ্রনাথের ধর্মমতকে 'বিলিতী বেদান্তবাদ' বলে বিদ্রূপ করতে ছাড়তেন না। তাই 'তত্ত্ববোধিনী'র এই লেখক-মণ্ডলী থেকে তিনি

দূরে থাকেন। সেই বিরোধিতা ও সমালোচনার ফলে দেবেন্দ্রনাথের বিচার-বুদ্ধি মার্জিত হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু কৃষ্ণমোহন বাঙালী জাগরণে শুধু অ্যান্টিথিসিসের বা বিরোধের ভগ্নাংশ মাত্র, তা নয়। তাঁর সদ্‌বুদ্ধির দানও দুই পর্বের বাঙালী জীবনে প্রচুর।

কৃষ্ণমোহন হিন্দু কলেজের প্রথম যুগের ছাত্র—ডিরোজিও'র ছাত্র না হলেও তিনি ডিরোজিও'র শিষ্য—এবং 'ইয়ংবেঙ্গলের' মধ্যে সম্ভবতঃ সর্বাধিক কৃতী পণ্ডিত—তাঁদের মুখপত্র 'এন্‌কোয়ারারের' দৃপ্তভাষী সম্পাদক। দরিদ্র ব্রাহ্মণের ঘরে তাঁর জন্ম (ইং ১৮১৩), 'ইয়ংবেঙ্গল'-এর সম্পর্কে তাঁর কথা বলা হয়েছে। প্রতিভার বলেই তিনি হেয়ার সাহেবের ঠন্‌ঠনিয়ার পাঠশালা থেকে হিন্দু কলেজে পড়বার সুযোগ পেয়েছিলেন (ইং ১৮২৪)। এই কারণেই হেয়ারের স্নেহদৃষ্টিও লাভ করেন। ইং ১৮২৮-এ তিনি হিন্দু কলেজের শিক্ষা শেষ করে বিশেষ বৃত্তি পান ; ডিরোজিও সে কলেজের শিক্ষক হয়ে আসেন ইং ১৮২৬-এ। বন্ধুদের একদিনকার আকস্মিক হঠকারিতায় কৃষ্ণমোহন গৃহ থেকে বিতাড়িত হলেন (১৮৩১), শেষ পর্যন্ত ডাফ্‌ সাহেবের প্রভাবে পড়ে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করলেন (১৮৩২), এসবও পূর্বেই উল্লেখ করেছি। তারপর আরম্ভ হল আর এক অকপট উৎসাহ-ভরা জীবন—ইং ১৮৩৭ অব্দে তিনি পাদ্রি হলেন, খ্রীষ্টধর্ম প্রচার তাঁর এক প্রধান ব্রত হয়ে উঠল। ইংরেজ শাসকরা খ্রীষ্টধর্ম প্রচারে এ সময়ে আর বাধা দিত না, বরং খ্রীষ্টান প্রচারকরা নানাভাবেই শাসকদের সহায়তা পেত এ সময়ে। কৃষ্ণমোহনও, যেমন করে হোক, হিন্দু শিক্ষিতদের খ্রীষ্টধর্মে টানতে উদ্‌গ্রীব ছিলেন। স্ত্রীকে পিতৃগৃহ থেকে এনে তিনি খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করলেন। পরে কনিষ্ঠ ভ্রাতাও তাঁর সঙ্গে যোগদান করলেন। মধুসূদন দত্ত (ইং ১৮৪৩) ও জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরের (ইং ১৮৫১) মত হিন্দু কলেজের ছাত্রদেরও খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণে তিনি কম উৎসাহ দেন নি। ইং ১৮৪০-এর পর থেকে নব-শিক্ষিতদের খ্রীষ্টান হবার প্রায় একটা হিড়িক পড়ে। হিন্দু সমাজও তাই কৃষ্ণমোহনের বিরুদ্ধে সর্বদাই সতর্ক থাকত। ফলে, জ্ঞান-বিজ্ঞানে, সাহিত্যে, প্রাচ্য বিদ্যায়, স্বদেশসেবায় তাঁর প্রবল প্রতিভার দান কৃষ্ণমোহনও তখন প্রসন্ন হস্তে দিতে পারেন নি, বাঙালী সমাজও প্রথম দিকে তা গ্রহণ করতে পারে নি। খ্রীষ্টান কলেজের অধ্যাপনায় (ইং ১৮৬৮ পর্যন্ত) তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় প্রতিষ্ঠা (ইং ১৮৫৭)

থেকেই তিনি তার সিনেটের ফেলো মনোনীত হন ; ক্রমে সিণ্ডিকেটের সদস্য হন, আর্ট বিভাগের 'ডীন হন। সিলেবাস-প্রণয়ন, পরীক্ষা-গ্রহণ প্রভৃতি সর্ব-বিষয়ে তাঁর সহায়তা ছিল তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরিহার্য। রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতির সঙ্গে তাঁকে 'ডক্টর অব লিটারেচর' উপাধি দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় (ইং ১৮৭৬ অব্দে) সম্মানিত করে। নবগঠিত কলিকাতা কর্পোরেশনের (ইং ১৮৭৬) সদস্য পদে তাঁকে জনসাধারণই বরণ করেন। রাজনৈতিক জীবন গঠনে তাঁকেই আনন্দমোহন-সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনে'র (ইং ১৮৭৬) প্রথম সভাপতিরূপে পুরোভাগে স্থাপন করেন। মুদ্রাযন্ত্র আইন, অস্ত্র আইন প্রভৃতি লর্ড লিটনের প্রতিক্রিয়াশীল আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-সভায় সভাপতি হতেন এই 'পক্বকেশ পাদ্রি'—সেই 'ইয়ং বেঙ্গলের' প্রথম বিদ্রোহী, অকপটতার প্রতীক, সে যুগের র‍্যাডিক্যাল, অকৃত্রিম দেশভক্ত। সুরেন্দ্রনাথের ভাষায়—"Never was there a man more uncompromising to what he beliveed to be truth, and hardly was there such amiability combined with such strength and firmness."

ইং ১৮৮৫ অব্দে যখন রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ৭২ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন, তখন এ বিষয়ে কারও আর সংশয় ছিল না। সাহিত্য-সাধনায়, প্রাচ্যবিদ্যাচর্চায়, পাণ্ডিত্যে, জনসেবায়, আজীবন স্বদেশী আচার-আচরণ অক্ষুণ্ণ রেখে তিনি তখন সকলের হৃদয় জয় করেছেন। হয়ত জনসেবার সেই মহাব্রতে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের উগ্র উৎসাহও নিরর্থক হয়ে উঠেছিল। 'এন্‌কোয়ারার' ও 'দি পারসিকিউটেড' (ইং ১৮৩১, ইংরেজিতে লেখা নাটক) থেকে 'টু এসেস্ অন দি এরিয়ান উইট্‌নেস্' (ইং ১৮৮০) পর্যন্ত, প্রায় ৫০ বৎসর ধরে ইংরেজি, সংস্কৃত ও বাঙলায় নানা বিষয়ে বক্তৃতা, প্রবন্ধ ও পুস্তকাদি কৃষ্ণমোহন রচনা করেন। সে সবের মধ্যে কৃষ্ণমোহনের বাঙলা রচনাই আমাদের আলোচ্য। কিন্তু 'রঘুবংশ' 'কুমারসম্ভব' থেকে 'ঋগ্‌বেদ সংহিতা'র প্রথম অষ্টক ও পুরাণসংগ্রহ, নারদ পঞ্চরাত্র পর্যন্ত সংস্কৃত গ্রন্থের সম্পাদক যে এই পাদ্রি কৃষ্ণমোহন, তা মনে রাখা দরকার। বাঙলায় তিনি 'সংবাদ-সুধাংশু', 'বেঙ্গল গেজেট' প্রভৃতি সংবাদপত্র সম্পাদনা করেছেন। তাঁর 'ষড়্‌দর্শন সংবাদ (খ্রীষ্টাব্দ ১৮৬৭) পাণ্ডিত্যের ও প্রাচ্যবিদ্যানুরাগের

প্রমাণ—বাঙলা ভাষারও সম্পদ। বাঙলা সাহিত্যে তাঁর বিশেষ পরিচয় 'বিদ্যাকল্পদ্রুমের' (ইং ১৮৪৬-১৮৫১) লেখক বলে—বাঙলা গদ্যের 'প্রস্তুতির পর্বে'র তা একটি জ্ঞান-প্রস্রবণ।

'বিদ্যাকল্পদ্রুম' অর্থাৎ বিবিধ বিদ্যা বিষয়ের রচনা, বিশ্বকোষ জাতীয় ক্রমশঃ প্রকাশিত গ্রন্থমালা—তার অন্য নাম 'এন্‌সাইক্লোপীডিয়া বেঙ্গলেন্‌সিস্‌'। বিশ্বকোষ জাতীয় গ্রন্থ সংকলন তখন আরও হচ্ছিল। 'বিদ্যাকল্পদ্রুমের' এক সংস্করণ ছিল বাঙলায়, অন্য সংস্করণে বাঁ দিকে ইংরেজিতে ও ডান দিকে বাঙলায় লেখা মুদ্রিত হয়েছিল। প্রথম কাণ্ড ('রোমরাজ্যের ইতিবৃত্ত, প্রথম খণ্ড') ইং ১৮৪৮-এ প্রকাশিত হয়, সরকারী শিক্ষা-বিভাগ থেকে 'বিদ্যাকল্পদ্রুম' ৫০০ কপি করে ক্রয় করা স্থির হয়। ইং ১৮৪৬ থেকে ইং ১৮৫১ পর্যন্ত মোট '১৩ কাণ্ডে' 'বিদ্যাকল্পদ্রুমে' কৃষ্ণমোহনের দ্বারা রোম ও ঈজিপ্ত প্রভৃতি দেশের পুরাবৃত্ত, জীবনবৃত্তান্ত, বিবিধ বিষয়ক পাঠ, ভূগোল, ক্ষেত্রতত্ত্ব, নীতি-বোধক ইতিহাস, চিত্তোৎকর্ষ বিষয়ক লেখা প্রভৃতি সংগৃহীত হয়। কৃষ্ণ-মোহনের নিজের ছাড়াও কিছু কিছু লেখা ছিল তাঁর বন্ধু 'ইয়ং বেঙ্গলের' প্যারীচাঁদ মিত্রের, যিনি 'টেকচাঁদ ঠাকুর' নামে বাঙলা সাহিত্যে অমরত্ব লাভ করেছেন। সেকালের সকল মনীষীর মতই কৃষ্ণমোহনের উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষাবিস্তার ; জ্ঞান-বিজ্ঞানে জাতিকে প্রস্তুত করা। একটি উল্লেখযোগ্য তথ্য এই—খ্রীষ্টান কৃষ্ণমোহন সাময়িকভাবে ইংরেজি ভাষাকে শিক্ষার বাহনরূপে গ্রহণ করবার পক্ষপাতী হলেও (ইং ১৮৩৪-১৮৩৫-এর বিতর্ককালে তিনি অ্যাংগ্লিসিস্টদের দলেই ছিলেন) তাঁর ধারণা ছিল বাঙলাই একদিন বাঙালীর শিক্ষার বাহন হবে। তাঁর পাণ্ডিত্যে ও উদ্যমে বাঙলা ভাষা উপকৃত হয়েছে। তিনি বিদ্যাসাগরের মত বাঙলা লিখতে পারেন নি, তাঁর ভাষা সরল বা সরস নয়। কিন্তু গদ্যের প্রধান উদ্দেশ্য তাঁর সুবিদিত ছিল : বাঙলা ভাষায়ও তাঁর অধিকার ছিল। যেমন, 'মঙ্গলাচরণে' তিনি লিখেছেন—

> "আমার অভিপ্রায় এই যে বঙ্গভূমির সমস্ত জাতিকে আমার শ্রোতা করি অতএব যে কেহ পাঠ করিতে পারে সকলের সুবোধক কথা ব্যবহার করিব তথাচ রচনার মাধুর্য দরশাইয়া মনোরঞ্জক শিক্ষা বিস্তার করিতে সাধ্যক্রমে ত্রুটি করিব না কিন্তু রূপক অলঙ্কারাদি রচনার শোভা স্পষ্টতর বোধক হইলে তাহার অনুরোধে বাক্যের সারল্য নষ্ট করিব না।"

বিষয় সরল না হলে ভাষার সারল্য সাধন আরও কষ্টসাধ্য হয়, তা জানা

কথা। কৃষ্ণমোহনের লেখাও সহজপাঠ্য নয়। তিনি সাহিত্য সৃষ্টি করেন নি ; বাঙলা ভাষায় বাঙালীকে নানা জ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে কতকটা প্রস্তুত করে গিয়েছেন।

(ঘ) 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' (ইং ১৮৫১-১৮৬০) ও রাজেন্দ্রলাল মিত্র (ইং ১৮২২-১৮৯১) :

প্রাচ্যবিদ্যার প্রথম ভারতীয় দিক্‌পাল রাজেন্দ্রলাল মিত্র। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'তেই তিনি বাঙলা রচনা আরম্ভ করেন ; তিনিও সে পত্রিকার অন্যতম 'গ্রন্থাধ্যক্ষ' ছিলেন। অন্যদের মত তাঁরও কীর্তি এই 'প্রস্তুতির পর্বে' সীমাবদ্ধ নয়, পরবর্তী শতার্ধে তা উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে। বাঙলা সাহিত্যে তাঁর প্রধান কীর্তি 'বিবিধার্থ সংগ্রহের' (ইং ১৮৪৬ থেকে) সম্পাদনা ও পরে 'রহস্যসন্দর্ভের' (ইং ১৮৬৩ থেকে) সম্পাদনা। তা ছাড়া. এই মহামনস্বী 'ভার্নাকিউলার লিটারেচর কমিটি'র (বঙ্গভাষা অনুবাদক সমাজ) প্রয়োজনে বা শিক্ষার তাগিদে 'প্রাকৃত ভূগোল' (ইং ১৮৫৪), 'শিল্পিক দর্শন' (ইং ১৮৬০) বা 'শিবাজীর চরিত্র' (ইং ১৮৬০), 'পত্রকৌমুদী' (ইং ১৮৬৩) প্রভৃতি যে সব বাঙলা বই লেখেন তা আজ বিস্মৃত। তবে তা মনস্বী রাজেন্দ্রলালের বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির ও শিক্ষানুরাগের সাক্ষ্য। অবশ্য এ কথা ঠিক, রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলতেই ভারতবাসী এখন জানে তিনি প্রত্নতত্ত্বের অসামান্য পণ্ডিত, আর স্মরণ করে এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত (Bibliotheca Indica-য়) তাঁর সম্পাদিত সংস্কৃত গ্রন্থমালা ইংরেজিতে লিখিত রাজেন্দ্রলালের অসংখ্য গবেষণা প্রবন্ধ প্রভৃতি। সে পরিচয়ও বাঙলা সাহিত্যের পক্ষে অবান্তর নয়। কারণ, অতীতের এই পুনরাবিষ্কারের ফলে বাঙালীর সৃষ্টিশক্তি উদ্‌বুদ্ধ হয়ে উঠেছে। ইং ১৮২৯-এ রামকমল সেন, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রভৃতি দেশীয় প্রধানগণ প্রথমে 'এশিয়াটিক সোসাইটি'র সদস্যপদ লাভ করেন। প্রাচ্যবিদ্যার বিজ্ঞান-সম্মত গবেষণায় তাঁদের আগ্রহ জাগতে থাকে। এদিকে জেম্‌স্ প্রিন্‌সেপ্ ব্রাহ্মীলিপির পাঠোদ্ধার করেন (বাঙালী পণ্ডিত কমলাকান্তও তাতে কিছুটা সাহায্য করেছিলেন)। ভারতবর্ষে বুদ্ধ ও অশোকের স্মৃতির পুনরুজ্জীবন এভাবে আরম্ভ হল। ইতিহাসের এরূপ বৈজ্ঞানিক আলোচনা (টডের রাজস্থানও) শিক্ষিতদের মনে অতীত মহিমা জাগিয়ে তোলে—বাঙালীর নব-জাগরণের একটা প্রধান সত্য হল এই 'অতীতের পুনরাবিষ্কার'। রামমোহন,

দেবেন্দ্রনাথ, এমন কি বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি সকলেই এই 'আবিষ্কারের' বাহক, একথা বলা যেতে পারে। কিন্তু রাজেন্দ্রলাল মিত্র হলেন তার বৈজ্ঞানিক পথিকৃৎ। 'এশিয়াটিক সোসাইটি'র আসরে তখন থেকে ভারতীয় গবেষকদের স্থান স্থায়ী হয়ে যায়। এ ছাড়া, যে জন্য রাজেন্দ্রলাল মিত্র বাঙলা সাহিত্যে স্মরণীয়, তা তাঁর সর্বতোমুখী প্রতিভা—রবীন্দ্রনাথ যে জন্য তাঁকে বলেছেন 'সব্যসাচী'। "এমন অল্প বিষয় ছিল, যে সম্বন্ধে তিনি ভাল করিয়া আলোচনা না করিয়াছিলেন এবং যাহা কিছু তাঁহার আলোচনার বিষয় ছিল, তাহাই তিনি প্রাঞ্জল করিয়া বিবৃত করিতে পারিতেন।" রবীন্দ্রনাথের জন্মের পূর্বেই এরূপ আলোচনা রাজেন্দ্রলাল মিত্র 'বিবিধার্থ সংগ্রহে' (ইং ১৮৫৬) শুরু করেন। রবীন্দ্রনাথের শৈশবকালে 'রহস্যসন্দর্ভে' (ইং ১৮৬৩) তা চলে। আর 'ভারতী'র জন্যও যুবক রবীন্দ্রনাথ (ইং ১৮৮২) এই প্রবীণ মনস্বীর প্রবন্ধ সংগ্রহ করেছিলেন। সে সময়ে 'সারস্বত সমাজে' ও অন্যত্র তিনি বাঙলা পরিভাষা-সম্বন্ধে যে আলোচনা করেন আজও তা বিজ্ঞান-সম্মত বলে গ্রাহ্য। 'বিবিধার্থ সংগ্রহে'ই মধুসূদন প্রভৃতির নূতন সৃষ্টির ('একেই কি বলে সভ্যতা ?' 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' প্রভৃতির) প্রকাশ ও সমাদর হয়েছিল, তা রাজেন্দ্রলালের সাহিত্য-বোধেরই প্রমাণ। পুস্তকাকারে তাঁর এসব লেখা প্রকাশিত হয় নি, কিন্তু মাসিকপত্রে সাহিত্য-সমালোচনার তা উৎকৃষ্ট নিদর্শন। 'বিবিধার্থ সংগ্রহ'ই বাঙলা প্রথম সচিত্র মাসিক পত্র, 'রহস্যসন্দর্ভ'ও তাই ছিল। 'বিবিধার্থ সংগ্রহে' প্রাণীবিদ্যা, শিক্ষা-সাহিত্যাদি বিষয়ে লেখা থাকত ; চিত্রে তা শোভিত হত ; আয়তনে হত ২৪ পৃষ্ঠা পরিমাণ। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের প্রতিভা ও প্রয়াস দুই-ই এত বিরাট যে তা সংক্ষেপে বলা যায় না। রবীন্দ্রনাথ তার মুগ্ধ ও সশ্রদ্ধ বর্ণনা দিয়েছেন। তা থেকে রাজেন্দ্রলালের বৈশিষ্ট্য কিছুটা উপলব্ধি করা যায়।

শুঁড়ার (কলিকাতার) অভিজাত কায়স্থ ঘরের তিনি সন্তান। তাঁর পিতা জন্মেজয় মিত্রও সাহিত্যরসিক ছিলেন, পদাবলীও লিখেছিলেন। ইং ১৮২২-এ রাজেন্দ্রলালের জন্ম হয়। কলেজের শিক্ষা শেষ হয় ইং ১৮৪৪ সালে,—মেডিক্যাল কলেজের প্রধান সাহেবদের সঙ্গে বিরোধ বাধলে রাজেন্দ্রলাল সে কলেজ ত্যাগ করেন। কিন্তু একাগ্রচিত্তে তিনি বিদ্যানুশীলন করতে থাকেন। ইং ১৮৪৬-এ বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটিতে তিনি ১০০.

টাকা বেতনে সহকারী সম্পাদক ও গ্রন্থাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। এ সময়েই (ইং ১৮৫১) 'ভার্নাকিউলার লিটারেচর কমিটি'র সঙ্গে তাঁর সংযোগ ঘটে, আর তিনি 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' প্রকাশ করতে থাকেন। ১০ বৎসর পরে তিনি 'এশিয়াটিক সোসাইটি'র সদস্য (ইং ১৮৫৬) হলেন, ইং ১৮৫৭-তে তিনি সম্পাদক হলেন; আর পরে ইং ১৮৮৫-তে 'এশিয়াটিক সোসাইটি' তাঁকে সভাপতি পদে বরণ করে। জীবিকাক্ষেত্রে অবশ্য ইং ১৮৫৬ থেকে তিনি ওয়ার্ডস্ ইনস্টিটিউশনের ডিরেক্টর ছিলেন; সেখান থেকে ইং ১৮৮০-তে মাসিক ৫০০৲ টাকা পেন্সনে অবসর গ্রহণ করেন। এ ছাড়া, বিশ্ববিদ্যালয়ও তাঁকে ১৮৭৬ সালে এল এল-ডি উপাধি দেয়। পৌরসভায়, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশনে, জনহিতকর নানা কাজে তিনি তখন অগ্রগণ্য। তাঁর বীর্যবান ব্যক্তিত্ব তখন সকলের চক্ষে শ্রদ্ধার জিনিস। কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন (ইং ১৮৮৬) কলিকাতায় বসে, রাজেন্দ্রলাল মিত্র তার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন। ৫ বৎসর পরে ইং ১৮৯১ অব্দে তিনি পরলোকগমন করেন। আবার রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই বলতে হয় "কেবল তিনি মননশীল লেখক ছিলেন ইহাই তাঁহার প্রধান গৌরব নয়। তাঁহার মূর্তিতেই তাঁহার মনুষ্যত্ব যেন প্রত্যক্ষ হইত।"

(৬) **ভার্নাকিউলার লিটারেচর কমিটি** ('বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ')—এ প্রসঙ্গেই 'ভার্নাকিউলার লিটারেচর কমিটি'র (ইং ১৮৫১-১৮৭০) কাজ সংক্ষেপে স্মরণ করতে হয়। রাজেন্দ্রলাল মিত্র 'বিবিধার্থ সংগ্রহের' জন্য এ কমিটির থেকে ৮০৲ টাকা মাসিক সাহায্য পেতেন, তিনি ৬ষ্ঠ পর্ব পর্যন্ত তা সম্পাদনা করেন। ৭ম পর্বের (ইং ১৮৬১) সম্পাদক কালীপ্রসন্ন সিংহ। তা বেশিদিন স্থায়ী হয় নি। রাজেন্দ্রলালের 'রহস্য-সন্দর্ভ'ও (ইং ১৮৬৩) 'ভার্নাকিউলার লিটারেচর কমিটি'র আনুকূল্যে প্রকাশিত হয়েছিল। ৬ খণ্ড পর্যন্ত তা রাজেন্দ্রলাল সম্পাদনা করেন। কিন্তু এ ছাড়াও স্কুল বুক সোসাইটির মত এ কমিটি শিক্ষা বিষয়ে গ্রন্থ প্রকাশে উদ্যোগী হয়। সমিতির বিশেষ কাজ হচ্ছে 'গার্হস্থ্য বাঙলা পুস্তক সংগ্রহ'। প্রায় ১৭-১৮ বৎসর পর্যন্ত তার কাজ চলে। রাজেন্দ্রলাল মিত্র ব্যতীত প্যারীচাঁদ মিত্র, বিদ্যাসাগর, রাধাকান্ত দেব, পাদ্রি জেম্‌স্ লঙ্ সাহেবও এর সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। দু একজন ইংরেজ ও আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ, রাজনারায়ণ বিদ্যারত্ন, মধুসূদন মুখোপাধ্যায় এ

সংগ্রহে লিখেছেন। এঁদের প্রকাশিত পুস্তকের উপযোগিতা তখন যথেষ্ট ছিল; কিন্তু বিবেচনা করলে মানতে হয়—লঙ্-সম্পাদিত সংবাদপত্রের সংকলন 'সংবাদসার' (ইং ১৮৫৩) উল্লেখযোগ্য। বহুবিধ অনুবাদের মধ্যে 'রবিনসন ক্রুশোর ভ্রমণ বৃত্তান্ত' (১৮৫২) ল্যাম্বস্ 'টেলস্ ফ্রম্ সেক্স্পীয়র'-এর এক আধটি গল্প (১৮৫৩), পল ও ভার্জিনিয়ার ইতিহাস ('পৌল বর্জিনিয়া' ১৮৫৬), বৃহৎ কথা (১৮৫৭) প্রভৃতি অনুবাদ জাতীয় গ্রন্থ বাঙালী গৃহস্থ ঘরের দৃষ্টিকেও প্রশস্ত করে তুলেছিল, মধুসূদন বঙ্কিমের পাঠকশ্রেণী তৈরী করছিল।

এ প্রসঙ্গ মনে রাখতে পারি, অনুবাদ সাহিত্য দিয়েই এ যুগের সাহিত্যের যাত্রারম্ভ—মিশনারিরা বাইবেলের হুবহু অনুবাদ করেন। সংস্কৃত, ফারসি, ইংরেজি বইয়ের ভাবার্থ বাঙলায় পরিবেশন করা পূর্ব-পূর্ব পর্বের মত এ পর্বের লেখকদের একটা প্রধান কাজ হয়ে ওঠে। জীবন্ত সাহিত্য মাত্রই অনুবাদের দ্বারা আপনার পুষ্টি-সাধন করে নেয়। এসব অনুবাদের কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি (দ্রঃ ১৪০)। এই পর্বাংশেও বিদ্যাসাগর, কৃষ্ণমোহন প্রভৃতিও বহু বিষয় অনুবাদ করেছিলেন। শুধু গদ্যে নয়, কবিরা পদ্য-অনুবাদও করছিলেন; তাও পরে দেখব। ইংরেজি থেকে অনুবাদ করে আমরা পূ[illegible] থেকেই পাশ্চাত্ত্য জগতের প্রাচীন ও নবীন নানা ভাষা ও সাহিত্যের সম্পদ আহরণ করতে চাইছিলাম। আর ফারসি-আরবি সাহিত্যের যে সম্পদ অষ্টাদশ শতকে আসছিল অনুবাদ দ্বারা তাও অব্যাহত রা[illegible]তে চাইছিলাম। এসব অনুবাদের অনেক সময়েই কোনো সাহিত্যিক মূল্য নেই। তবু যাঁরা মনের আকাশকে ব্যাপ্ত ও সমৃদ্ধ করেছেন সেসব অনুবাদক মৌলিক [illegible] আত্মপ্রকাশের পক্ষে কম সহায়তা করেন নি। পূর্বেই দেখেছি—এ পর্বে অন[illegible] হল ল্যাম্বের লেখা সেক্স্পীয়রের গল্প (১৮৫২)—বাঙালী তখন সেক্স্পী[illegible] [illegible] উৎসুক,—রবিনসন্ ক্রুশোর গল্প (১৮৫৮), জনসনের রাসেলাস' (প্রথম কালী-কৃষ্ণ ঠাকুর অনুবাদ করেন, তারপর তারাশঙ্কর কবিরত্ন ইং ১৮[illegible] অব্দে অ[illegible]-বাদ করেন), টেলিমেকস প্রভৃতি। বেকনের এসেস্-এর অনুবাদও হয় ১৮৫৮-তে। এমন কি 'ডেকামেরনে'র গল্পও (১৮৫৮) বাদ যায় নি। অবশ্য ইংরেজি থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ইতিহাস ও জীবনী প্রভৃতির অনুবাদের দ্বারা মোটামুটি মূলের মর্ম পরিবেশন করাই ছিল প্রধান লক্ষ্য। কখনো-কখনো ফারসি আরাবির বিষয়বস্তুও ইংরেজি থেকেই বাঙলায় পরিবেশিত হচ্ছিল—

যেমন, নীলমণি বসাক পারস্য কাহিনী (১৮৩৪), আরব্য উপন্যাস (১৮৫০) প্রভৃতি রচনা করেছিলেন (নীলমণি বসাকের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ অবশ্য 'নবনারী'—ভারতীয় মহীয়সী নারীর কথা—এটি যুগ লক্ষণের একটি প্রমাণ)। 'সাহনামা'—অর্থাৎ ফেরদৌছি তুছির কৃত পারস্য ভাষায় পূর্বাগত বাদশাহদিগের বিবরণ, অনূদিত হয়েছিল ইং ১৮৩৭-এ। সংস্কৃতের অনুবাদের কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। কারণ, একদিক থেকে তো গোটা ঊনবিংশ শতাব্দীই সংস্কৃতের পুনরুজ্জীবনের যুগ—অনুবাদ, সম্পাদন ও বৈজ্ঞানিক গবেষণায় তা বাঙালীকে আত্মস্থ হতে সাহায্য করেছে। রামমোহনের বিরোধীদের মতই বিদ্যাসাগর বা দেবেন্দ্রনাথের বিরোধী 'সনাতনীরা'ও সে কাজ কম করেন নি। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র প্রতিপক্ষ ছিল 'নিত্যধর্মানুরঞ্জিকা'র (ইং ১৮৪৬ অব্দে সূচনা) নন্দকুমার কবিরত্ন প্রভৃতি। শাস্ত্র, দর্শন, মহাভারত (কালীপ্রসন্ন সিংহ ও বর্ধমানের মহারাজার সহায়তায় পর পর্বে অনূদিত) ছাড়া কাব্যের অনুবাদ, অনুসরণ ও মূলাবলম্বনে বাঙলা রচনা পূর্বাপর চলে। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে কেন, বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধেও তা শেষ হয় নি। তবে এসব অনুবাদের নিজস্ব সাহিত্যিক মূল্য না থাকলে এখন তা আর উল্লেখযোগ্য নয়।

(চ) **সংস্কৃত কলেজের লেখক-গোষ্ঠী ও হিন্দু কলেজের লেখক-গোষ্ঠী**—বিদ্যাসাগরের অনুপ্রেরণায় সংস্কৃত কলেজের যে লেখক-গোষ্ঠী বাঙলা রচনার ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, তাঁদের অল্প লেখাই এ পর্বে (ইং ১৮৫৭-এর মধ্যে) রচিত হয়, অধিকাংশই পরবর্তী সৃষ্টি-সমৃদ্ধ যুগে রচিত। আর, তাই সে যুগের সাহিত্যের তুলনায় তাঁদের খ্যাতি ম্লান হয়ে গিয়েছে। না হলে, এই লেখক-গোষ্ঠীর কেউ কেউ এখনো বিস্মৃত নন। যেমন, তারাশঙ্কর কবিরত্নের 'কাদম্বরী' (ইং ১৮৫৪) বিখ্যাত হয়েছিল। 'বাণভট্টের' সে কাব্য তিনি অনুবাদ করেন নি, তার ভাবার্থ পরিবেশন করেছেন ; কিন্তু তা মোটামুটি উপাদেয়। তাঁর অনূদিত 'রাসেলাস'ও (১৮৫৭) জনপ্রিয় হয়েছিল।

রামগতি ন্যায়রত্ন (ইং ১৮৩১-১৮৯৪)—'বাঙলা ভাষা ও বাঙলা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবের' (১৮৭২-৭৩) লেখক হিসাবে বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসকার। কিন্তু 'রোমাবতী' (১৮৬২ ?) ও 'ইলছোবা' নামে দু'খানি রোমান্সও গদ্যে-পদ্যে তিনি রচনা করেছিলেন। অবশ্য সে জাতীয় রোমান্সের দিন তখন গিয়েছে।

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের (ইং ১৮৪০ ?-১৯৩২) 'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণের' প্রথম সংস্করণ ইং ১৮৫৭-৫৮তেই প্রকাশিত হতে থাকে। ইংরেজি Romance of History অবলম্বনে তা রচিত। তা সার্থক রচনা। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য বেকনের অনুবাদক রামকমলের অনুজ। সুদীর্ঘ জীবন, অসামান্য মনস্বিতা ও দুর্দমনীয় মতবাদের তিনি অধিকারী ছিলেন (বিপিনবিহারী গুপ্তের 'পুরাতন কথায়' তাঁর বক্তব্য পাঠ্য)। তাঁর অনূদিত পৌল ও ভর্জিনী 'অবোধ বন্ধু' পত্রিকায় যখন (ইং ১৮৬৮-৬৯ ?) প্রকাশিত হতে থাকে তখন তা শুধু বালক রবীন্দ্রনাথকে নয়, সমস্ত ঠাকুর-পরিবারকে চঞ্চল করেছিল— (১৩৬৪-এর বৈশাখে 'দেশে' প্রকাশিত সত্যেন্দ্রনাথের পত্রাবলী দ্রষ্টব্য)। তখন বঙ্কিমের রোমান্সের আবহাওয়া দেশে এসেছে—অর্থাৎ সাহিত্যের 'হাওয়া বদল' হয়ে গিয়েছে ; কৃষ্ণকমলের অনূদিত রোমান্স তাতেই জোগান দেয়। নীলমণি বসাকের কথা পূর্বে বলা হয়েছে। অন্যান্য লেখকদের মধ্যে ছিলেন রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরিশ বিদ্যারত্ন প্রভৃতি সংস্কৃত কলেজের লেখক ; দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের 'সোমপ্রকাশ' (প্রথম প্রকাশ ১৮৫৮) পরবর্তী পর্বেই আলোচ্য। এঁরা কেউ বিদ্যাসাগর নন, তবু তাঁদের শিক্ষায় ও উপদেশে তারাশঙ্কর, দ্বারকানাথ, রাজকৃষ্ণ প্রভৃতি ভালো বাঙলা লিখেছেন ; **রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়** বিদ্যাসাগরের স্নেহভাজন লেখক। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য অবশ্য আরও বিশিষ্ট মনস্বী, 'সংস্কৃত কলেজের লেখক' বললে তাঁর পরিচয় সম্পূর্ণ হয় না।

হিন্দু কলেজের লেখক গোষ্ঠীর সম্মুখে বিদ্যাসাগরের মত কেউ আদর্শ স্থানীয় লেখক ছিলেন না। তা শুভদায়কই হয়েছে। গোষ্ঠীবদ্ধ লেখকরূপেও তাঁরা গড়ে ওঠেন নি। ইংরেজি ভাষার আদর্শ বুঝে নিয়ে এই ইংরেজিওয়ালারা বাঙলাকে বাঙলা হিসাবে গঠিত ও পরিপুষ্ট করতে চেয়েছেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্ববোধিনীর প্রাণ ও বাঙলা ভাষার এক অদ্ভুত স্রষ্টা, যদিও তিনি 'ইংরেজিওয়ালা' হতে চান নি। প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার, দুই ইয়ং বেঙ্গল, 'মাসিক পত্রিকা' স্থাপন করেন (ইং ১৮৫৯)। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল এমন সরল বাঙলা লিখবেন যা বাঙালীর ঘরের মেয়েরা পড়েও বোঝেন —পণ্ডিতরা সে বাঙলা না পড়ে না পড়ুন। রাধানাথ শিকদার সামান্য বাঙলা লিখলেও এজন্যই স্মরণীয়। ইয়ং বেঙ্গল সকলেই হিন্দু-কলেজেরই ছাত্র (দ্রঃ

১২৯), মাসিক পত্রেই তাঁদের 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রথম বেরুতে থাকে। পর-পর্বে উপন্যাস প্রসঙ্গে তা আলোচ্য। সে পর্বেই আলোচ্য ভূদেব, মধুসূদন, রাজনারায়ণ—হিন্দু কলেজের উজ্জ্বল নক্ষত্রমালা, আমাদের ললাটে যাঁরা জ্যোতিলে'খা এঁকে দিয়ে গিয়েছেন।

(ছ) **অন্যান্য গদ্য লেখক ও গদ্য রচনা**—সে যুগের বহু লেখক আজ বিস্মৃত,—কাল অন্যায়ও করে নি তাতে। কিন্তু তাঁদেরও উপযোগিতা তখন ছিল। তাঁদের একজন লেখককে একটি গ্রন্থের জন্য স্মরণ করা প্রয়োজন। 'বঙ্গদূতের' প্রথম সম্পাদক নীলরতন হালদার রামমোহনের অনুবর্তী ছিলেন। তখন থেকেই তিনি বাঙলা ভাষার সেবাও করছেন। তাঁর বাঙলা ভাষা অলঙ্কার-কণ্টকিত। 'প্রভাকরী' গদ্যের প্রভাব তাতে বেশি। কিন্তু নীলমণি হালদারের 'বিদ্যোন্মাদ তরঙ্গিণী' স্মরণীয় তার ভাব-মাহাত্ম্যে। গ্রন্থকার বলেন, "ইহাতে হিন্দু, মুসলমান, য়িহুদী, খ্রীষ্টান, এই চারি জাতির স্ব স্ব ধর্ম বিচার-চ্ছলে এক পরমেশ্বরোপাসনা, ইহাই শাস্ত্রোক্তি সদ্ যুক্তি দ্বারা প্রতিপাদিত হইল। এবং অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত পরস্পর বিবাদ করিলে কোন ফল দর্শে না"—ইত্যাদি। রামমোহনের অনুগামীর উপযুক্ত কথা নিশ্চয়। জয়নারায়ণ ঘোষালের 'করুণানিধানবিলাস'ও (১৮১৩-১৫) এ কারণে স্মরণীয়। কিন্তু এ উদার দৃষ্টিভঙ্গি অন্য জাতির মধ্যে কি এতটা সুলভ? এটিই ভারতবর্ষের দৃষ্টির বিশেষত্ব বাঙালী তা বুঝেছিল,—আধুনিক মানুষের দৃষ্টিও এ জাতীয়ই।

আর দুটি কথাও এই গদ্যের হিসাবনিকাশে ভুলে গেলে চলবে না। যেমন, এ পর্বেও বাঙলা গদ্যের প্রধান আসর ছিল **সংবাদপত্র**—'প্রভাকরের' পরে এল 'তত্ত্ববোধিনী', 'সংবাদ ভাস্কর', 'বিবিধার্থ সংগ্রহ', 'মাসিক পত্র' এবং শেষে 'সোমপ্রকাশ'। এ পর্বে এ সবের কথা আর নতুন করে বলা নিষ্প্রয়োজন। লক্ষণীয় সংবাদ পত্র ও সাময়িক পত্র তখন সংখ্যায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। ইং ১৮৫৩-৫৪ অব্দে **'প্রভাকরের'** পৃষ্ঠায় মাসের প্রথম সংখ্যায় ঈশ্বর গুপ্ত কবি, কবিওয়ালা ও গীতকারদের জীবনী ও লেখা প্রকাশ করতেন (পৃ ১৩৯)। আজও নিধুবাবু, রাম বসু প্রভৃতির সম্বন্ধে তা আমাদের প্রধান এক ঐতিহাসিক সম্বল। এই মাসিক সংখ্যাসমূহে আমরা আধুনিক মাসিক পত্রের পূর্বাভাস পাই। গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য (গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য, ইং ১৭৯৯-১৮৫০) **'সম্বাদ-ভাস্করের'** (প্রথম প্রকাশ ১৮৪৮) সম্পাদকরূপে প্রসিদ্ধ। এ পত্রের

খ্যাতি ছিল প্রচুর, গৌরীশঙ্করও ছিলেন অদ্ভুত লোক। তিনি শ্রীহট্টের মানুষ। পনের বৎসর বয়সে কলকাতায় এসে নিজের উদ্যোগে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। লঙ্ সাহেবের 'সত্যার্ণব' (প্রথম প্রকাশ ১৮৫০) শুধু খ্রীষ্টধর্মের কাগজ ছিল না, লঙ্ যথার্থ সমাজতাত্ত্বিক ও মানবহিতৈষী ছিলেন। ইং ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে 'সোমপ্রকাশ' সাংবাদিকতায় নতুন যুগ আনে।

ভুললে চলবে না বাঙলা গদ্য শেষ দিকে আরও একটি ক্ষেত্রে আপনার আসন পাতছিল ; সে হচ্ছে **বাঙলা নাটক ও রঙ্গমঞ্চ**। সাহিত্যের নতুন প্রকাশের পক্ষে শতাব্দীর মধ্যভাগে বাঙলা নাটকের দান অসামান্য, তা আমরা সকলেই জানি। প্রস্তুতি যখন সম্পূর্ণ, বাঙলা নাটকই তখন বাঙালী প্রতিভাকে আপনার আসরে আত্মপ্রকাশের জন্ত আমন্ত্রণ করলে। নাট্যকার রূপেই সাহিত্যে মধুসূদন প্রথম প্রবেশ করেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নাট্য-সাহিত্যের সূত্রপাত

নাট্যশালা ও নাট্য-সাহিত্য এ দুই-এর সংযোগেই নাট্যকলা। অথবা নাট্যকলা হচ্ছে একাধিক কলার সমন্বয়ে সৃষ্ট একটা নতুন শিল্পকলা। অভিনয় ও কাহিনী রচনা তার মধ্যে প্রধান ; সে সঙ্গে মঞ্চকারু,দৃশ্যাঙ্কন থেকে রূপসজ্জা, আলোক-শিল্পেরও নানা নতুন কলাকৌশল ক্রমে দিনের পর দিন এসে মিশেছে —আরও হয়ত মিশবে। প্রাধান্য তথাপি অক্ষুণ্ণ রয়েছে দু' শিল্পের—অভিনয়-শিল্পের ও নাট্য-সাহিত্যের। আর, এ দুয়ের সংযোগেরও পিছনে থাকে তৃতীয়ের সহায়তা—দর্শক সাধারণের সহৃদয় আগ্রহ। দর্শক শ্রেণীও আবার বিশেষ সমাজ, তার ঐতিহ্য, তার আদর্শ, তার রুচি, শিক্ষা-দীক্ষা, জীবন-দর্শনের বাহক, তা মনে রাখা দরকার। এসব জটিল কারণের যোগাযোগে নাট্যকলার শ্রীবৃদ্ধি বা শ্রীহীনতা ঘটে। কথাটা এই—কাব্য ও কথা-সাহিত্য অনেকটা একক প্রতিভার দান। কিন্তু নাটক রচনার ক্ষেত্রে ব্যক্তি-প্রতিভা আরও অনেক বেশি মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে অন্য শিল্পীদের, যেমন অভিনেতার, মঞ্চাধ্যক্ষের, বিশেষ করে প্রযোজক শিল্পীর, এবং দর্শক সাধারণের। তাই, যে সমাজের জীবন দর্শনে এই জীবনাগ্রহ ব্যাহত, আর জীবনযাত্রায়ও যারা সুশৃঙ্খল যৌথ কর্মে অনভ্যস্ত, সে সমাজে নাট্যকলার মত জটিলতা সমন্বিত শিল্পকলার বিকাশও সহজসাধ্য হয় না। একশত বৎসরেও বাঙালী সংস্কৃতিতে বাঙলা নাট্যশিল্পের ও নাট্য-সাহিত্যের আশানুরূপ বিকাশ হল না কেন, ওপরের এই কথা মনে রাখলে তার মূল কারণ বুঝতে পারি। অবশ্য আধুনিক যুগের কিছু কিছু ভাবনা আমাদের মানস লোকের একাংশে ঢেউ তুলেছে। কিন্তু আধুনিক যুগের আর্থিক সামাজিক ব্যবস্থা আমরা আয়ত্ত করতে পারি নি। তাই, আধুনিক যুগের নাট্যকলার সম্পূর্ণ রসাস্বাদনে আমরা সমর্থ হই না,— সেরূপ 'থিয়েটার' (নাট্যশালা) ও 'ড্রামা' (নাট্যসাহিত্য) রচনা করতে প্রয়াস করি, কিন্তু সেই বাস্তব জীবন-বিন্যাস ও জীবন-চেতনার অধিকারী আমরা হতে পারি নি, তাই সে প্রয়াসে সম্পূর্ণ সার্থকতা অর্জন করতে পারি না।

॥ ১ ॥ দেশী-বিদেশী ধারা সংযোগ

(ক) 'থিয়েটর'-এর ঝোঁক ও লেবেদেভ্ (১৭৯৫)

বাঙলা নাট্যসাহিত্যের মূলে আছে ইংরেজি নাট্যসাহিত্য ও ইংরেজি নাট্যকলার সঙ্গে বাঙালীর পরিচয়। ইং ১৮০০ অব্দের পর থেকে আমরা ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হতে থাকি। তার পূর্বেই অবশ্য ইংরেজি 'থিয়েটর' ও ইংরেজি 'প্লে'র (অভিনীত নাটকের) সঙ্গে কলিকাতার বাঙালীর পরিচয় হয়েছিল। কলিকাতার ইংরেজ সমাজ নিজেদের তুষ্টির জন্য ঘোড়দৌড় ও জুয়ার মত নাচ ও গান এবং এরূপ রঙ্গমঞ্চ ও 'প্লে' বা খেল-এর আয়োজন করত। 'থিয়েটর' নতুন বলেই হোক, কিম্বা উন্নত পদ্ধতির জন্যই হোক, বাঙালীর চোখে ভাল লেগে থাকবে। না হলে রুশ আগন্তুক গেরাসিম লেবেদেভ্ (Gerasin Lebedev) ইং ১৭৯৫ অব্দে ২৫ নং ডোমতলায় (এখনকার এজরা স্ট্রীটে) বাঙলা থিয়েটর খুলতে সাহস করতেন না। লেবেদেভ্ সম্বন্ধে অবশ্য এখন আমাদের ধারণা বদলেছে—তিনি শুধু বাহাদুর প্রকৃতির (অ্যাড্ভেঞ্চারার) বাজে লোক ছিলেন না। ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' তিনি দেশে নিয়ে গিয়েছিলেন—অনুবাদ করতেও চেয়েছিলেন, আর একখানা পূর্ব ভারতীয় ভাষাসমূহের ব্যাকরণও (হিন্দুস্থানী ব্যাকরণ) লেবেদেভ্ লিখেছিলেন। নিশ্চয়ই 'নবযুগের' যুগধর্ম তাঁকে স্পর্শ করেছিল। না হলে এ উদ্যম, উৎসাহ তাঁর এল কি করে? লেবেদেভের থিয়েটরে যে দু'খানি নাটক অভিনীত হল তার ইংরেজি নাম 'দি ডিস্গাইস' ও 'লভ্ ইজ দি বেস্ট ডক্-টর'। বাঙলা অনুবাদে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন গোলকনাথ দাস নামক পণ্ডিত। লেবেদেভের কথা থেকে বোঝা যায় বাঙালীরা তখন হাস্যরস, এমন কি স্থূল ভাঁড়ামি চাইত, তাই নাটক দুখানা ছিল প্রহসনজাতীয় রচনা। তার স্ত্রীভূমিকাও স্ত্রীলোকেই অভিনয় করেছে। টিকিট করেও এ নাটক দেখতে অনেক দর্শক এসেছিল। কারণ, ইং ১৮৯৬-এর মার্চ মাসে দ্বিতীয়-বারও এ অভিনয় হয়, টিকিটের দাম আরও তখন বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, স্থান ছিল মাত্র ২০০ দর্শকের। এর পরেই লেবেদেভের অন্তর্ধান। মনে হয় থিয়েটর চললেও বাঙলা থিয়েটরের এই বিদেশী উদ্যোক্তার উপর ইংরেজ কর্তৃপক্ষ প্রসন্ন ছিলেন না।

ধূমকেতুর মত লেবেদেভ্ এলেন ও গেলেন। ব্যাপারটা তত অর্থহীন মনে

হবে না যদি মনে রাখি 'থিয়েটরের' লোভ বাঙালী সমাজে জাগছিল। পরে-কার প্রায় পঁচিশ বৎসর অবশ্য আমরা বাঙলা থিয়েটার ও নাটকের খোঁজ পাই না, তবু মনে রাখা দরকার—(১) বাঙালী পেশাদারী থিয়েটারের রূপ চিনছিল, (২) ইং ১৮১৭-তে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলে বাঙালী শিক্ষিত সমাজ ইংরেজি নাট্যসাহিত্যের সঙ্গে সুপরিচিত হল। তারপরেও যদি থিয়েটার নির্মাণে ও নাটক রচনায় তার আকাঙ্ক্ষা না জাগত, তাহলে বুঝতে হত—সেই শিক্ষিত শ্রেণী অন্ধ। আর তাঁদের উপরতলার এই নতুন প্রয়াস যদি নিচের তলার সাধারণ সমাজকে ক্রমে আকৃষ্ট না করত, তাহলে মানতে হত ভারতবর্ষের অন্যান্য জাতিদের মত বাঙালীও নাট্যসম্পদে বঞ্চিত থাকবে। আবার, বাস্তব জীবনের প্রয়োজনীয় বিবর্তন ছাড়াই যদি বাঙালী সাধারণ একটা সবল থিয়েটার-ঐতিহ্য গড়ে তুলতে পারত, তাহলে মানতে হত—থিয়েটার সামাজিক সম্পদ না হয়ে উঠলেও বুঝি সগৌরবে চলতে পারে।

বাঙলার নাট্যসাহিত্য নবযুগের ইউরোপের থিয়েটর ও নাট্যসাহিত্যের সন্তান। এই 'নবযুগ' অবশ্য পাঁচশো বা চারশো বৎসর ধরে চলছে। আধুনিক থিয়েটার না জন্মাতেও কিন্তু অভিনয় ছিল, নাটক রচিত হত। গ্রীসে, পরে রোম সাম্রাজ্যে, ভারতবর্ষে চীনে জাপানে প্রাচীন নাট্যকলার বিশিষ্ট-বিশিষ্ট ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল, তা আমরা জানি। সংস্কৃত নাট্যাভিনয়ের সে ঐতিহ্য ভারতবর্ষের নানা অঞ্চলে কতটা জীবিত ছিল, তা এখন বলা শক্ত। তবু চৈতন্যদেব কৃষ্ণনাট্য অভিনয় করেছিলেন, গৌড়ীয় বৈষ্ণব পণ্ডিতেরা নাট্যা-কারে তাঁদের নাট্যকাব্য লিখেছেন। ইংরেজ আমল পর্যন্ত সে জাতীয় জিনিস চলেছে কিনা সন্দেহ। বাঙালীর হাতে ইংরেজ আমলে যা এসে পৌঁছেছিল তা সংস্কৃত নাটক বা তার বংশধররা নয়, তা বাঙলার 'যাত্রা'।

(খ) যাত্রার ঐতিহ্য

'যাত্রা'র উৎপত্তি আর ঐতিহ্য নিয়ে বিশেষ গবেষণা এখন করা নিষ্প্রয়ো-জন (ডঃ এস কে দে'র ইংরেজিতে লেখা উনিশ শতকের বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে তা দ্রষ্টব্য, পৃঃ ৪৪২-৪৫১। সম্ভবত এ জিনিসের উপরই নিবন্ধ রচনা করে সেকালে ডঃ নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় সেণ্টপিটর্সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এচ. ডি উপাধি লাভ করেছিলেন)। কারণ, বাঙলা নাট্যকলার জন্ম যেমন সংস্কৃত নাট্যকলা থেকে নয়, তেমনি বাঙালীর 'যাত্রা' থেকেও নয়। মোটামুটি

একথা জানা দরকার—'যাত্রা' লোকনাট্যের ঐতিহ্য নিয়েই গড়ে উঠেছে। সে তুলনায় সংস্কৃত নাটক দরবারী জিনিস, বিদগ্ধ শ্রেণীর কলা-বোধে তা মার্জিত ও পুষ্ট। অন্যদিকে খুঁটিনাটিতে না গিয়েও বলা যায়—'যাত্রা' যে সমাজের আবিষ্কার, আধুনিক থিয়েটার সে সমাজের আবিষ্কার হতে পারত না। দেশ হিসাবে বা কাল হিসাবেই শুধু যাত্রা ও একালের নাটক পৃথক নয়; পার্থক্যটা মৌলিক—দুই সমাজ-ধর্মের পার্থক্য। থিয়েটার ও আধুনিক নাট্যকলা ইউরোপীয় 'রিনাইসেন্সের' পরবর্তী সমাজে গড়ে উঠেছে, বলেছি। একথার অর্থ এই—সে সমাজের মূল সত্য নূতন জীবন-যাত্রা, নূতন জীবনদর্শন—ঐহিকতা, জীবনানন্দ, বুদ্ধির মুক্তি, ব্যক্তিসত্তার আত্মপ্রতিষ্ঠা, ইত্যাদি। এ নাটককে বলা হয়, 'ড্রামা অব অ্যাকশন'। কর্ম-চঞ্চল-ব্যক্তিচরিত্র হচ্ছে এ নাট্যকলার মূল উপাদান। এর সঙ্গে আমাদের 'যাত্রা'র যে পার্থক্য তাও মৌলিক। প্রথমত আমাদের সে সমাজ তখন পর্যন্ত মধ্যযুগের নিগড়ে বাঁধা, নিবৃত্তিমার্গের শূন্যতায় জীবন তখনো আচ্ছন্ন, কর্ম-চাঞ্চল্য অপেক্ষা কর্ম-সন্ন্যাসই আমাদের নিকট প্রশংসনীয়। মানব-লীলা অপেক্ষা দেবলীলায় আমাদের বেশি রুচি। আর ঐহিকতা অপেক্ষা অলৌকিকতায় আমাদের বেশি আস্থা। এ আবহাওয়াতেই 'যাত্রা'র বিকাশ। বিশেষ করে, গোড়া থেকেই 'যাত্রা' কথাটি বোধহয় বোঝাত দেবপূজার উৎসব, তারপরে, সে সম্পর্কিত দেব-মাহাত্ম্য বর্ণনায় নাচগান--কাহিনী বর্ণনা। সন্দেহ নেই, গানই ছিল তার প্রাণ; অভিনয় বা সংলাপ গৌণ বস্তু। উদ্ভটতা ও অলৌকিকতার বাড়াবাড়ি ছিল 'যাত্রা'র স্বাভাবিক। অবশ্য সভার মাঝখানে 'যাত্রা'র আসর রচিত হত, তাতে দর্শকদের সঙ্গে অভিনেতাদের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ থাকত--এটা যাত্রার বড় গুণ। গ্রাম্য সমাজের রুচির তাগিদে হাস্যরসের যোগান দিতে হত। সেই সূত্রে ক্রমে দেবলীলার মধ্যে নারদ, ব্যাস, জটিলা কুটিলা প্রভৃতি মানব চরিত্র থেকে শেষে একেবারে কালুয়া ভুলুয়া, মেথর মেথরানী, ঘেসেড়া ঘেসেড়ানীও 'যাত্রা'য় এসে গিয়েছিল।,

এ হেন 'যাত্রা' তবু নাট্যকলার গোষ্ঠীরই কন্যা তাতে ভুল নেই। ইউরোপের মধ্যযুগের 'মিরাক্‌ল্ প্লে' ও 'মিস্ট্রি প্লে'ও তো ধর্ম ও দেবলীলার কথা। তার সঙ্গে আধুনিক নাটকের সম্পর্কও স্বীকৃত। তাহলে আমাদের 'যাত্রা' কেন আমাদের 'নাট্যকলা'য় রূপান্তরিত হল না? এ প্রশ্নের উত্তর

আগেই পেয়েছি :—যেহেতু আমাদের মধ্যযুগীয় সমাজ স্বাভাবিক ভাবে রিনাইসেন্সের ঘাত-প্রতিঘাতে যথার্থ নব-জন্ম লাভ করে নি, ইংরেজের চাপে কতকাংশে সেরূপ চিন্তাভাবনায় জাগরিত হয়েছে। তার ফলে, 'যাত্রা'র জগৎ ভেঙে যেতে লাগল, 'থিয়েটরে'র জগৎ এসেও সমাজের মাটিতে শিকড় গাড়তে পারে নি। এমন কি উনিশ শতকে পৌছে থিয়েটার ও আধুনিক নাটকের যখন আমরা রসাস্বাদন করতে পারলাম, আর বাঙলায়ও তদনুরূপ নাট্যকলা-বিকাশে সচেষ্ট হলাম, তখনো 'যাত্রা'র গান, ভঁাড়ামি প্রভৃতি ঐতিহ্য একেবারে কাটিয়ে উঠতে পারলাম না। পুঁথিপড়া সংস্কৃত নাটকের ধাঁচও কাজে লাগাতে কম চেষ্টা করলাম না। বাঙলা থিয়েটারের পক্ষে এই 'প্রস্তুতির পর্ব ছিল যাত্রারও শেষ প্রকাশের কাল। তারপর থেকে 'যাত্রা' থিয়েটারী ঢং-এ নাটক হতে চেষ্টা করেছে, বিংশ শতকে 'থিয়েট্রিক্যাল যাত্রা পার্টি' দেখা দিয়েছে, পুরাণ ছেড়ে ইতিহাসের বিষয় নিয়েও যাত্রা এখন রচিত হয়। অবশ্য পুরাতন ধরনের 'যাত্রা'ও যায় নি। তবে মোটের উপর পুরনো যাত্রা আজ যাবার পথে। নতুন ধরনের যাত্রা কিন্তু এখনো চলিত। আমাদের থিয়েটার, নাটক, ফিল্‌ম, যাই আসুক, 'যাত্রা'র ও-জাতীয় গানের ঐশ্বর্যকে একেবারে অগ্রাহ্য করতে তা সাহস করে না। গানের জন্যই অনেক সময়ে তার জন-প্রিয়তা। নাচও আছে, গীতসম্বলিত নৃত্যনাট্য আছে, আর তা ছাড়া নাচের স্বতন্ত্র প্রকাশও এখন হয়েছে।

'যাত্রা'র পুরাতন পুঁথি নেই, কেউ রাখে নি। লোক-রচনার ও-সব জিনিস রাখতে হত না। গীতগোবিন্দ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন প্রভৃতির কাঠামো দেখে মনে হয় 'কৃষ্ণযাত্রা', বিশেষ করে 'কালীয়-দমন যাত্রা'ই মধ্যযুগে প্রাধান্য লাভ করেছিল। তবে লোক-সমাজে 'চণ্ডীযাত্রা', 'শিবযাত্রা', 'মনসার ভাসান যাত্রা', 'রাম যাত্রা'ও, ছিল, তার উল্লেখ পাই। চৈতন্যদেব যে এরূপ কোনো কৃষ্ণযাত্রার অভিনয়ে যোগদান করেছিলেন, তারও উল্লেখ আছে। নেপাল দরবারে পাওয়া বাঙলা নাটকের মধ্যে আমরা হয়ত এই যাত্রার ধরনের সন্ধান পাই—সে সব রচনা গীতবহুল রচনা, কথা তাতে গৌণ। ব্রিটিশ মিউজিয়ম থেকে (অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের হাতে) নকল-করা এরূপ একটি নাটকের বিষয়বস্তু গোপীচন্দ্র-ময়নামতীর কাহিনী। এটিই বাঙলা যাত্রার প্রাপ্ত প্রচীনতম আদর্শ, সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের রচনা। ততদিনে

বাঙলা দেশে কৃষ্ণলীলার বিষয়, আর কীর্তনের প্রভাব যাত্রায় বৃদ্ধি পেয়ে গিয়েছে। এই বৈষ্ণবভাবে প্রভাবিত যাত্রা এসে পৌছায় উনিশ শতকের দ্বারে। তার পূর্বেকার বা পরেকারও পুঁথিপত্র নেই, যাত্রাওয়ালাদের কিছু কিছু গান বেঁচে আছে। আর অধিকারীদের নাম ও খ্যাতি টিকে আছে। যেমন, বীরভূমের পরমানন্দ অধিকারী সম্ভবত অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে 'কালীয় দমন যাত্রা গাইতেন ('বঙ্গদর্শনে' তার কথা পরে আলোচিত হয়), সুদাম অধিকারী, লোচন অধিকারীরও নাম জানা যায়। আরও নাম—গোবিন্দ অধিকারী (কৃষ্ণনগর), পীতাম্বর অধিকারী (কাটোয়া), কালাচাঁদ পাল (বিক্রমপুর, ঢাকা) ইত্যাদি। উনিশ শতকের পূর্বেই রুচিবিভ্রাট ঘটেছিল—গ্রাম্য ভাঁড়ামি বাড়ছিল একদিকে, অন্যদিকে বাড়ছিল ভারতচন্দ্রীয় রসিকতা। তখনকার প্রধান একজন যাত্রাওয়ালা গোপাল উড়ে (জন্ম ১৮১৯ ?)। তাঁর 'বিদ্যাসুন্দর' কলিকাতার 'বাবু মহলে বিশেষ প্রিয় হয়। আর একজন যাত্রাওয়ালা কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য জন্ম ইং ১৮১০ ?)। শতাব্দীর মধ্যভাগে 'কৃষ্ণলীলা'র গানকে কৃষ্ণকমল শেষ বারের মত উঁচু সুরে বাঁধতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তা প্রধানত 'গান'– নাটক নয়। পূর্ববঙ্গে এখনও যাত্রাকে 'যাত্রা-গান'ই বলে। যাত্রাকে এ-যুগের গীতিনাট্য বা 'অপেরা'র দেশী-জননী বলাই বরং শ্রেয়। নাটক তার সতীন-পুত্র, বিদেশী রাজকুমার। আমাদের নাট্যকলা ও নাট্যসাহিত্যের উপর যতই 'যাত্রা বা সংস্কৃত নাটকের ছাপ পড়ুক, ইউরোপে তার জন্ম। ইংরেজি থিয়েটার ও নাটক, বিশেষ করে শেক্সপীয়র নিয়েই আমাদের এ রাজ্য পত্তনের প্রয়াস। এই প্রস্তুতির পর্বে তার সূত্রপাত মাত্র হয়েছিল।

(গ) **বাঙলা রঙ্গমঞ্চের সূচনা** (১৭৯৫-১৮৫৭): (১) ধূমকেতুর মত লেবেদেভ্ এলেন গেলেন। তার পরে (২) থিয়েটারের কথা শুনি (ইং ১৮৩১-এ, ডিসেম্বর)—প্রসন্নকুমার ঠাকুরের থিয়েটার বা 'হিন্দু থিয়েটার'। বাঙালীর ইউরোপীয় ধরনের নাটক মঞ্চস্থ করবার তা প্রথম প্রয়াস। হিন্দু কলেজের প্রথম দিকের ছাত্র প্রসন্নকুমার 'গৌড়ীয় সমাজে'র প্রতিষ্ঠাতা আর জ্ঞানেন্দ্র-মোহন ঠাকুরের পিতা,—বাঙালীর থিয়েটারের তিনি প্রধান উদ্যোক্তা। কিন্তু সে 'হিন্দু থিয়েটারে' অভিনীত হয় ইংরেজি নাটক– ইংরেজি অনুবাদে 'উত্তর-রামচরিত', 'জুলিয়াস সীজারে'র অংশ বিশেষ, আর পরে (১৮৩২), একখানা

ইংরেজি প্রহসন। বাঙলা নাটক নেই, অথচ দেখছি নাটকের নেশা ও শেক্স-পীয়রের মোহ তখন বাঙালীকে পেয়ে বসেছে। আসলে লেবেদেভের (ইং ১৭৯৫) বাঙলা নাটকের অভিনয়ের পরে (৩) নবীনচন্দ্র বসুর বাড়িতে 'বিদ্যাসুন্দরে'র অভিনয়ই দ্বিতীয় বাঙলা অভিনয় (ইং ১৮৩৫, অক্টোবর)—যদিও বাঙলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে তা তৃতীয় প্রয়াস। এখন যেখানে শ্যাম-বাজার ট্রাম ডিপো সেখানেই নবীন বসুর বাড়িতে এই অভিনয় হয়েছিল। বিদ্যাসুন্দর অবশ্য তখনকার বাঙালীদের পরম উপাদেয় উপাখ্যান। বিদ্যা-সুন্দরে গীত ও স্ত্রী-ভূমিকার অভিনেত্রীদের প্রশংসায় কেউ কেউ উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন, আর রুচিবাগীশেরা এ কাহিনীর অভিনয়ে বিরক্তও হয়েছিলেন।

শিক্ষিতদের রুচি বিদ্যাসুন্দরের পক্ষে তখন মিটল না। থিয়েটার জন্মাল না বটে, কিন্তু (৪) হিন্দু কলেজের ছাত্ররা ইংরেজিতে শেক্সপীয়রের 'মার্চেণ্ট অব ভেনিসে'র খানিকটা অভিনয় বা আবৃত্তি করল লাট-সাহেবের বাড়িতে ইং ১৮৩৭-এ। এটি চতুর্থ প্রয়াস। বাঙালীরা অবশ্য নাটক লেখবার জন্যও চেষ্টা করছিল, ইং ১৮৫২তে এসে বাঙলা নাটক 'ভদ্রার্জুনে'র সন্ধানও আমরা পাব। কিন্তু বাঙলা নাটকের অভিনয় তখন হয় নি। ইংরেজি নাটকের অংশ বিশেষের অভিনয় বা আবৃত্তি নিয়েই শিক্ষিত বাঙালীর নাট্যমঞ্চ রচনার প্রয়াস এগুতে থাকে, নাট্যরস আস্বাদনের শখ মেটাতে হয়। (৫) ডেভিড হেয়ার অ্যাকাডেমির ছাত্রদের ইং ১৮৫৩) 'মার্চেণ্ট অব ভেনিসে'র নাট্যরূপ অভিনয়ের পরে ওরিয়েণ্টাল সেমিনারির ছাত্ররা 'ওরিয়েণ্টাল থিয়েটার' স্থাপন করে। প্রথম তাতে 'ওথেলো' অভিনীত হয় ইং ১৮৫৪তে; পরে ১৮৫৫তে 'হেনরি দি ফোর্থ' ও একখানা প্রহসন (সিবিল সার্বিসের পার্কার সাহেবের রচনা)। তার (৬) দু-এক মাস পরে (ইং ১৮৫৪) ষষ্ঠ প্রয়াস—জোড়া-সাঁকোতে প্যারীমোহন বসুর বাড়িতে 'জুলিয়াস সীজারের' অভিনয়। এদিকে বাঙলা অভিনয় ও রঙ্গমঞ্চের জন্য আকাঙ্ক্ষা বেড়ে উঠছিল—বাঙলা নাটক রচনারও চেষ্টা বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

বাঙলা রঙ্গমঞ্চ ও নাটকের ইতিহাসে ১৮৫৭-৫৮ কালটাকেই নাটকের জন্মকাল বলা যায়। নাটক রচনার চেষ্টা অবশ্য ৫।৬ বৎসর ধরেই চলছিল; আর সেই কথাই সাহিত্যের ইতিহাসে মুখ্যকথা। কিন্তু রঙ্গমঞ্চ ছাড়া, অভিনয় ছাড়া, নাটক ফোটে না। তাই ১৮৫৭-৫৮-এর এই বাঙলা রঙ্গমঞ্চের হিসাবটি

সংক্ষেপে জেনে রাখা প্রয়োজন : (৭) ইং ১৮৫৭-এর জানুয়ারি মাসেই ছাতু-বাবুর বাড়িতে বাঙলায় 'শকুন্তলা' অভিনীত হল— এ অবশ্য সংস্কৃতের অনুবাদ— অনেকে তা দেখে উচ্ছ্বসিত হন ; কিন্তু কিশোরীচাঁদ মিত্র বলেছেন, অভিনয় ব্যর্থ। ঐ মঞ্চেই সে বৎসর (১৮৫৭) 'মহাশ্বেতা' অভিনীত হয়।

(৮) ইং ১৮৫৭ অব্দের মার্চ মাসে কলিকাতা নতুন বাজারে জয়রাম বসাকের বাড়িতে রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীন কুল-সর্বস্ব' প্রথম অভিনীত হয়। নাটকটি অবশ্য ১৮৫৪-এর রচনা, আর এইটিই প্রথম মৌলিক বাঙলা নাটক। এ নাটকের দ্বিতীয় অভিনয় হয় ১৮৫৮-তে কলিকাতায় গদাধর শেঠের ভবনে ও তৃতীয় অভিনয় হয় চুঁচুড়ায় শ্রীনাথ পালের বাড়িতে (১৮৫৮)। অর্থাৎ সেই বিদ্যাসাগরী পর্বে ও সিপাহীযুদ্ধের সময়ে সমাজ-সংস্কারের হাতিয়ার হিসাবে বাঙলা নাটক জনপ্রিয় হচ্ছিল। 'কুলীনকুল-সর্বস্বে'র অভিনয়ে বাঙলার নাটক ভূমিষ্ঠ হল বলা হয়। এবং 'নাটুকে রামনারায়ণই' বাঙলার প্রথম নাট্যকার রূপে গণ্য হন। এ প্রসঙ্গেই স্মরণ রাখা যায়—সমাজ-সংস্কারের উদ্দেশ্যে এরূপ আরও নাটক লিখিত ও নানা স্থানে অভিনীত হয়েছিল।

(৯) কালীপ্রসন্ন সিংহের 'বিদ্যোৎসাহিনী থিয়েটার' একটা বড় আয়োজন। তা স্থাপিত হয় ১৮৫৬ সালে। ইং ১৮৫৭-এর ১১ই এপ্রিল সেখানে প্রথম অভিনীত হয় রামনারায়ণ তর্করত্নের 'বেণী সংহার'। অর্থাৎ সংস্কৃত নাটকের আদর্শ তখনো প্রবল। কালীপ্রসন্ন সিংহ নিজেও নাটক লেখায় নেমেছিলেন। তাঁর প্রথম লেখা 'বাবু নাটক' (ইং ১৮৫৪) অভিনীত হয় নি। তাঁর এই জোড়াসাঁকোর বাড়ির থিয়েটারে তাঁর অনূদিত 'বিক্রমোর্বশী' (ইং ১৮.৭-এর শেষ দিকে) অভিনীত হয়,—কালীপ্রসন্ন পুরুরবার ভূমিকা নিয়েছিলেন। তাঁর মৌলিক রচনা 'সাবিত্রী-সত্যবান' ইং ১৮৫৮, আর তাঁর অনূদিত 'মালতী মাধব' ইং ১৮৫৯ অব্দে অভিনীত হয়। নাট্যসাহিত্যেও তাই কালীপ্রসন্নের পরিচয় গ্রহণ করতে হবে।

(১০) এর পরে 'বেলগাছিয়া থিয়েটার'—পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ দু'ভাইয়ের আয়োজন। ১৮৫৮-এর ৩১শে জুলাই, রামনারায়ণ তর্করত্নের 'রত্নাবলী' দিয়ে সাড়ম্বরে এ নাট্যমঞ্চের উদ্বোধন হয়। কলিকাতার ইংরেজ বাঙালী সকল উচ্চবর্গের পুরুষ সেখানে নিমন্ত্রিত হন। এখানে এই উপলক্ষে মাইকেল মধুসূদনের ডাক পড়ল,—সাহেবদের জন্ত

'রত্নাবলী' নাটকটির ইংরেজি অনুবাদ লিখে দিতে হবে। এ অভিনয়ে রাজারা দশ হাজার টাকা খরচ করেছিলেন। সে দিনের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও গায়কদের তাঁরা একত্র করেন। কিন্তু তাঁরা জানতেন না যে, আরও বড় কাজ তাঁরা করলেন—মাইকেলকে বাঙলা নাটক রচনার জন্ত পরোক্ষে প্রণোদিত করে। 'রত্নাবলী'র অভিনয় সূত্রেই এ সম্ভাবনা দেখা দেয়।

এ অবশ্য ইং ১৮৫৮ অব্দের কথা। কলকাতায় থিয়েটার তখন আর এক-আধটা নয়। রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মাইকেলকে এক পত্রে লিখেছিলেন, 'ঠিকই বলেছ ব্যাঙের ছাতার মত থিয়েটর গজাচ্ছে, আর নাটকের নেশা লোককে পেয়েছে।' ইং ১৮৫৭-৫৮-এর পর থেকে 'ন্যাশনাল থিয়েটারে'র প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত (ইং ১৮৭২) সময়ের মধ্যে ধনী ও উৎসাহী থিয়েটার-পোষকের চেষ্টায় অনেক শৌখীন থিয়েটার দেশে গড়ে উঠেছিল; সে সব থিয়েটারের আশ্রয়ে এ পর্বের অব্যবহিত পরে বাঙলার নাট্যকলার লালিত-পালিত হবার মত সৌভাগ্য হয়।—এ সব থিয়েটারের মধ্যে সসম্মানে দু-চারটের কথা উল্লেখ করতে হয়। যেমন, (১১) ইং ১৮৫৯-এর ২৩শে এপ্রিল, সিঁদুরিয়াপটির হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজে (রামগোপাল মল্লিকের বাড়ি) মেট্রোপলিটান থিয়েটার কর্তৃক অভিনীত উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবা বিবাহ নাটক'। সমাজ-সংস্কারের ঝোঁক এ নাটকেও স্পষ্ট। নাটকখানি ইং ১৮৫৬-এর রচনা। এ নাটক ও এ অভিনয় স্মরণীয় একটি বিশেষ কারণে—যুবক কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁর বন্ধুরা এ অভিনয়ের উদ্যোক্তা; কেশবচন্দ্র তাতে সোৎসাহে একটি ভূমিকায় নেমেছিলেন। বাঙালী সমাজের উচ্চতম মনস্বীরা কী দৃষ্টিতে তখন নাটকাভিনয় দেখতেন, এর থেকে তা বোঝা যায়। ব্রাহ্মসমাজের নীতির গোঁড়ামি রঙ্গাগার ও অভিনয়ের বিরুদ্ধে জেগেছিল এর অনেক পরে।

(১২) তারপর 'পাথুরিয়াঘাটার থিয়েটার'—গোপীমোহন ঠাকুরের বাড়িতে ১৮৬০এ এখানে অভিনীত হল 'মালবিকাগ্নিমিত্র'। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর এই রঙ্গাগারের দুই গুণী প্রতিপালক হয়ে দাঁড়ান। ইং ১৮৭৩ পর্যন্ত এখানে অভিনয় চলে। লর্ড নর্থব্রুকের সম্মানে এখানে অভিনীত হয়েছিল—'রুক্মিণী হরণ' ও 'উভয় সঙ্কট'।

(১৩) শোভাবাজার 'প্রাইভেট থিয়েট্রিকাল পার্টি'র উদ্যোগে ইং ১৮ ৫ সালে প্রথম অভিনীত হয় মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'একেই কি বলে সভ্যতা?'

এবং ইং ১৮৬৭ অব্দে 'কৃষ্ণকুমারী নাটক'। অবশ্য ১৮৫৯-৬০ থেকেই মাইকেলের প্রতিভায় বাঙলা সাহিত্য উদ্ভাসিত।

(১৪) শেষে, জোড়াসাঁকোর থিয়েটার—ঠাকুরবাড়ির গুণীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, সারদাপ্রসাদ গাঙ্গুলী ছিলেন এ উদ্যোগের প্রাণ। এখানেও প্রথম অভিনীত হয় মাইকেলের কৃষ্ণকুমারী নাটক', পরে 'একেই কি বলে সভ্যতা?'। আরও পরে রামনারায়ণের 'নব নাটক'। ইং ১৮৬৫ থেকে ইং ১৮৬৭, দু বৎসর এ থিয়েটার চলে।

বউবাজারের 'বঙ্গ নাট্যালয়ে'র স্থান তার পরে—১৮৬৮ থেকে। তাছাড়া বাগবাজার বঙ্গ নাট্যালয়, গরাণহাটা, ভবানীপুর প্রভৃতি বহু স্থানে এরূপ নাট্যমণ্ডলী গড়ে উঠেছিল। বাগবাজারের অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি, গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি খ্যাতনামা অভিনেতারা 'ন্যাশনাল থিয়েটারের' পত্তন করেন। তাতে স্থায়ী রঙ্গমঞ্চের যুগ ১৮৭২এ এসে গেল।

॥ ২ ॥ নাট্য-সাহিত্যের সূচনা

সন তারিখের হিসাবে প্রস্তুতির পর্ব ছাড়িয়ে অনেক দূরে আমরা (১৮৭২) এসে গেলাম। কারণ, ভাবধারা ও কর্মধারা সর্বদাই সন তারিখের কৃত্রিম সীমানা পার হয়ে যায়। আসলে বাঙলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে সেই ইং ১৭৯৫ থেকেই ইং ১৮৭২ পর্যন্ত মোটামুটি একটাই যুগ। তবে সুবিধার জন্য 'কুলীন কুল-সর্বস্ব'র অভিনয়ে বলা যায় 'নাটকের সূত্রপাত'; 'বিদ্যোৎসাহিনী থিয়েটারে'র 'বেণী সংহার', 'সাবিত্রী-সত্যবান' প্রভৃতিকেও এ পর্বেরই অন্তর্গত করতে পারি। বেলগাছিয়া থিয়েটারের 'রত্নাবলী' (জুলাই ১৮৫৮) থেকে তাতে আর একটা নূতন বেগের সঞ্চার হয়। তাই সেই ১৮৫৮ থেকে ন্যাশনাল থিয়েটারে ১৮৭২-এর ৭ই ডিসেম্বরের 'নীলদর্পণ' অভিনয়ের কালকে বলা যায় 'বাঙলা নাটকের জন্মকাল'। বাঙলা থিয়েটারের ইতিহাসে এটা Age of Patrons, রঙ্গপোষকদের যুগ, বা শখের থিয়েটারের কাল। ইং ১৮৭২ থেকে 'পেশাদারী পর্ব', সাধারণ রঙ্গাগারের আরম্ভ হয়। কৃত্রিম ব্যবধান না সৃষ্টি করে আমরা সুবিধার জন্য ধরে নিতে পারি নাট্য-সাহিত্যের দিক থেকে তারাচরণ শিকদার, হরচন্দ্র ঘোষ, রামনারায়ণ তর্করত্ন, কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রভৃতির নাটক-সমূহ মূলত 'প্রস্তুতির পর্বে'র (ইং ১৮৫৮ পর্যন্ত) মধ্যে গণনীয়।

অবশ্য—রামনারায়ণের শেষ নাটক 'কংসবধ নাটক' রচিত হয় ইং ১৮৭৫ অব্দে। এবং (১৮৫৯-৬০) মাইকেল মধুসূদন, দীনবন্ধু মিত্রের নাট্য রচনা থেকে নাট্য-সাহিত্যের প্রকাশের পর্ব' আরম্ভ হয়। শখের থিয়েটার ও অনিয়মিত অভিনয়ই তখনো তার ভরসা ছিল—ন্যাশনাল থিয়েটারের পত্তন না হওয়া পর্যন্ত। সেরূপ শৌখীন নাটক ও নাটকের দল এখনো বাঙলা নাট্যকলার একটা প্রধান উৎস। আর একটা জিনিসও লক্ষণীয়—সামাজিক ব্যঙ্গ রচনার ধারার সঙ্গে সামাজিক চিত্র-রচনার ধারারও ক্রমে সূত্রপাত হয়। 'কুলীন কুল-সর্বস্বে'ই তার প্রারম্ভ। এরূপে নাট্য-সাহিত্যের উদ্বোধনে সামাজিক সংস্কার আন্দোলন প্রধান প্রেরণা জোগায়। কিন্তু পাশে-পাশেই চলেছিল সংস্কৃত নাটকের ধারারও অনুবর্তন। রামনারায়ণ কেন, মধুসূদনও পৌরাণিক-রোমান্টিক ধারার নাটক রচনা করেছেন। সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ, কখনো কখনো তার অবলম্বন, কখনো পুরাতন ঐতিহ্যে নূতন রচনা। বাস্তব চেতনা অস্পষ্ট থাকাতে সংস্কৃত নাটকের রোমান্টিক ঐতিহ্য ও পরে ইংরেজি রোমান্টিক নাটকের ঐতিহ্যই বাঙলা নাট্যকারদের আশ্রয় হয়। শেক্সপীয়রের দৃষ্টান্তও তার একটা কারণ। এই রোমান্টিক ধারাতেই পুরাণ ছেড়ে ঐতিহাসিক নাটক রচনাও চলে।

কীর্তিবিলাস (ইং ১৮৫২)—ইং ১৮৫২ অব্দে দুখানা বাঙলা নাটক রচনার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়—দুখানাই ইংরেজি নাট্যসাহিত্যের আদর্শে গঠিত। একখানা যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্তের 'কীর্তিবিলাস' আর একখানা তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন'। দুখানার একখানাও অভিনীত হয় নি, তাই সাহিত্য হিসাবেই তাদের পরিচয়; রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে তাদের স্থান নেই। এবং প্রথম দিককার রচনা না হলে বলতে হত সাহিত্য বিচারেও দুখানাই পরিত্যাজ্য। 'কীর্তি-বিলাসে'র প্রধান গুরুত্বই এই যে, কীর্তিবিলাস ট্রাজিডি বা বিয়োগান্ত নাটক। এ দেশের নাটকের ঐতিহ্যে ট্রাজিডি নেই। দীর্ঘ ভূমিকায় লেখক তাই ট্রাজিডির পক্ষে তার যুক্তি দিয়েছেন। এজন্য সে ভূমিকাটি উল্লেখযোগ্য। তাতে দেখতে পাই আরিস্টটল থেকে শেক্সপীয়র পর্যন্ত পাশ্চাত্ত্য মনস্বীদের মতামত তাঁর পরিচিত। বাঙলা নাট্যজগতের তৎকালীন আবহাওয়া বোঝার পক্ষে এ তথ্যটি উল্লেখযোগ্য। 'কীর্তিবিলাসে'র উপর 'হ্যামলেটে'র ছাপ আছে। কিন্তু তা স্মরণ করলে দুঃখই হয়। বরং 'কীর্তিবিলাস'কে এদেশীয়

সেই 'বিজয়বিসন্ত', কাহিনীর নাট্যরূপ বলাই শ্রেয়।—বিমাতার প্রণয় প্রত্যাখ্যান ও তার ফলে বিমাতার চক্রান্তে রাজপুত্রের জীবন-সংকট—এক্ষেত্রে, শেষ পর্যন্ত প্রাণ বিয়োগ,—এ গল্প এদেশে সুপ্রচলিত। 'কীর্তিবিলাস'ও তাই, তার বেশি কিছু নয়। যথার্থ নাটক এটি নয়, চরিত্র অঙ্কিত হয়নি, কর্ম-সংঘাত (অ্যাকশন) যে পাশ্চাত্ত্য নাটকের প্রাণ, লেখকের সে বোধ নেই। গদ্যসংলাপের বা পয়ারে রচিত পদ্যসংলাপের ভাষাও কৃত্রিম। লেখক আরিস্টটলের দোহাই দিয়েছেন আবার সংস্কৃত নাটকের অনুকরণে 'নান্দী', 'প্রস্তাবনা' প্রভৃতিও ছাড়েন নি। তবু সত্যই যিনি ট্রাজিডি লেখার সাহস করেছেন তাঁকে স্বীকার করতে হবে।

ভদ্রার্জুন (১৮৫২)—তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জুনে'ও ইংরেজি আদর্শের নাটকের উপরে সংস্কৃত বা বাঙলা প্রচলিত নাট্যাদর্শের ছাপ পড়েছে। তারাচরণ জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনষ্টিটিউশনের গণিত শিক্ষক ছিলেন। 'ভদ্রার্জুনে'র উল্লেখযোগ্য জিনিস—লেখকের লিখিত ছয় পৃষ্ঠার ভূমিকা ; কাহিনী যে মহাভারতের সুভদ্রাহরণ, তা বলবার পরে লেখক জানিয়েছেন, "এই নাটক ক্রিয়াদি ও ঘটনাবস্থানের নির্ণয় বিষয়ে ইউরোপীয় নাটক প্রায় হইয়াছে।" অর্থাৎ 'অ্যাক্ট', 'সিন' প্রভৃতিতে বিভক্ত ; নান্দী, প্রস্তাবনা প্রভৃতি নেই। আসলে মহাভারতের আখ্যানটি কথোপকথনে প্রকাশের চেষ্টা করা হয়েছে, তার বেশি নাট্যগুণ 'ভদ্রার্জুনে' বিশেষ নেই, ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত, চরিত্রের বিকাশ বিবর্তন, নাটকোচিত প্লট নির্মাণ লেখকের পক্ষে সম্ভব হয় নি। তবে ভাষা মোটামুটি সেদিনের পক্ষে প্রাঞ্জল ; এবং চরিত্র মাঝে মাঝে সজীব, বিশেষ করে মেয়েলি কথাবার্তার চিত্র স্বাভাবিক। প্রাত্যহিক জীবনের আদর্শের দিক থেকে এসব চরিত্র-চিত্র উপস্থিত করা হয়েছে। (ডঃ সুশীল-কুমার দে'র 'নানা নিবন্ধ' দ্রষ্টব্য, পৃ ১৪১)। "মামুলী কাব্যগত গল্পের আদর্শে অভিভূত বাংলা-সাহিত্যে এই সজীবাঙ্কন-ক্ষমতা নূতন বটে!" (ঐ—পৃ ১৫০)—এজন্যই ভদ্রার্জুন অগ্রাহ্য করবার মত নয়।

হরচন্দ্র ঘোষের নাটক

নাট্যসাহিত্যের দিক থেকে হরচন্দ্র ঘোষের 'ভানুমতী-চিত্তবিলাস নাটক' তৃতীয় রচনা রূপে গণ্য। ইং ১৮৫৩ অব্দে তা প্রকাশিত হয়, কিন্তু ইং ১৮৫২-তেই তা রচিত হয়ে থাকবে। এর পরে চতুর্থ রচনা সম্ভবত কালীপ্রসন্ন সিংহের

'বাবু নাটক' এবং পঞ্চম (যা সচরাচর প্রথম বলে উল্লিখিত হয়) অবশ্য রামনারায়ণ তর্করত্নের প্রসিদ্ধ 'কুলীন কুল-সর্বস্ব' (ইং ১৮৫৪)। কিন্তু রচনা ও অভিনয়ে ওরূপ কালানুক্রমিক বর্ণনা ছেড়ে এ প্রসঙ্গেই হরচন্দ্র ঘোষের অন্যান্য নাটকের কথাও আমরা আলোচনা করতে পারি। বলা বাহুল্য; হরচন্দ্র ঘোষ (ইং ১৮১৭-ইং ১৮৮৪) ও রামনারায়ণ তর্করত্ন (ইং ১৮২২ ইং ১৮৮৫) দু'জনাই দীর্ঘদিন পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে নাটক রচনা করে গিয়েছেন। বাঙলা রঙ্গমঞ্চের প্রসারের ও বাঙলা নাট্যসাহিত্যের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের প্রচেষ্টাও অবিশ্রান্ত চলেছে। তাঁদের রচনায় সেই ক্রমবিকাশের চিহ্ন থাকতে পারে, কিন্তু সত্যকারের নাট্যবোধের পরিচয় আছে কিনা সন্দেহ। সাহিত্য বিচারে এঁরা মাইকেল-বঙ্কিমের জগতের মানুষ নন—তৎপূর্ববর্তী প্রস্তুতি পর্বে'র পথচারী। এ কথাটা নাট্যসাহিত্য ধরলে কালীপ্রসন্ন সিংহের সম্বন্ধেও প্রযোজ্য; কিন্তু সাহিত্যে তাঁর স্থান নাটক দিয়ে নয়, আর মনে-প্রাণে তিনি নব-জাগরণের ভাব-প্লাবনের প্রতিভূ। হরচন্দ্র ঘোষ, রামনারায়ণ ও কালীপ্রসন্নের নাট্য-সাহিত্যের কথা এখানেই আলোচনা করছি।

হরচন্দ্র ঘোষ ইং ১৮১৭ অব্দে হুগলীতে জন্মগ্রহণ করেন। হুগলী কলেজে শিক্ষালাভ করে তিনি মালদহে আবগারী বিভাগে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হন। অতএব তিনি পদস্থ চাকুরে বাঙালী, আর শিক্ষিত বাঙালী। ইংরেজি, সংস্কৃত, বাঙলা সব ভাষাতেই অধিকারী। ইং ১৮৮৪ অব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। ইং ১৮৭০ পর্যন্ত তিনি গ্রন্থ লিখেছিলেন। তবে নাটক দিয়েই তাঁর পরিচয়। সে হিসাব এরূপ—

(ক) ভানুমতী চিত্তবিলাস—ইং ১৮৫৩ অব্দ।
(খ) কৌরব বিয়োগ—ইং ১৮৫৮ অব্দ।
(গ) চারুমুখচিত্তহরা—ইং ১৮৬৪ অব্দ।
(ঘ) রজতগিরিনন্দিনী—ইং ১৮৭৪ অব্দ।

প্রথম থেকেই দেখা যাবে শেক্সপীয়র যেমন তাঁর মন জুড়ে বসে আছেন, তেমনি সংস্কৃত ও বাঙলা ঐতিহ্যও তিনি গ্রহণ করছেন। কিন্তু বিপদ এই যে, প্রচেষ্টা থাকলেও নাটক-রচনার মত কিছুমাত্র প্রতিভা তাঁর ছিল না। তথাপি 'ভানুমতী চিত্তবিলাসে'রই গুরুত্ব বেশি, কারণ তা প্রথম রচনা (ইং ১৮৫৩)। অভিনয়ের জন্য নয়, বরং ছাত্রদের পাঠ্যগ্রন্থ রূপেই তা রচিত হয়েছিল। অথচ

সে সৌভাগ্যও নাটকখানার হয় নি, সেজন্য লেখকের ক্ষোভ ছিল। নাটকখানা ঠিক অনুবাদ না হলেও শেক্‌স্‌পীয়রের 'মার্চেন্ট অব ভেনিসে'র অনুসরণ। শেক্‌স্‌পীয়র বাঙালীকে প্রথম থেকেই মাতিয়েছেন। যদি না মাতাতে পারতেন তা হলে বোঝা যেত বাঙালীর রসবোধ নেই। যদি কোনো দিন আমরা আর শেক্‌স্‌পীয়রকে তেমন আপনার করে না গ্রহণ করতে পারি তা হলে তা আমাদেরই দুর্ভাগ্য। উনবিংশ শতকের প্রথম থেকেই ইংরেজি-পড়া বাঙালী শেক্‌স্‌পীয়রের নাটকের অভিনয় করতে চেষ্টা করতে থাকে, বাঙলা ভাষায় তা নানাভাবে অনুবাদ করতেও চেষ্টা করে,—আমরা তা পূর্বেই দেখেছি। কিন্তু একথাও আমরা বুঝি—আমাদের ভারতীয় ভাষায় শেক্‌স্‌পীয়রের স্বচ্ছন্দে আবির্ভাব দুঃসাধ্য তপস্যারই বিষয়। উনবিংশ শতকে তো আমাদের গদ্য বা পদ্য কোনো ভাষাই সেজন্য তৈরী হয়ে ওঠে নি। হরচন্দ্র ঘোষ তাই নিজের খুশিমত মার্চেন্ট অব ভেনিস্ পরিবর্তন করেছেন, তাতে ছাঁট-কাট করেছেন, নতুন চরিত্র জুড়েছেন, 'কদা উজ্জয়িনী কদা গুজরাট দেশে' নাট্যাখ্যান স্থাপন করেছেন, শেক্‌স্‌পীয়রের পোর্সিয়াকে ভানুমতী ও বেসানিওকে চিত্তবিলাসে নামান্তরিত ও রূপান্তরিত করেছেন,—যা প্রয়োজন মনে করেছেন সবই জুগিয়েছেন। এর উপরে তাঁর অসুবিধা ছিল এই যে, যে-বাঙলা ভাষা তখন মাত্র গড়ে উঠেছে সে বাঙলা ভাষাও তাঁর আয়ত্ত নয়। নাটকোচিত স্বচ্ছন্দ বাঙলা তো তখনো জন্মায় নি, কৃত্রিম সাধুভাষার কৃত্রিমতাতেই তাঁর রুচি। পদ্য সম্বন্ধেও সেই কথা—পয়ারের চরণ মিলিয়েই তা সার্থক। রেভারেণ্ড লঙ্ বাঙলা বই দেখলেই উৎসাহিত হতেন, তাই এ বই পড়েও তিনি খুশি হয়েছেন।

এর পরে ইং ১৮৫৮-তে হরচন্দ্র ঘোষ প্রকাশ করলেন, 'কৌরব বিয়োগ'। কাশীরামদাসের মহাভারত থেকেই কাহিনী গৃহীত, তবে অনুবাদ নয়। এটিও পঞ্চাঙ্ক নাটক, 'অঙ্গে' (বা আধুনিক ভাষায় 'দৃশ্যে') বিভক্ত। ভাষায় তেমনি সংস্কৃতের ঘটা পয়ার ত্রিপদীতে বর্ণনাও আছে। তৃতীয় নাটক 'চারুমুখ-চিত্তহরা' ইং ১৮৬৪ অব্দে প্রকাশিত হয়—তার পূর্বেই মাইকেল অবতীর্ণ হয়েছেন। এটি শেক্‌স্‌পীয়রের 'রোমিও-জুলিয়েটে'র অনুবাদ অর্থাৎ শেক্‌স্‌পীয়রের সঙ্গে আর একবার কসরত। তবে লেখক ভূমিকাতে বলেছেন, এবার তিনি 'সুমার্জিত সাধু ভাষায় না লিখে কথিত কোমল সরল বাক্যে' নাটক

রচনা করছেন। সত্যই এবার ভাষা কতকটা সরল হয়েছে, কিন্তু সর্বত্র হয় নি। "ইহাকে শেক্স্পীয়রের অনুবাদ বলিয়া ধরাই ধৃষ্টতা।" ইং ১৮৬১-এর পূর্বে বাঙলায় এমন নাটক প্রকাশিত হয়েছে, যাতে নাট্যগুণ দেখা যায়। কিন্তু হরচন্দ্র ঘোষ নাটক বুঝতেন না। জীবনের অভিজ্ঞতার চিত্র, চিত্রাঙ্কন, কাহিনীর সক্রিয় উদ্ঘাটন—এসব তাঁর অজ্ঞাত। "রজতগিরিনন্দিনী" ইং ১৮৭৪-এ প্রকাশিত, একটি ব্রহ্মদেশীয় সুন্দর উপাখ্যানকে নাটকাকারে মাটি করা মাত্র। কারণ, কাহিনীটি নাটকীয় নয়, আর লেখকের নাটক-রচনার ধারণা নেই।

কালীপ্রসন্ন সিংহের নাটক

বাঙলা সাহিত্যে কালীপ্রসন্ন সিংহের (ইং ১৮৪০-ইং ১৮৭০) নাম সুপরিচিত —অবশ্য নাট্যকার হিসাবে সে পরিচয় নয়। তবু রঙ্গমঞ্চের পরিপোষক হিসাবে তিনি অগ্রগণ্য ; আর সে হিসাবেই কালীপ্রসন্ন নাট্যকার। চারখানা নাটক তিনি লেখেন। ইং ১৮৫৪তে তিনি প্রথম লিখেছিলেন 'বাবু নাটক'। পরে তাঁর জোড়াসাঁকোর ভবনে বিখ্যাত 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'র অধীনস্থ রঙ্গমঞ্চের জন্ম তিনি তিনখানি নাটক রচনা করেন 'বিক্রমোর্বশী'—ইং ১৮৫৭তে রচিত, 'সাবিত্রী-সত্যবান' ইং ১৮৫৮তে রচিত, আর 'মালতী মাধব' রচিত হয় ইং ১৮৫৯-এ। 'বিক্রমোর্বশী' ও 'মালতী মাধব' আসলে প্রসিদ্ধ সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ। অবশ্য 'মালতী মাধবে' কালীপ্রসন্ন অনেকটা স্বাধীনতা নিয়ে পরিবর্তন, পরিবর্জন করছেন। 'সাবিত্রী-সত্যবান'ই তাঁর নিজের রচনা। কিন্তু দেখছি কালীপ্রসন্ন সিংহের মত প্রগতিকামী পুরুষও নাটকের বেলায় নূতন নাটকের প্রাণবস্তুকে বিশেষ আয়ত্ত করতে পারেন নি ; সংস্কৃতের আঁচল ধরেই তাঁর লিখিত বাঙলা নাটক চলছে। আরও আশ্চর্য কথা, তখনো 'হুতোমে'র স্রষ্টার লেখা বাঙলা ভাষা যথেষ্ট পরিমাণে সংস্কৃত-গন্ধী ও কৃত্রিম ছিল। অবশ্য ক্রমেই যে তিনি সে বাঁধন কাটিয়ে উঠেছেন, তা 'সাবিত্রী-সত্যবান' ও 'মালতী মাধব' থেকে দেখতে পারি। নাটকের সংলাপের ভাষার জন্ম কথিত ভাষার দিকে নাট্যকারদের দৃষ্টি পড়েছে, তবু তখনো সে ভাষা কৃত্রিম। তা ছাড়া, যাত্রার ধরন থেকেই গিয়েছে। 'সাবিত্রী-সত্যবানে' অবশ্য নাট্যগুণ আছে, কিন্তু তা "খুব উঁচুদরের রচনা নয়"—সংস্কৃত নাটকের প্রভাবই তাতে বেশি।

ভাষায়ও হালকা চলতি (প্রায় 'হুতোমী') ভাষার সঙ্গে গুরুগম্ভীর সাধুভাষার বেমানান মিশ্রণ দেখা যায়। আর একটি কথা—'সাবিত্রী-সত্যবানে' ও 'মালতী মাধবে' কালীপ্রসন্ন প্রচুর গীত জুগিয়েছেন। যাত্রার ঐতিহ্যে অভ্যস্ত বাঙালী শ্রোতারা যে নাটকে গীত চাইতেন বেশি, এ থেকেও তা বোঝা যায়। বাঙলা নাটককে গীতাশ্রয়ী করতে কালীপ্রসন্নও সাহায্য করেছেন। রবীন্দ্রনাথও তা ছাড়েন নি।

রামনারায়ণ তর্করত্নের নাটক

সাধারণ ভাবে, রামনারায়ণ তর্করত্নকেই আধুনিক বাঙলা নাটকের প্রথম স্রষ্টা বলে ধরা হয়। রামনারায়ণ তর্করত্ন (ইং ১৮২২-১৮৮৫) তাঁর স্বকালেই 'নাটুকে রামনারায়ণ' বলে পরিচিত হয়েছিলেন। তাঁর রচিত মৌলিক নাটকই প্রথম অভিনীত হয়, সে নাটক 'কুলীন কুল-সর্বস্ব'। মধুসূদন-দীনবন্ধুর নাট্য-সাহিত্য এসে, আর ১৮৭২-এ 'ন্যাশনাল থিয়েটার' প্রতিষ্ঠিত হয়ে নাটকের হাওয়া পালটিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত রামনারায়ণ তর্করত্নই ছিলেন বাঙালী সমাজের সর্ব-সমাদৃত নাট্যকার। এ খ্যাতি বজায় রাখতে রামনারায়ণ প্রায় ২০ বৎসর ধরে (ইং ১৮৫৪-১৮৭৫) বহু নাটক রচনা করে গিয়েছেন। সে সব নাটকের নাম আজ প্রায় শোনা যায় না। কিন্তু তাঁর 'কুলীন কুল-সর্বস্ব'কে সচরাচর প্রথম বাঙলা নাটক বলে ধরা হয়, এ কথা স্মরণীয়। বাঙলা সাহিত্যে 'নাটুকে রামনারায়ণে'র স্থানও তাই সুনিশ্চিত। তবে যতকাল ধরেই যত নাটক লিখুন সুনিশ্চিত রূপেই তিনি মধুসূদন-দীনবন্ধুর পূর্বযুগের নাট্যকার, বাঙলা নাটকের পথই প্রস্তুত করেছেন।

ইং ১৮২২ অব্দে চব্বিশ পরগণায় হরিণাভি গ্রামে রামনারায়ণের জন্ম। রামনারায়ণ চতুষ্পাঠীতে নানা শাস্ত্র পড়ে সংস্কৃত কলেজে দশ বৎসর অধ্যয়ন করেন। পরে তখনকার হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজের সংস্কৃতের প্রধান শিক্ষকরূপে কর্মজীবন আরম্ভ করেন। বাঙলা রচনায় তখনই তিনি প্রবৃত্ত হন, তাঁর দক্ষতাও স্বীকৃত হয়। তখন 'তত্ত্ববোধিনীর যুগ', সংস্কৃত কলেজের ছাত্ররা বিদ্যাসাগরের প্রবল সংস্কারাগ্রহের দ্বারাও প্রভাবিত হয়ে থাকবেন। তাই সমাজ-সংস্কারের আন্দোলনে তখনকার সংস্কৃতজ্ঞ অধ্যাপকদের কারও কারও উৎসাহ হিন্দু কলেজের ইংরেজি-পটু কৃতবিদ্যদের অপেক্ষা কম ছিল না

রঙ্গপুরের জমিদার কালীচন্দ্র চৌধুরী কৌলীন্য-প্রথার বিরুদ্ধে সর্বোৎকৃষ্ট নাটক রচনার জন্ত ৫০৲ টাকা পুরস্কার বহু সংবাদপত্রে ঘোষণা করেছিলেন। রামনারায়ণ পূর্বে (ইং ১৮৫২) 'পতিব্রতোপাখ্যান' লিখে অন্ত একটি পুরস্কার পেয়েছিলেন। এই দ্বিতীয় পুরস্কারের বিজ্ঞাপনে আকৃষ্ট হয়ে তিনি 'কুলীন কুল-সর্বস্ব' রচনা করলেন। পুরস্কার তিনিই লাভ করেন। কালীচন্দ্র নিজব্যয়ে নাটকখানি মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন (ইং ১৮৫৪ অব্দে)। ইং ১৮৫৭ সালে যখন বাঙলা নাটকের অভিনয়ের উৎসাহ প্রবল হয় তখন 'কুলীন কুল-সর্বস্ব' প্রথম অভিনীত হল নূতন বাজারের জয়রাম (রামজয়?) বসাকের বাড়িতে। এ অভিনয়ের পর 'কুলীন কুল-সর্বস্বে'র আরও অভিনয় হতে লাগল। এর গুরুত্ব তাই বোঝা দরকার—দর্শকদের তা আকর্ষণ করে—বাঙালী সমাজের তখনকার সংস্কার আন্দোলনে তা নূতন শক্তি জোগায়; বাঙলা নাটকেও তা সমাজ-সংস্কারের ধারায় শক্তি সঞ্চার করে, তাও আমরা বুঝতে পারি। নাট্যমঞ্চের ভিত্তি-স্থাপনের শুভক্ষণে অভিনীত হয়ে তা মঞ্চ-পোষকদের উৎসাহ বাড়িয়ে দেয়;—আর রামনারায়ণকে বাঙলা নাট্য-সাহিত্যের কর্ণধার করে তোলে। কালীপ্রসন্ন সিংহ নিজের রঙ্গমঞ্চের জন্ত রামনারায়ণকে দিয়ে লেখালেন 'বেণী সংহার' (ইং ১৮৫৪)। ইং ১৮৫৮তে বেলগাছিয়ার সুপ্রসিদ্ধ রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের জন্ত 'রত্নাবলী'ও তিনি প্রণয়ন করেন;—সেই নাটকের ইংরেজি অনুবাদের জন্তই মধুসূদন নিযুক্ত হন, আর সেই সূত্রেই বাঙলায় ভাল নাটক রচনা করবেন বলে মধুসূদন প্রতিশ্রুতি দেন। মধুসূদনের প্রথম বাঙলা নাটক 'শর্মিষ্ঠা'ও অভিনয়ের পূর্বে রামনারায়ণ দেখে দিয়েছিলেন; কারণ, বাঙালীর চোখে রামনারায়ণ তখন নাট্য-সাহিত্যের গুরু। মধুসূদন-দীনবন্ধুর আবির্ভাবের পরেও রামনারায়ণের এ প্রতিষ্ঠা খর্ব হয় নি, প্রচেষ্টাও ব্যাহত হয় নি। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-বাড়িতে গুণীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে দিয়েই 'নবনাটক' লেখান (ইং ১৮৬৬); আর তা পুরস্কৃত করেন, অভিনীত করান (ইং ১৮৬৭)। পাথুরিয়াঘাটার রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের জন্ত যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর (পরে 'মহারাজা') তাঁকে দিয়ে 'বিদ্যাসুন্দর' (ইং ১৮৬৫), 'মালতী-মাধব' (ইং ১৮৬৭) প্রভৃতি সংকলিত করান; 'যেমন কর্ম তেমন ফল' (ইং ১৮৬৬?) প্রভৃতি প্রহসন রচনা করান, ও 'রুক্মিণী-হরণ' (ইং ১৮৭১) প্রভৃতি পৌরাণিক নাটক

লেখান। এসব নাটক সেই ইং ১৮৬০—ইং ১৮৭২এর মধ্যে অভিনীতও হয়েছিল। তারপরেও রামনারায়ণ লিখেছিলেন 'কংসবধ' (ইং ১৮৭৫)—মহারাজা যতীন্দ্রমোহনেরই অনুরোধে। তা ছাড়াও রামনারায়ণ 'স্বপ্নধন' (ইং ১৮৭৩-। অভিনীত হয়েছিল) 'ধর্মবিজয়' (হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান নিয়ে রচিত) প্রভৃতি পৌরাণিক নাটক লিখেছিলেন, এবং তাঁর রচিত 'সুনীতি-সন্তাপ-নাটক' (ইং ১৮৬৮) ও 'কেরলী-কুসুম' ('স্বপ্নধন' ?) প্রভৃতি নাটকেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। দেখা যাচ্ছে 'নাটুকে রামনারায়ণ' বাঙলা নাটকের প্রধান প্রধান সব ধারাতেই কিছু-না-কিছু প্রস্তুতির কাজ করেছেন। যেমন, অনুবাদের ধারায়, যথাযথ অনুবাদ না হোক, সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ করেছেন ; পৌরাণিক নাটকের ধারায়ও ('ভদ্রার্জুন' থেকে 'শর্মিষ্ঠা-পদ্মাবতী' ছাড়িয়ে আধুনিক কাল পর্যন্ত এ ধারা বিস্তৃত) প্রসারে সহায়তা করেছেন। আর, সামাজিক নাটকের তো তিনি প্রায় প্রথম প্রবর্তক,—উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবা-বিবাহ' প্রভৃতি নাটকের (ইং ১৮৫৬) 'কুলীন কুল-সর্বস্বই' হয় আদর্শ-স্থানীয়। প্রহসন রচনায়ও তিনি অগ্রসর হন আর সমাজ-সংস্কার ও এই প্রহসন-ধারাতেই 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' জন্মেছিল। কিন্তু মধুসূদনের প্রহসন যথার্থই নাটক ; আর শুধু নাটক নয়, সাহিত্য ; কারণ, তা স্রষ্টার সৃষ্টি। রামনারায়ণের কীর্তি অন্য জাতীয় ; তিনি সংস্কৃতে কবি ছিলেন, সুবক্তা ছিলেন, পণ্ডিত ছিলেন, বিদ্যা দান করেছেন। কিন্তু তিনি সাহিত্য-স্রষ্টা নন—একথা মানতে হবে।

রামনারায়ণের সাধারণ পরিচয় 'কুলীন কুল-সর্বস্ব' দিয়ে, কিন্তু তা তাঁর প্রধান কৃতিত্ব নয়। কারণ, তা তাঁর প্রথম লেখা না হলেও প্রথম নাটক। দোষে গুণে মিলে তা এখনো সে হিসাবেই গ্রাহ্য। এ নাটকের দোষ তাঁর পরেকার অন্য নাটকেও রয়েছে ; যা গুণ তা পরে কিছু বৃদ্ধি পেয়েছে।

'কুলীনকুল-সর্বস্বে'র উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু নাম থেকেই পরিষ্কার। কথাবস্তু লেখকের নিজের লিখিত 'বিজ্ঞাপনে' সংক্ষেপে এরূপে বর্ণিত হয়েছে :

"এই নাটক ষড়্ভাগে বিভক্ত। প্রথমে কুলপালক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যাগণের বিবাহানুষ্ঠান। দ্বিতীয়ে, ঘটকের কপট ব্যবহারসূচক রহস্যজনক নানা প্রস্তাব। তৃতীয়ে, কুলকামিনীগণের আচার ব্যবহার। চতুর্থে, দোষোদ্‌ঘোষণ। পঞ্চমে, নানা রহস্য ও বিরহি পঞ্চাননের বিয়োগ পরিবেদন। ষষ্ঠে, বিবাহ নির্বাহ ও গ্রন্থসমাপ্তি।"

এর থেকে অবশ্য কথাবস্তু বোঝা যায় না, কোন্ ভাগে কী বর্ণনা রাম-নারায়ণের উদ্দেশ্য, তা বোঝা যায়। নাটক অনুসরণ করলে আমরা দেখি মূল কাহিনীটা এই: কুলপালক বন্দ্যোপাধ্যায় (নামগুলি লক্ষণীয়) পরম কুলীন, চারটি অবিবাহিত কন্যা তাঁর ঘরে। তাদের বয়স ৩২, ২৬, ১৪, ৮ অর্থাৎ বালিকা থেকে প্রায় বিগতযৌবনা চার ভগ্নী। কুলপালকের দুশ্চিন্তার শেষ নেই। ঘটক অনৃতাচার্যের কথায় এক দিনের মধ্যে বিবাহ স্থির করে তিনি চার কন্যাকেই এক বৃদ্ধ, ষাট বৎসর বয়স্ক পাত্রের হাতে সমর্পণ করতে গেলেন। গৃহিণী বিবাহের আয়োজন করতে লাগলেন। বিবাহের কথা বলতে নানা বয়সের এই কন্যাদের মনে এলো নানা ভাবনা ;—জ্যেষ্ঠা সবিষাদে বলছেন, 'বৃদ্ধ-বয়সে (৩২ বৎসর) আর এই বিড়ম্বনা কেন ?' দ্বিতীয়ার (২৬ বৎসর) কথাটা বিশ্বাসই হয় না, 'আমরা কুলীন কন্যা, আমাদের আবার বিবাহ কি ?' যখন প্রস্তাব সত্য মনে হল, তখন তিনি বলছেন, 'হউক না, দেখা যাউক।' তৃতীয়ার মনে কিন্তু কিশোরীর চাঞ্চল্য, এ বয়সে (১৪ বৎসর) কুলীনের মেয়ের এমন সৌভাগ্য ! তবু 'না হওয়া পর্যন্ত আর আশা কি ?' কনিষ্ঠা (৮ বৎসরের বালিকা), পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে বাইরে খেলছিল ; শুনে বুঝতেই পারে না বিয়ে কি। আবার মা যখন তাকে বললেন তাদের চার বোনেরই বিবাহ হচ্ছে, সে তখন স্বাভাবিক ভাবেই বলে, 'ওমা ! তবে তোর হবে না ?' বর এসেছে শুনে এই তৃতীয়া আর কনিষ্ঠা বর দেখতে ছুটে বেরিয়ে গেল। সেই আশ্চর্য সুপাত্রকে তারা দেখল, অন্য দু বোনও তার কথা শুনল। কিন্তু ইচ্ছা থাকলেও পিতার নিকট আপত্তি জানাতে পারল না। কুলীনের মেয়ের ভাগ্য তো এরূপই। বিবাহসভায় দেখা গেল বর শুধু বৃদ্ধ নয়, কদাকার, কাণা, বধির। তবু বিবাহ হয়ে গেল। এই হল মূল কাহিনী ; কিন্তু এ কাহিনীর সঙ্গে সংস্রব নেই এমন বহু দৃশ্য ও বিষয় এনে রামনারায়ণ কৌলীন্যের কলঙ্ক আরও প্রচার করতে চেয়েছেন। সে সব দৃশ্যে নানা অবান্তর প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন, মতামত জাহির করেছেন, ভাঁড়ামি, বক্তৃতা আর পয়ারে-ত্রিপদীতে বর্ণনা কিছুই বাদ দেন নি। পারেন নি কেবল একটি কাজ—নাটক নির্মাণ করতে। না হলে ওই কুলপালকের কন্যাদানের কাহিনী উপলক্ষ্য করে—আশ্রয় করে নয়—নানা দৃশ্যে একটা কৌলীন্য-কলঙ্ক প্রচারী প্রবন্ধ তৈরী করেছেন, তাতে চার বোনের ভাগ্য ছাড়াও আছে স্বামীর সঙ্গে মিলনবঞ্চিতা ফুলকুমারীর

কথা, আর সত্যই তা মনে দাগ কাটে। মাত্র একটি দিনের ব্যর্থতার কথাই ফুলকুমারী তার ঠানদিদির অনুরোধে তাঁকে বলছেন। ফুলকুমারীর জীবনে এক রাত্রির মত মিলনের সম্ভাবনা এসেছিল পিতৃগৃহে স্বামীর অপ্রত্যাশিত আগমনে। কিন্তু পিতা স্বামীর 'খাঁই' সম্পূর্ণ পূরণ করতে পারলেন না। —অভাগিনী নিজের শেষ পয়সা দিয়েও এক রাত্রির মতও সেই স্বামীটিকে নিজের ঘরে পেলেন না। পয়সা দিয়ে স্বামী বাইরের ঘরে পিতার টোলের মেঝেয় দরমা পেতে ঘুমিয়ে রাত কাটাল। এ কাহিনী শুনতে শুনতে বিধবা প্রবীণা ঠানদিদি বলছেন,

"নাতনি! আর বলিস্‌নে, বলিস্‌নে, বুক ফেটে যায়। (সজল নয়নে) হারে বল্লাল, তুই কাল হয়ে এসেছিলি। কে তোকে কুলের ছিষ্টি কত্তো বলেছিল? কুল ত নয়—এ কুলের আঁটি বড় কঠিন। যার কুল আছে তার কি দয়া নেই? আহা! আহা! কি দুঃখু. তুই আর কাঁদিস্‌নে।" ইত্যাদি।

ঠানদিদি প্রবোধ দিতে চাইলেন—

তোত্তো আছে, আমার যে নাই, তা কি কর্কো।

ফুল। (চক্ষুর জল মুছিয়া)

ঠানদিদি! এ থাকাচ্চেয়ে না থাকা ভাল। না থাকলে মনকে প্রবোধ দেওয়া যায়, এ থেকে নেই, একি সামান্য দুঃখু! ঐ যে কথায় বলে, দুষ্টু গরু থাকাচ্চেয়ে শূন্যি গো'ল ভাল।

সুমতির প্রসঙ্গও এরূপই। নাটকের পক্ষে এ সব প্রসঙ্গ নিষ্প্রয়োজন হলেও দর্শকের পক্ষে নিরর্থক নয়। কিন্তু তৃতীয় অঙ্কে দেবল ও রসিকার প্রসঙ্গ, চতুর্থ অঙ্কে মহিলা ও মাধুরীর কথোপকথন শুধু অবান্তর নয়, রুচিবিগর্হিত ও অগ্রাহ্য। তবে এ বিষয়ে ভুল নেই যে, রুচিহীন হোক, যাই হোক,—প্লট থাক, না থাক, যথার্থ চরিত্রচিত্র না থাক,—যাই হোক—এ সব রঙ্গ-ব্যঙ্গ, ভাঁড়ামির নানা দৃশ্য সে দিনের নানা শ্রেণীর দর্শককে আমোদ দিয়েছে; আর নাটকের মূলগত সদুদ্দেশ্য সজ্জনদেরও মনঃপূত হয়েছে। কারণ, 'কুলীন কুল-সর্বস্ব' সেদিনে 'সাক্‌সেস' হয়েছিল, সংস্কৃতগন্ধী বক্তৃতাগুলিও সে পক্ষে তখন বাধা হয় নি। এমন কি, রামনারায়ণের জীবিতকালে এ নাটকের পাঁচটি সংস্করণ হয়।

রামনারায়ণ সফল নাট্যকার বলেই তখনকার সকল নাট্য-পোষক তাঁকে দিয়ে অত নাটক লিখিয়েছেন। এ সব নাটকের মধ্যে 'বেণী সংহার' ও 'রত্না-বলী' অনুবাদ—দীনবন্ধু-মধুসূদনের আবির্ভাবের পূর্বে রচিত ও অভিনীত।

তারপরেও যে সব নাটক লিখিত হয় তার মধ্যে 'নব-নাটকে'র, 'রুক্মিণী হরণে'র ও 'যেমন কর্ম তেমন ফল' নামক প্রহসনের নাম করা চলে। কিন্তু 'রুক্মিণী হরণ' প্রভৃতি পৌরাণিক নাটক অপেক্ষা 'নব-নাটক'ই নাট্যকারের পরিচয় বেশী দেয়। 'নব-নাটক' (ইং ১৮৬৬) বহুবিবাহ-বিষয়ক নাটক, কুপ্রথা নিবারণের জন্ত সদুপদেশ সূত্রে নিবদ্ধ। নাটকের কাহিনীটি এই : গ্রাম্য জমিদার গবেশের (এখানেও নামগুলি লক্ষণীয়) স্ত্রী সাবিত্রী জীবিত আছে। তার ষোল বৎসরের পুত্রও আছে—সুবোধ। তবু মোসাহেব পারিষদের কথায় গবেশ দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করলেন। এই দ্বিতীয়া স্ত্রী চন্দ্রলেখার পীড়নে লাঞ্ছনায় গবেশ ভীত-সন্ত্রস্ত; প্রথমা স্ত্রী সাবিত্রী গৃহ থেকে প্রায় বহিষ্কৃতা। পুত্র সুবোধও গৃহত্যাগ করে গেল। তাতেও চন্দ্রলেখার তৃপ্তি হল না। মিথ্যা করে সে সুবোধের মৃত্যু-সংবাদ সাবিত্রীকে দিলে, সাবিত্রী পুত্রশোকে আত্মহত্যা করলেন। তাই দুর্বলচিত্ত গবেশেরও মৃত্যু ছাড়া পথ রইল না—সুবোধ দেশে ফিরে এসব শুনে মূর্ছিত (ও প্রাণহীন ?) হল। এই মামুলী কাহিনী ছয় প্রস্তাবে, ও সংস্কৃত নাটকের মত বহু 'গর্ভাঙ্কে' বিবৃত হয়েছে। নট-নটী, সূত্রধার, প্রস্তাবনাও আছে। আর, কাহিনীটিকে উপলক্ষ্য করে নানা দৃশ্যের অবতারণায় এ নাটকও ভার-গ্রস্ত, তবে একেবারে দৃশ্য-সমষ্টি মাত্র নয়। এখানে রঙ্গরস আছে, তা ছাড়া কোনো কোনো দৃশ্য বিষয়গুণেও পাঠ্য। তৃতীয় অঙ্কে আলাপ-আলোচনায় ইংরেজি শব্দের প্রয়োগ, বাঙলা ভাষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে নাগরের সঙ্গে গ্রাম্যের যে আলোচনা আছে, সে আলোচনা এই এক শত বৎসর পরেও বাঙলা দেশে একটা জীবন্ত বিষয় (পরে উদ্ধৃতাংশ দ্রষ্টব্য)। এ আলোচনার মূল অবশ্য রামনারায়ণের ইং ১৮৫৩-এ হিন্দু মেট্রোপলিটান বিদ্যালয়ের ছাত্রদের নিকট প্রদত্ত (ও প্রকাশিত) প্রকাশ্য বক্তৃতা (দ্রষ্টব্য—সাঃ সাঃ চরিতমালা, ১ম, রামনারায়ণ, পৃঃ ১৯ থেকে)। যুক্তি ও কার্যকারিতার দিক থেকে তা এখনো সমান খাটে। এ নাটকে আর একটি সরস গল্প তিনি জুড়েছেন—দীনবন্ধুর 'জামাই বারিকে'র চোরকে স্বামী বলে ধরে দুই স্ত্রীর সমানে প্রহারের গল্প এখানে পাওয়া যায়। কৌতুক ও রসময়ী গোয়ালিনীর রসিকতা আর রসময়ীর বশীকরণের তন্ত্র-মন্ত্র, চন্দ্রলেখার সখীদের সপত্নী-নির্যাতনের কথা প্রভৃতি রঙ্গ-তামাসার বিষয়—দর্শকদের নিকট আকর্ষণীয় ছিল। আর সুধীর ও

দন্তাচার্যদের কলহ কিংবা নাগর ও গ্রাম্যের আলোচনার সদুপদেশও ছিল। এমন কি, প্রকৃত চরিত্র-চিত্র না থাকলেও পাড়াগেঁয়ে জমিদার, গ্রাম্য-ঘোঁটের দলপতি এ সবের 'বাঁধা-ধরা' বা টাইপ চরিত্র-চিত্রও আছে। অবশ্য দীনবন্ধু-মধুসূদনের আবির্ভাবের পরে এই নাটক লেখা।—তাঁদের দৃষ্টি বা শক্তি রামনারায়ণের নেই। তাঁর উন্নতি সামান্যই হয়েছে—ভাষায় ছাড়া। 'কুলীন কুলসর্বস্বে' দেখা গিয়েছিল ঘরের কথাকে ঘরের ভাষায় তিনি লিখতে পারেন, পূর্বোক্ত ক্ষুদ্র অংশটুকুও তার প্রমাণ—১৮৫৪তে এরূপ ঘরোয়া বাঙলা গদ্য লেখা প্রশংসার কথা। এমন কি দেখছি slangএও তাঁর দখল আছে—আর নাটকে স্থলবিশেষে slang নিশ্চয়ই প্রয়োজনীয়। নাটক বলেই বোধ হয় রামনারায়ণও কথিত চালের বাঙলা গদ্য লিখেছেন, না হলে সাধু চালেই লিখতেন। ক্রমেই দেখছি নাটকে তাঁর পদ্যপ্রয়োগ কমেছে, কথার ভাষা আরও সরল হয়েছে। সেদিনে এই কথিত ও সাধুচালের মধ্যে মাত্রাবোধ দুর্লভ ছিল। মাইকেল-দীনবন্ধুতেও সেরূপ ত্রুটি পাওয়া যায়। রামনারায়ণের চলিত ভাষাও স্ত্রী-চরিত্রের মুখে মাঝে মাঝে আরও খেলো হয়ে উঠেছে। তবু একথা বলা ঠিক, রামনারায়ণ তর্করত্ন কথ্য বাঙলার ইতিহাসে একজন পথ-প্রদর্শক। নব নাটকের এই আলোচনাটুকুই দৃষ্টান্ত হিসাবে নেওয়া যাক; 'নাগর' বলছেন:

"আমরা তো বহুরূপী হরবোলার জাত, যা দেখি তাই শিখি। দেখ যখন হিন্দু রাজা ছিল, তখন সেই ব্যবহারই করেচি, সংস্কৃত বলতেম, কুশাসনে বসতেম, ধুতি চাদর পরতেম, পরে যবনদের অধিকারে কার্শিতে অনুরক্ত হয়েছিলেম, গদি, তাকিরে, মশলন্দ, আলবলা, গুড়গুড়ি এ সকল ব্যবহার, স্ত্রীলোকদের গৃহমধ্যে রুদ্ধ করে রাখা, তদবধিই তো আমাদের চলো আসচে, এখন আবার ইংরেজের অধিকার, এখন চ্যার, চুরোট, চামচে কেন না চলবে? ইংরেজী ভাষার প্রতি শ্রদ্ধাই বা কেন না হবে? আরো একটা কথা বলি বিবেচনা করো—ভাষান্তরের সঙ্গে যোগ না হলে ভাষা বৃদ্ধিও পায় না।"

নাট্যকলার দিক হতে দেখলে মনে হবে রামনারায়ণ তর্করত্নের দোষ অশেষ; আর সেদিনের নাট্যজগতের অবস্থা মনে রাখলে দেখব গুণও অনেক। দোষ হিসাবে দেখলে দেখব—রামনারায়ণ নাটক-গ্রন্থনের রহস্য বুঝতেন না। প্লট নয়, কতকগুলি দৃশ্যসমষ্টি জড়ো করে তিনি বক্তব্য বিবৃত করতেন; অনেক দৃশ্য আবার অবান্তর। কোন কোন দৃশ্য ছিল রঙ্গচিত্র—নানা শ্রেণীর

লোকের উপযোগী সাধারণ হাস্যামোদ, তামাসার উপকরণ—লেবেদেভ্ কেন, ভারতচন্দ্রের সময় থেকেই তাতে লোকের রুচি ছিল। দ্বিতীয়ত, চরিত্রসৃষ্টির কৌশলও তাঁর অজ্ঞাত ছিল। বিশেষ টাইপের হাস্যপ্রধান সাধারণ মানুষের চরিত্র তিনি কতকটা সৃষ্টি করতে পারতেন; সাধারণ জীবনের সঙ্গে সে পরিচয় তাঁর ছিল। কিন্তু প্রধান চরিত্র সৃষ্টিতে তিনি আর থেই পেতেন না। বিশেষ করে, ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে মানুষের চরিত্র নানারূপে বিকাশের যে নীতি আধুনিক সাহিত্যে প্রায় একটা স্বতঃস্বীকৃত কথা, তা রামনারায়ণের ধারণায় আসত না। আমাদের দেশের অনেক সাহিত্যস্রষ্টার নিকটও তা তখন পরিষ্কার ছিল না। অনৃতাচার্য, নাগর, গ্রাম্য, দম্ভাচার্য, গবেশ, পাপপুরুষ প্রভৃতি চরিত্রের নামকরণ থেকেই বোঝা যায় এরা মানুষ নয়, বিশেষ দোষগুণের প্রতীকস্বরূপ। এসব নাম থেকেও বুঝতে পারি—লেখকের মাথায় উদ্দেশ্যের ভার চেপে আছে। তাই, রামনারায়ণের নাটকে প্রচার শুধু লক্ষ্যই নয়, প্রচারই প্রধান কথা। বিশেষ করে তা সত্য যেখানে সামাজিক নাটক তিনি রচনা করেছেন। অবশ্য সেদিনের শিক্ষিত নাট্যামোদীরা তাতে সম্ভবত বিরক্ত হতেন না। তাঁরা চাইছিলেন সমাজ-সংস্কার—নাট্যরসের ঘাটতি তাই প্রচার দিয়ে মেটালে তাঁদের আপত্তি হত না। সাহিত্য যে প্রচার নয়—প্রকাশ,—এ সত্য অনেক যুগের লেখক ও পাঠক বা দর্শকই মনে রাখতে পারেন না। কিন্তু এ ত্রুটির সঙ্গে রামনারায়ণের নাটকে এসে জুটেছে দীর্ঘচ্ছন্দী বক্তৃতা, হা-হুতাশ, ভাবাকুলতা; সংস্কৃত নাটকের ও বাঙলা যাত্রার যত মামুলী ত্রুটি ও কৃত্রিমতা। সঙ্গে সঙ্গে ভাষায়ও এসেছে অস্বাভাবিকতা। পয়ার, ত্রিপদীর কৃতিত্বে তখনো লোক-রঞ্জন চলে, ঈশ্বরগুপ্তের পাঠকদলের কানে অনুপ্রাসের অট্টহাস্য এত হাস্যকর ঠেক্‌তো না। রামনারায়ণেরও ভাষায় এ ত্রুটি রয়েছে। বিশেষ করে তাঁর স্থূল ভাঁড়ামি রঙ্গব্যঙ্গের সঙ্গে জুটেছে খেলো অমার্জিত চলতি ভাষা। অথচ নাট্য-গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখবার ঝোঁকে গুরু-গম্ভীর সংস্কৃত কথার উপল বর্ষণেও তাঁর ক্লান্তি নেই। ক্লান্তি পাঠকের। কিন্তু স্বীকার করতে হবে সে ক্লান্তির কারণ—রামনারায়ণ একা নন, তাঁর যুগ, সে যুগের অপরিপুষ্ট সাহিত্য-শক্তি, অপরিণত নাটক-বোধ, অগঠিত বাঙলা ভাষা, বিশেষ করে আবার নাটকের অনিশ্চিত ভাষা। না হলে রামনারায়ণও ইংরেজি নাটকের 'অতুলন রস মাধুরী'তে মুগ্ধ ছিলেন. তবু—শুধু

তিনি কেন,—মাইকেল-দীনবন্ধুও সংস্কৃত নাটকের প্রভাব সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে পারেন নি, নাট্যরসের সৃষ্টিতে নিজেদের আদর্শানুরূপ কীর্তি অর্জনে সমর্থ হন নি। বাঙালী স্বভাবের অন্তর্নিহিত ত্রুটিতে তাঁরাও একেত্রে খর্বিত। নাটকের ভাষায় ও ভাবেও তাঁরা সেই স্বাভাবিকতা ও স্বচ্ছতা আনয়ন করতে পারেন নি, যা না আনতে পারলে নাটক সার্থক হতে পারে না। মাইকেল-দীনবন্ধুর সঙ্গে রামনারায়ণ তুলনীয় নন, কিন্তু তবু তাঁর গুণের কথা এই—তিনি সেদিনের নানা শ্রেণীর লোককে তৃপ্ত করবার মত নানারূপ দৃশ্য জুগিয়েছিলেন।—শিক্ষিতদের তাতে সমাজ-সংস্কারের ঝোঁক কতকটা মিটেছে। বাবুযুগের 'রসিকেরা' ভারতচন্দ্রের অনুকৃত পদ্য, অলঙ্কারভরা গদ্য ও অসমীচীন দৃশ্য পেয়ে তৃপ্ত হয়েছেন। আর ইতর সাধারণ লেবেদেভের যুগেও চাইত ভাঁড়ামি 'তামাসা', তারাও স্থূল ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ প্রভৃতির দৃশ্যে আমোদ লাভ করেছে। রামনারায়ণের কৃপায় নাটকের অভিনয় তাই সর্বসাধারণের নিকট আকর্ষণীয় হয়। তৃতীয় গুণ এই যে, রামনারায়ণ সত্যই পূর্ববর্তীদের অপেক্ষা বেশি সরল ভাষায় লিখেছেন। অবশ্য তখনো সংলাপের বাঙলা গদ্য তৈরী হয়ে ওঠে নি, ভাষা অপরিপুষ্ট। 'প্রস্তুতির পর্বে' এতখানি ভাষার উপর অধিকার আর কোন নাট্যকার অর্জন করতে পারেন নি। অবশ্য 'টেকচাঁদ' তখনি প্রকাশিত হচ্ছেন, আর 'হুতোম'ও 'নব-নাটকে'র কালে দেখা দিচ্ছে, তাও স্মরণীয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পদ্যের পথ-পরিবর্তন

আধুনিক কালে গদ্যকে বাঙালী সাহিত্যের এক প্রধান বাহনরূপে প্রস্তুত করছিল। পদ্যও তখন অনেক দুর্বহ দায়িত্ব থেকে মুক্তি লাভ করে ক্রমশঃ কাব্যরসের আধার হয়ে উঠতে লাগল। আজকালকার ভাষায় আমরা বলতে পারি—'পদ্য' তখন থেকে হয়ে উঠতে লাগল 'কবিতা'—আখ্যান হলেও যা সুর করে পড়া হয় না, 'পদ' হলেও যা গীত হবে না ; এবং আপনার রস-সম্পদে যা মানব-চেতনার এক বিশিষ্ট প্রকাশ।

পদ্যের এই পথ-পরিবর্তনেরও প্রধানতম কারণ অবশ্য আধুনিক জগতের সঙ্গে বাঙালীর পরিচয়, আধুনিক পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে তার দীক্ষা। ইংরেজি সাহিত্য ও ইংরেজি কবিতার রসাস্বাদন করবার পর উনবিংশ শতকের বাঙালীর পক্ষে আর পূর্ব যুগের ভাব-জগতে আবদ্ধ থাকা স্বাভাবিক নয়, এবং পূর্বদিনের পদ্যসাহিত্যেও নিবদ্ধ থাকা অসম্ভব। উনবিংশ শতক থেকে বাঙলা কবিতার প্রধান উৎসস্থল তাই ইংরেজি কবিতা ও ইংরেজি সাহিত্য, এবং ইংরেজি ভাষার মারফৎ পাওয়া অন্যান্য পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য,—অবশ্য সকল কবিতারই মূল উৎস আসলে জগৎ ও জীবন-বোধ। খ্রীঃ ১৮১৭-এর পরে আধুনিক জগতের সঙ্গে যতই বাঙালীর পরিচয় বৃদ্ধি পেল ততই বাঙলা পদ্যেরও পথ-পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে উঠল। বিশেষ করে তা অনিবার্য হয়ে উঠল এইজন্য যে ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদের পরে বাঙলা দেশে পদ্য-রচনার ক্ষেত্রে আর কোনো স্রষ্টার আবির্ভাব হল না। বাঙলা পদ্য পূর্বেই একটা পথের শেষে এসে গিয়েছিল। নতুন পথ না পেতে তার পক্ষে অনুবৃত্তি ও পদচারণা করা ছাড়া আর কিছু করবার ছিল না। ইং ১৮০০-এর পূর্ব পর্যন্ত এভাবেই যায় (দ্রষ্টব্য : বাঃ সাঃ রূপরেখা, পূর্বখণ্ড, ১১শ পরিচ্ছেদ)। তারপরেই যে নতুন পথ খুলে গেল, এমন নয়। ইং ১৮১৭ অব্দে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠায় সে সম্ভাবনা দেখা দিল ; কারণ ইংরেজ শাসকদের ছাড়িয়ে ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটল শিক্ষিতদের। কিন্তু হিন্দু কলেজের

প্রথম যুগের ছাত্ররা বাঙলা সাহিত্য সৃষ্টিতে উৎসাহ বোধ করেন নি। সেই নূতন জগতের ভাবৈশ্বর্য বাঙলা পদ্যের জীর্ণ ও সংকীর্ণ খাতে বইয়ে আনবেন, এমন শক্তিমান্ স্রষ্টাও তাঁদের মধ্যে তখন কেউ জন্মান নি। ভারতচন্দ্রের প্রায় সত্তর বৎসর পরে প্রথম কৃতী কবি ঈশ্বর গুপ্ত। মাঝখানকার সুদীর্ঘ কালটা বাঙলা পদ্য-সাহিত্যের নিষ্ফলা ভূমি। গুপ্তকবিও কবিতার পথে পদার্পণ করতে পারেন নি, পদ্যের পুরাতন পথ থেকেই নূতন দিকে যাত্রার পথ খুঁজছিলেন। তবে পদ্য-রচনায় তিনি উৎসাহ সৃষ্টি করেন। তারপরে এলেন রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। ঈশ্বর গুপ্তের শিক্ষা ও ইংরেজি কাব্যের দীক্ষা দুইই তাঁর ঘটেছিল; কবিতার পথের সন্ধান তিনি লাভ করলেন। তিনি শিক্ষিত সাহিত্যানুরাগী, কিন্তু প্রতিভা তাঁর ছিল না। কাব্যের নূতন পথে যাত্রা তাঁর সাধ্য হয় নি। তাই বাঙলা কবিতার জন্মান্তর হল ইং ১৮৬০-এর সময়ে মাইকেলের আবির্ভাবের সঙ্গে। তার পূর্ব পর্যন্ত কালটা কবিতারও প্রস্তুতির কাল। প্রশ্ন থেকে যায়—ঈশ্বর গুপ্ত ও রঙ্গলাল সত্যিই কি মাইকেলের প্রতিভার জন্য পথ-প্রস্তুতি করতে পেরেছিলেন? না, ভারতচন্দ্র থেকে মাইকেল, এই একশত বৎসরের অচল পথের মাঝখানে কাব্যে শুধু একটু উৎসাহ ও আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে সচলতা আনয়ন করেছিলেন?

॥ ১ ॥ পুরাতনের অনুবৃত্তি

অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধের জের টেনে উনিশ শতকের প্রথমার্ধেও বহুল পরিমাণে পুরাতনের অনুবর্তন চলে পদ্যে আখ্যানও তখন রচিত হচ্ছিল; আর পদ, গীত প্রভৃতিও রচিত হচ্ছিল। এসব অনেক লেখা আজ সম্পূর্ণ বিস্মৃত। যা বিস্মৃত নয় তাও সাহিত্য হিসাবে প্রায়ই মূল্যহীন। বিশেষ কোনো গুণে বা ঘটনা-যোগে টিকে আছে।

(ক) **জয়নারায়ণ ঘোষাল:** ভূ-কৈলাশের রাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল (ইং ১৭৫১-ইং ১৮২১) একাধিক কারণে স্মরণীয় পুরুষ। নবাবী সরকারে ও কোম্পানির কর্মে, দু'দিকেই তিনি ভাগ্যার্জন করে দিল্লীর বাদশাহের থেকে খেতাব পান 'মহারাজা বাহাদুর'। রামমোহনের পূর্বে তাঁর মধ্যে চিন্তার একটু নতুনত্ব দেখা যায়। শেষ জীবনে তিনি কাশীবাসী হন, আর সেখানে তাঁর

কীর্তিতে বাঙালীর নাম উজ্জ্বল। ইং ১৮১৮ অব্দে তিনি বারাণসীতে এক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তা উত্তরাপথে এ যুগের ভারতবাসী প্রতিষ্ঠিত প্রথম স্কুল; কলিকাতার হিন্দু কলেজের মাত্র এক বৎসর পরে তা স্থাপিত। বাঙলা সাহিত্যে অবশ্য তাঁর নাম দু'খানি গ্রন্থের জন্য (দ্রঃ ১ম খণ্ড)। 'কাশীখণ্ডের' অনুবাদ (ইং ১৭৯২তে আরম্ভ হয়) অনেকের সাহায্যে শেষ হয়। জয়নারায়ণ এ বইয়ের শেষাংশে কাশীর বিবরণ লেখেন—('কাশী পরিক্রমা'; ব. সা. পরিষৎ প্রকাশিত করেছিলেন)। তাতে কবিত্ব কিছু নেই—কাশীর বিবরণ দানে কাশীর সাধু সম্প্রদায়, বিভিন্ন দেশবাসী, মন্দির ও বস্ত্র, অলঙ্কার শিল্প বিষয়ে তিনি স্বাভাবিক ঔৎসুক্যের পরিচয় রেখে গিয়েছেন। বাস্তবজীবনের সাধারণ জিনিসের প্রতি এই কৌতূহলপূর্ণ আগ্রহ, ঐহিকের প্রতি এই মমতা, এটি নবযুগের একটা লক্ষণ; কবি ঈশ্বর গুপ্তের মধ্যে কলা-কৌশলেও তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অবশ্য জয়নারায়ণ ঘোষালের নিজস্ব রূপ দেখা যায় তাঁর 'করুণানিধান বিলাসে' (দ্রঃ রূপরেখা, ১ম খণ্ড)। ইং ১৮১৩ থেকে ইং ১৮১৫ অব্দে তা রচিত। কাশীতে তিনি যে বিগ্রহ স্থাপন করেন তাঁরই মাহাত্ম্য-বর্ণনার জন্য তা রচিত। মূলত এখানি কৃষ্ণলীলারই গ্রন্থ। কিন্তু একদিকে কোজাগর, মনসাপূজা, চড়ক প্রভৃতি বাঙলার সব দেব-দেবীর পূজাই তার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অন্যদিকে লামা, নানক, কর্তাভজা, যীশুখ্রীষ্ট থেকে ভূগোল, জ্যোতিষ প্রভৃতির কথা কৃষ্ণের মুখে লেখক জুগিয়েছেন। নিশ্চয়ই সমকালীন অবস্থা ও ঘটনা সম্বন্ধে এ গ্রন্থেও বাঙালীর নবজাগ্রত ঔৎসুক্যের পরিচয় পাই—তার পূর্বেই 'দেবী সিংহের অত্যাচার', 'ছয় আনির গান' প্রভৃতিও রচিত হয়েছিল। কিন্তু 'করুণানিধান বিলাসে'র গুরুত্ব আরও বেশী। রামমোহন রায় নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনার সঙ্গে একটা উদার ধর্মদৃষ্টির পরিচয় দেন বলে আমরা জানি। জয়নারায়ণ ঘোষাল ছিলেন সাকারোপাসক—যেমন ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। কিন্তু জয়নারায়ণ যে উদার ধর্ম-সমন্বয়ের আভাস রেখে গিয়েছেন, তা থেকে মনে হয়, এ সমন্বয়বোধ বাঙালী শিক্ষিত ভদ্র মনের একটা সহজ ধর্ম।

(খ) **অনুবাদের ধারা:** পৌরাণিক অনুবাদের মধ্যে (দ্রঃ—বাঃ সাঃ রূপরেখা, ১ম খণ্ড, ১১শ অধ্যায়) রঘুনাথ গোস্বামীর উল্লেখ করা হয়। রামায়ণ ও ভাগবত অবলম্বন করে তিনি দু'খানি বড় আখ্যান কাব্য লেখেন, কিন্তু তা আসলে অনুবাদ নয়। গ্রন্থ লেখা হয়েছিল উনবিংশ শতকের দ্বিতীয় পাদে;

যখন ঈশ্বর গুপ্তের যুগ ও নতুন কাব্যাদর্শের ধারণা জন্মলাভ করছে। কবিত্ব না থাক আখ্যান বলার শক্তি এ লেখকের ছিল। কিন্তু সেকালের রীতিতে পদ্যের নানা কৃতিত্ব দেখাতেই তিনি ব্যস্ত।

অনুবাদ বা মূলাশ্রয়ী সংকলন ব্যাপারে বৈষ্ণব লেখকেরা অক্লান্ত ভাবে রচনা করে গিয়েছেন—এই বিংশ শতকের মধ্যভাগেও তাঁদের এ ধরনের চেষ্টা বন্ধ হয় নি। কিন্তু সাহিত্যে নতুন কিছু না জোগালে নবযুগে সে সব অনুবাদের উল্লেখ আর নিষ্প্রয়োজন। কারণ, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে সাহিত্য-বোধের তৃপ্তির জন্ত বাঙালী আর ওরূপ পদ্য অনুবাদ বা মর্ম-পরিবেশনের মুখ চেয়ে থাকে না। তবে ইংরেজি বা অন্য ভাষা থেকে এরূপ অনুবাদ হতে পারে যাতে সাহিত্যবোধ তৃপ্ত হয় না বটে, কিন্তু আধুনিক যুগের সাহিত্য সম্বন্ধে ধারণা জন্মে (যেমন, ল্যাম্বস্ টেল্স্ ফ্রম শেক্স্পীয়রে, কালিদাসের অনুবাদে); কিংবা জীবন-চেতনা পরিচ্ছন্ন হয় (যেমন, শেক্সপীয়রের নাটক, বা আরব্যরজনী, বা পল অ্যাণ্ড ভার্জিনিয়া প্রভৃতির অনুবাদ), জ্ঞানের (ইতিহাসের, বিজ্ঞানের, দর্শনের অনুবাদ) পরিসর বাড়ে। সাহিত্যের ইতিহাসে প্রস্তুতির পর্বে সে সব অনুবাদ কিছুটা উল্লেখযোগ্য—কিন্তু কাব্য-সাহিত্যে তার গুরুত্ব আরও কম। কারণ, গদ্যই অনুবাদের প্রকৃত বাহন; পদ্যের কাছে কাব্যরস আমরা চাই, শুধু অনুবাদ হলেই হয় না।

(গ) রোমান্টিক আখ্যানের ধারা : প্রণয়মূলক আখ্যান-কাব্যের ধারা ভারতচন্দ্রের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেও এক ধরনের রস পরিবেশন করতে চেয়েছে—অদ্ভুত ঘটনা, অপ্রত্যাশিত ব্যাপার (এমন কি, অলৌকিক ব্যাপার) ও দুঃসাহসিক এবং বীরত্বমূলক কর্ম—এসব নিয়ে তা রচিত হত। 'নভেল' বা 'উপন্যাসে'র জন্মের পূর্বে এরূপ আখ্যান-কাব্য বা আখ্যান-গদ্য বহু-পুরাতন গল্প-শোনার নেশার খোরাক জোগাত। উনবিংশ শতকেও সাময়িক প্রয়োজন তা মিটিয়েছে; কিন্তু সে সব বাঙলা আখ্যান-কাব্য আজ কমই বেঁচে আছে। যা খুঁজে নিতে হয় তার মধ্যে সৈয়দ হামজার 'হাতেম তাই'র (ইং ১৮০৪) কথা আমরা জানি। কালীপ্রসাদ কবিরাজের 'চন্দ্রকান্ত' (ইং ১৮২২) গদ্যে-পদ্যে লেখা, এক সময়ে তা বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল। কালীকৃষ্ণ দাসের 'কামিনী-কুমার' (ইং ১৮৩৬) তাকেও ছাড়িয়ে যায়। এসবের প্রধান আকর্ষণ ছিল

আদিরস, আর কাঠামোটা হল পুরনো সওদাগর-রাজকন্তাদের প্রণয়-অভিযান ও প্রণয়-বিলাস। তবে নায়ক-নায়িকারা এখন প্রায়ই বাঙালী-বাঙালিনী। যেমন, 'চন্দ্রকান্তে' বীরভূমের চন্দ্রকান্ত বাণিজ্যে গেলেন গুজরাতে, আর তাঁকে উদ্ধার করতে যাত্রা করলেন তাঁর পত্নী শান্তিপুরের রতন দাসের মেয়ে তিলোত্তমা ; নানা অ্যাডভেঞ্চারের শেষে স্বামীকে নিয়ে তিনি দেশে ফিরলেন —এসব কথা শুনলেও এখন কৌতুক বোধ করতে হয়। 'কামিনীকুমারে'র কুমার বাণিজ্যে গেলেন কাশ্মীরে। কামিনী ছদ্মবেশে সেখানে গিয়ে মিলিত হলেন তাঁর সঙ্গে। পূর্ব শপথমত কুমারকে দিয়ে তামাক সাজিয়েও ছাড়লেন— বঙ্কিমচন্দ্রের 'দেবী চৌধুরাণী'র ব্রজেশ্বরের অবস্থা মনে পড়বে নিশ্চয়ই। এসব পড়েছেন তাঁরা যাঁরা জানেন বাঙালী বিদেশে বেরোয় একমাত্র ইংরেজের তল্পী-দার হলে, চাকরি পেলে ; আর বাঙালী মেয়ে ঘরের মধ্যেই লজ্জায় ভয়ে জড়সড়। এসব কাহিনীর সবই অলীক, কোনো সাহিত্যিক মূল্যও এসবের নেই।

মদনমোহন তর্কালঙ্কারের 'বাসবদত্তা' (ইং ১৮৩৬) স্বতন্ত্র কারণে এখনো উল্লেখযোগ্য। কারণ, মদনমোহন (চট্টোপাধ্যায়, ইং ১৮১৭-১৮৫৮) নানা কারণে বাঙালী সমাজে স্মরণীয়। মদনমোহন সংস্কৃত কলেজে (ইং ১৮৪২ পর্যন্ত) বিদ্যাসাগরের সহপাঠী ও বন্ধু ছিলেন। পরে সে কলেজের তিনি অধ্যাপক হন (ইং ১৮৪৬-৫০), তারপর জজ পণ্ডিত ও শেষে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট (ইং ১৮৫০) নিযুক্ত হন। ইং ১৮৫৮ সালে অকালে কলেরায় তাঁর মৃত্যু হয়। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁর সহযোগিতা বরাবর থেকে যায়—দু'জনায় একযোগে 'সংস্কৃত যন্ত্র' স্থাপন করেন। স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারে 'সর্বশুভঙ্করী' পত্রিকায় প্রথম লেখনী ধরেন বিদ্যাসাগর, মদনমোহনের প্রবন্ধ 'স্ত্রীশিক্ষা' (সাঃ সাঃ চরিতমালা, ১ম, পৃ. ৭২ দ্রষ্টব্য) দ্বিতীয় সংখ্যায় (ইং ১৮৫০) প্রকাশিত হয়। অবশ্য স্ত্রীশিক্ষায় বিষয়ে মদনমোহন আরও গৌরবের অধিকারী। বর্তমান বেথুন স্কুল স্থাপনায় (ই ১৮৪৯) তিনি শুধু উৎসাহী ছিলেন না, তাঁর দু'কন্যা ভুবনমালা ও কুন্দমালা ঐ স্কুলের (হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়ের) প্রথম দুই ছাত্রী। আর যে 'শিশু শিক্ষা' ও 'পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল বাঙালী বালক-বালিকার সুপরিচিত, তাও সেই উদ্দেশ্যেই রচিত। শিক্ষাবিস্তারে আত্মনিয়োগ করায় তাঁর কবিত্ব শক্তির যথার্থ পরিচয় তিনি আর দিতে পারেন নি। 'বাসবদত্তা'তে তাঁর

শিল্পচাতুর্যের প্রমাণ স্পষ্ট। সে বই তাঁর ১৯ বৎসর বয়সের ছাত্রজীবনের রচনা—সে বয়সে ভারতচন্দ্রের মত ছন্দোবৈচিত্র্য দেখানোর ঝোঁক থাকাই স্বাভাবিক। পূর্বেই কিছু কিছু উদ্ভট কবিতার তিনি অনুবাদ করেছিলেন। 'বাসবদত্তা অবশ্য সুবন্ধুর গদ্যকাব্য 'বাসবদত্তা'র অবিকল অনুবাদ নয়, বরং বাঙলা পদ্যে নূতন রচনা। সেই সুবন্ধুর কাব্যের 'তাৎপর্য ধার্য সংক্ষেপ করিয়া' মদনমোহন এ কাব্য লেখেন। ভারতচন্দ্রের মতই বাঙলা, সংস্কৃত নানা ছন্দের কৃতিত্ব তাতে দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু 'ললিত দীর্ঘ-ত্রিপদী'র কিংবা দীর্ঘমালঝাঁপ, দীর্ঘমাল 'ককারোটি স্তব' 'একাবলীছন্দে' শুকসারিকার ছন্দ, গজপতি ছন্দ, তোটক ছন্দ, দ্রুতগতি ছন্দ।

"হৃদি বিলসে পটুবসনা। কুচকলসে কৃতবসনা॥
কিংবা পজ্ঝটিকায় 'সম্ভোগশৃঙ্গার বর্ণনা'
খেলই নাগর নাগরী কোলে।
চুম্বই বিম্বাধর দু'-কপোলে॥

প্রভৃতি, নিতান্তই ভারতচন্দ্রের জগতের পুনরাবৃত্তি। যে নতুন জগতে সমাজ-সংস্কারক মদনমোহন নিজে প্রবেশ করলেন কাব্যে তার প্রমাণ নেই। মদন-মোহনের দোষও নেই—১৮৩৫-এ নবীন বসুর বাড়িতে 'বিদ্যাসুন্দর' নাট্যাকারে অভিনীত হচ্ছিল, গোপাল উড়ের 'বিদ্যাসুন্দর' যাত্রা আরও তার কদর বাড়িয়ে দেয়—ভারতচন্দ্রের অনুকারীদের তখনো সমাদর প্রচুর।

গাথা কাব্যের নামেও 'চন্দ্রমুখীর পুঁথি' বা 'দামিনী চরিত্রের' মত প্রণয়-বিলাসের কবিদের আজ সাহিত্যে আর জীইয়ে রাখা নিষ্প্রয়োজন। অবশ্য ময়মনসিংহ গীতিকার গাথা-সাহিত্যিকরা চিরদিন আদরণীয়।

আখ্যান-কাব্যের ধারায় বরং সমসাময়িক কাহিনীর যে ধারা 'মহারাষ্ট্র-পুরাণ' বা 'দেবীসিংহের অত্যাচারে'র (দ্র, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৪০) থেকে শুরু হয়, উল্লেখযোগ্য। তার মধ্যে একখানা নোয়াখালির 'চৌধুরীর লড়াই' সেদিনও (ইং ১৯২০ পর্যন্ত) পালা হিসাবে গাওয়া হত, আর আসরও জমত (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তা প্রকাশিত হয়েছে)। পশ্চিমবঙ্গের 'দামোদরের বন্যা' ও 'সাঁওতাল হাঙ্গামার ছড়া'ও এই বিষয়গুণেই উল্লেখযোগ্য—বাস্তবজীবনের ঘটনা ও অভিজ্ঞতা এসব কাব্যের বিষয়।

॥ ২ ॥ গীতিকাব্যের শহুরে বিবর্তন

কিন্তু এসব হচ্ছে প্রধানত গান বা ছড়া—মুখে-মুখেই প্রধানত এসব বেঁচে রয়েছে, পুঁথিতে আবদ্ধ হয়েছে সামান্যই। বাঙলা কাব্যের সম্পদ একালে সঞ্চিত হয়েছে নানারূপ সঙ্গীতে—লৌকিক গাথা ও গীতিকাব্যে, যাত্রায়, কবিগানে, পাঁচালীতে, আখড়াই, হাফ আখড়াই, টপ্পা, প্রভৃতি নাগরিক সম্পদে, আর পদাবলী ও নানা আধ্যাত্মিক গীতে (দ্রষ্টব্য ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৩৭)। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত ভাগীরথী-অঞ্চলে এসব গীতিকাব্যের যে অসামান্য প্রভাব ছিল,—বিশেষ করে কলিকাতা কমলালয়ের বাবু-বেনিয়ানের আসরে তার যে শ্রীবৃদ্ধি হয়, তা আলোচনার বিষয়। কারণ, পদ্যের এই নিষ্ফলা শতাব্দীতে দু-এক অঞ্জলি কাব্যরস এসব গীতের মধ্যে পাওয়া যায়। বিশেষ করে নিধুবাবুর মত কবির প্রণয়-কবিতায় যা পাওয়া যায় তা শুধু সে শতাব্দীর সাময়িক ফ্যাশান নয়। তার সঙ্গে গীতিপ্রবণ বাঙালী চিত্তের একটা গভীরতর যোগ আছে। আধুনিক কালের বাঙালী গীতিকাব্যেও এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায়; আর তাই এ সত্য নতুন করে আজ স্বীকৃতও হচ্ছে।

বলা বাহুল্য, যাত্রা, পাঁচালী, কবিগান, তরজা, আখড়াই, হাফ্-আখড়াই প্রভৃতি এসব গান যথার্থ লোক-গীতি নয়, মুখে মুখে চললেও সমাজের সামগ্রিক (communal) সৃষ্টি নয়। এসব ব্যক্তিবিশেষের রচনা—বিশেষ করে আবার নবোদ্ভূত শহুরে সমাজের জন্য রচনা। অবশ্য সমাজের লোক-সাধারণের প্রচলিত ধ্যান-ধারণার উপরই এসব গানের ভিত্তি; আর লোক-রঞ্জনের জন্যই তা রচিত,—কবি-যশঃপ্রার্থীদের মার্জিত লেখা নয়, মুখে-মুখেই সাধারণত এসব গান রচিত ও গীত। এসব কারণে লোক-সাহিত্যের কিছু লক্ষণ তাতে আছে—যে জন্য রবীন্দ্রনাথ লোক-সাহিত্যের মধ্যে এসবকে গণ্য করেছেন।* যাত্রা পাঁচালীর ও কবিওয়ালার জগৎ ক্রমে দূরে সরে গেলেও জানা দরকার, আধুনিক বাঙলা কাব্য সেই যুগের গীতিকাব্যধারার সঙ্গে

---

* উনবিংশ শতকেই 'সংবাদ প্রভাকরে' গুপ্ত কবির আমল থেকে (ইং ১৮৫৯) এসব কবিতার সংগ্রহ ও সঞ্চয়ের প্রয়াস দেখা দেয়। উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ-গ্রন্থ হচ্ছে—গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'প্রাচীন কবি-সংগ্রহ' বাং ১২৮০ সাল, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গুপ্ত রত্নোদ্ধার', অনাথনাথ দেবের 'বঙ্গের কবিতা', 'সঙ্গীতসার-সংগ্রহ'। তা ছাড়া নানা সাময়িক পত্রে এসব বহু গীত সংগৃহীত

আপনার অজ্ঞাতসারে একটা সম্বন্ধ রেখেই পাশ্চাত্ত্য কাব্যাদর্শকে আপনার করে নিতে পেরেছে। তাই সেদিনের পুরাতনের অনুবৃত্তিকার পাঁচালী-আখ্যান-প্রণেতা কবিদের থেকে এসব গীতিকারদের গুরুত্ব বেশী—যদিও যাত্রা পাঁচালী, কবিগীতি, প্রভৃতিরও শিকড় রয়েছে অতীতেই,—তা সমাজের আমোদ ও উৎসবের গান। ইংরেজ আমলের শহুরে পরিবেশে তাদের যে বিকৃতি ও বিবর্তন ঘটছিল, তা'ই মাত্র লক্ষণীয়।

কবিওয়ালা

কবিওয়ালাদের প্রভাব-প্রতিপত্তির কাল ছিল ইং ১৭৬০ থেকে প্রায় ইং ১৮৩০ পর্যন্ত। (দ্রষ্টব্য: ডঃ সুশীল দে'র ইংরেজিতে বেঃ লিঃ ১ম খঃ, ১০ম পরিচ্ছেদ)। তার আগে ও পরেও কবিওয়ালারা ছিলেন, তা বলাই বাহুল্য।

গোজলা গুঁইর (ইং ১৭৬০ ?) নামই প্রথম পাওয়া যায়।[১] এঁরই রচনা—

> এস এস চাঁদ বদনি।
> এ রসে নিরসো কোরো না ধনি॥ ইত্যাদি

এঁর তিন শিষ্য হলেন লালু নন্দলাল, রঘুনাথ দাস, রামজী দাস। এঁদেরই শিষ্য রাসু-নৃসিংহ দু'ভাই, তাছাড়া হরু ঠাকুর, নিতাই বৈরাগী প্রভৃতি (দ্রঃ ডঃ সুশীলকুমার দে'র ঐ ১ম খঃ পৃ. ৩৪৪)। তার পূর্বে কবিগান 'লড়াই' হয়ে ওঠে নি—হরু ঠাকুর প্রভৃতির আমলে দল বেঁধে, গানের লড়াই চলে। যেমন, নিতাই বৈরাগী ও ভবানী বণিকে, হরু ঠাকুরে আর কেষ্টা মুচিতে, কিংবা পরে হারু ঠাকুর ও রাম বসুতে। লড়াই হয়ে উঠতেই তরজা-পাঁচালী-প্রিয় শহুরে আসরে কবিগানের সমাদর বাড়ে। এঁদের পরে ভোলা ময়রা, অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি, ঠাকুর সিংহরা আসর জমায় (দ্রঃ দে, পৃঃ ৩৮৪)। তাঁদের শ্লীল-অশ্লীল উত্তর-প্রত্যুত্তর এখনো বাঙলা দেশে মুখে মুখে চলে। যা ছাপা হতে পারে এমন মুখরোচক জিনিসও অবশ্য আছে ('সম্বাদ প্রভাকর' ও পরবর্তী সংগ্রহে তা পাওয়া যায়)। যেমন, অ্যান্টনির কাছে ঠাকুর সিংহের প্রশ্ন—

> এসে এদেশে এবেশে কেন তোমার কুর্তি নেই

ও প্রকাশিত হয়েছে। ডঃ সুশীলকুমার দে ইংরাজিতে লেখা উনবিংশ শতকের বাঙলা সাহিত্যে কবিওয়ালাদের সম্বন্ধে বিচক্ষণতার সঙ্গে আলোচনা করেছেন; তা দ্রষ্টব্য।

এ প্রশ্নে অ্যান্টনির উত্তর—

"এই বাঙ্গালায় বাঙ্গালীর বেশে আনন্দে আছি।
হয়ে ঠাকুর সিংহের বাপের জামাই কুর্তি টুপি ছেড়েছি।

কিন্তু কবিগান আসলে গান, কবিতা নয়। আর গীত হিসাবে তার গঠন ও বিভাগ বিশিষ্ট। প্রধানতঃ বিভাগ এরূপ—চিতান, পরচিতান, ফুকা মেলতা, মহড়া (কখন কখন তারপর, 'সওয়ার'), খাদ, তারপরে আবার ফুকা, মেলতা এবং শেষে অন্তরা। এর ব্যতিক্রমও ঘটত। তবে পদ্য হিসাবে মিল আছে। কিন্তু কবিওয়ালারা পয়ার, ত্রিপদীর ধার ধারত না; গানের গতিতে নানা ছন্দ মেলাত। গীতের বিষয় পৌরাণিক বা ঐরূপ নানা জিনিস হত। রাধাকৃষ্ণ কথা দিয়ে আরম্ভ করে কবিরা দু'দলে উত্তর প্রত্যুত্তরে বিষয়োক্ত পক্ষ-প্রতিপক্ষের কথা বলত। প্রথম যুগে অবশ্য দু'দল কবি আলোচনা করে গান বাঁধত, 'সখী-সম্বাদ' দিয়ে গান আরম্ভ করত; আর একেবারে শেষভাগে তারা যা গাইত তার নাম ছিল 'খেউড়'। বৈষ্ণব গীত ও রাধাকৃষ্ণের কথা তখন বাঙালীকে এত পেয়ে বসেছে যে, যে বিষয়েই গীত হোক, কবিওয়ালাদের আরম্ভ ও গীতধারায় থাকত বৈষ্ণব গীতাবলীরই বাহ্য ঠাট। কিন্তু বৈকুণ্ঠের জন্ত ত দূরের কথা, কবিগান ছিল সর্বাংশেই কলিকাতা-চন্দননগর-চুঁচুড়ার শহরে মানুষের জন্ত—তাদের শহরে আমোদ ও উপভোগের জন্ত। এই নূতন 'শহরে মানুষ' কি ধরনের?—তার একপ্রান্তে ছিল অলঙ্কার-অনুপ্রাস-রসিক ভদ্রলোকরা, আর অন্ত প্রান্তে ফুর্তিবাজ বাবুরা ও খিস্তি-খেউড় প্রিয় ইতরজন। কবিগানে কৃষ্ণলীলা তাই ক্রমে এক ধরনের নাগরলীলাই হয়ে উঠল। তখন রাধা বা কৃষ্ণ কারও প্রেম-মহিমার চিহ্ন খোঁজা তাতে নিরর্থক। এদিকে তখন তাতে এল কৃত্রিমতা, আর সেই উত্তর প্রত্যুত্তরের যুদ্ধ যা থেকে তা' গালিগালাজ। তখন কবিগানের নাম হল 'কবির লড়াই'। আর ইতরতার সেই বাড়াবাড়িতেই আগেকার 'খেউড়' কথাটি পেল নতুন অর্থ, যে অর্থ এখনো প্রচলিত। উপস্থিত মত আসরে দাঁড়িয়ে গানে উত্তর-প্রত্যুত্তর দেওয়াই তখন নিয়ম হয়, সেসব কবিদেরই বলত 'দাঁড়া কবি'। তাঁদের গানে তাই সযত্ন রচনার অবকাশ নেই। তাঁদের কৃতিত্ব হ'ল কথায়, গানে, শ্লীল-অশ্লীল যা হোক উপস্থিত মত উত্তর-প্রত্যুত্তর দানে। অবশ্য সেসব গীত সেদিনেও ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করা চলত না—ঈশ্বর গুপ্ত তাই (ইং ১৮৫৪)

ভেবে পান নি কি করে সেদিনের "নবকৃষ্ণ প্রমুখ মহামহিমান্বিত উচ্চলোকেরা জ্ঞাতি কুটুম্ব স্বজন সজ্জন পরিজনে পরিবেষ্টিত হয়ে গদগদ চিত্তে এসব 'শকার বকার' শ্রবণ করতেন।" ঈশ্বর গুপ্ত কবিওয়ালাদের গুণগ্রাহী ছিলেন, তাঁরই যদি একথা মনে হয় তা হলে তখনকার 'ইয়ং বেঙ্গলের' মনে কি হতে পারত ?

কিন্তু কয়েকটা কথা কবিওয়ালাদের সপক্ষে বলা চলে, আর তা সাহিত্যের দিক থেকে স্মরণীয়। শব্দের মার-প্যাঁচ আর ভাবের তুচ্ছতা সত্ত্বেও কবিওয়ালারা প্রায়ই চলতি কথায় স্বচ্ছন্দ চলতি ভাব, চলতি বিষয়, সাধারণের কথা, তাদের অগভীর ও সহজ ধর্মশিক্ষা—এসব সাধারণের মত করেই সহজভাবে উপস্থিত করেছেন। আধুনিক কালে পৌঁছে কবিতায় আমরা কিন্তু তা আর করতে পারি না। বিশিষ্ট হতে গিয়ে কাব্য অনেকটা এখন শিষ্ট-রুচিসম্মত হয়ে পড়েছে, সাধারণের সঙ্গে আত্মীয়তা খুইয়েছে। আধুনিক কালে (বিংশ শতাব্দীর মধ্যকালে) শিষ্টশ্রেণী ছাড়িয়ে সে হতে চাইছে আত্মীয়গোষ্ঠীর 'সন্ধ্যাভাষা'।

পদ্যের সেই নিষ্ফলাভূমিতে তবু এসব কবিওয়ালারাই দ্রুমতুল্য, তা একেবারে মিথ্যা নয়। নানা গীত-সংগ্রহ শুদ্ধ তাঁদের নাম এখনো স্মরণ করা সম্ভব। যেমন, রাসু (মৃত্যু ১৮০৭) ও নৃসিংহ (মৃত্যু ১৮০৯ ?) চন্দননগরে দুই 'কায়স্থ ভাই'র 'সখী সম্বাদ' ও 'বিরহের' ৬টি গীত, তাতে একটি সহজ সংযম আছে।

হরুঠাকুর (১৭৩৮-১৮১২) বা হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাঙ্গী, কলিকাতা সিমলের ব্রাহ্মণ। রাজা নবকৃষ্ণের বাড়িতে গেয়ে তিনি নাম করেন। নানা বিষয়ে তাঁর ক্ষমতা ছিল—তাঁর গীতও বেশী পাওয়া যায়। যথা, 'কদম্ব তলে কে গো বাঁশী বাজায়', 'আগে যদি প্রাণ সখি জানিতাম', 'একি অকস্মাৎ ব্রজে বজ্রাঘাত কে আনিল রথ গোকুলে। অক্রূর সহিতে তুমি কেন রথে বুঝি মথুরাতে চলিলে।'

কিম্বা—

আমারে সখি ধর ধর।
ব্যথার ব্যথিত কে আছে আমার।

এসব সুপরিচিত গানে, বিশেষ করে 'সখী-সম্বাদে',—তাঁর নাম হয়েছে।

নিতাই বৈরাগীও (ইং ১৭৫৪-১৮২১) চন্দননগরের লোক। কথার অত কারুকার্য না জানলেও সহজ কথায় ভাব বেশ প্রকাশ করেছেন। কথার চাতুর্যে ও অলঙ্কারে রাম বসুই প্রসিদ্ধ। তাঁর গীতও পাওয়া যায় অনেক। রাম বসু (ইং ১৭৮৬-ইং ১৮২৮) হাওড়া-সালকের লোক. নিতাই বৈরাগীর কাছে তাঁর শিক্ষা। জ্ঞানেশ্বরী কবিওয়ালীর প্রতি তিনি আসক্ত ছিলেন, এরূপ শোনা যায়। কবিওয়ালাদের মধ্যে তাঁর খ্যাতিই সমধিক, ভালো মন্দ শুদ্ধ তাঁকেই বলা যায় কবিগানের যুগের খাঁটি প্রতিনিধি। যেগুলি ভালো গান সেগুলি সত্যই ভালো—(দ্রঃ বঃ সাঃ পরিচয়, ১৫৫৯)

যৌবন জলমের মত যায়।
আশা পথ নাহি চায়॥
কি দিয়ে গো প্রাণ-সখি রাখিব ইহার॥
বালিকা ছিলাম, ভালো ছিলাম
সই ছিল না সুখ অভিলাষ।
পতি চিনতাম না ও রস জানতাম না,
হৃদপদ্ম ছিল অপ্রকাশ।
এখন সই শতদল মুদিত কমল কাল পেয়ে ফুটিল॥

কিম্বা,—

দাড়াও দাড়াও প্রাণনাথ বদন ঢেকে যেও না।
তোমারে ভালবাসি তাই চোখের দেখা দেখতে চাই
কিন্তু কাছে থাক থাক বলে ধরে রাখব না। ইত্যাদি—

কিন্তু এরূপ সারল্য বা সংযম দীর্ঘ গীতে বেশিক্ষণ থাকে না।

তবে 'আগমনী' গানে প্রণয়-বিলাসের স্থান নেই. আর সেই গীত দীর্ঘ হলেও রাম বসুর হাতে ভাব-সম্পদ লাভ করেছে।

গত নিশিযোগে আমি দেখেছি হে সুস্বপন।
এলো সেই আমার তারাধন।
দাঁড়ায়ে দুয়ারে বলে মা কই, মা কই, মা কই আমার
দেখা দাও দুখিনীরে।
অমনি দু'বাহু পসারি উমা কোলে করি
আনন্দেতে আমি আমি নয়।

এই স্বপ্ন-ছলনা বিষয়টি অবশ্য মৌলিক নয়। কিন্তু ভাবে, ভাষায়, সুরে সব মিলিয়ে এটি বাঙালী মনের গভীরতম দেশ থেকে জাত।

ইং ১৮৩০-এর পরেও অবশ্য কবিওয়ালারা লুপ্ত হয় নি। আণ্টুনির একটি গীত অন্তত স্মরণীয় :

খৃষ্ট আর কৃষ্ণে কিছু প্রভেদ নাইরে ভাই।
শুধু নামের ফেরে মানুষ ফেরে এও কোথা শুনি নাই।
আমার খোদা সে হিন্দুর হরি সে
এই দেখ শ্যাম দাঁড়িয়ে রয়েছে—

এ অবশ্য বাঙলার মাটির কথা, ভারতবর্ষেরও চিরদিনের কথা—আউল-বাউলের ধারার গান। কিন্তু 'ইয়ং বেঙ্গলে'র পরে দেশের রুচি পরিবর্তিত হল, আধুনিক যুগের ভিত্তিও স্থাপিত হয়ে গেল। কবিওয়ালারাও ক্রমেই পিছনে হটতে বাধ্য হল। নীলু, রামপ্রসাদ ঠাকুর, আণ্টুনি, ভোলাময়রা, ঠাকুরদাস সিংহ—এ সব বহু কবিওয়ালা তখনো শহরে সমাজে আসর জমাত। (দ্রঃ ডঃ দে, ১৯শ শতক, পৃঃ ৩৮৩ থেকে)

যাত্রাওয়ালা

যাত্রার কথা নাটকের সূচনা খুঁজতে গিয়ে আলোচিত হয়েছে। গীতপ্রধান এসব যাত্রার গীতিকাব্য কিছু কিছু মাত্র সংগৃহীত আছে। অধিকাংশই নেই।

কালীয়-দমন-যাত্রার ধারার যে যাত্রাওয়ালার নাম প্রথম পাওয়া যায় তিনি বীরভূমের পরমানন্দ অধিকারী—কাল গণনায় বোধহয় পূর্বযুগের (১৮শ শতকের) লোক। তার পরে যাঁদের নাম পাওয়া যায় তার মধ্যে গোবিন্দ অধিকারীই প্রধান। (বঃ সাঃ, পরিচয় ২য় খণ্ডে তার গীত আছে, দ্রষ্টব্য)। 'রাম-লীলা, চণ্ডীলীলা'র কথা ছাড়িয়ে ক্রমে যাত্রায় নল-দময়ন্তী ও বিদ্যাসুন্দর প্রভৃতি মাধুর্যলীলার কথাও দেখা দিল। তাতে প্রাধান্য পেল যুগের রুচি অনুযায়ী কালুয়া-ভুলুয়ার মত ভাঁড়ামির বিষয় (লেবেদেভ্-ও তা উল্লেখ করেছেন), আর বিদ্যাসুন্দরের মত প্রণয়-বিলাসের বিষয়। গোপাল উড়ের (জন্ম, ১৮১৯ ?) বিদ্যাসুন্দর কলকাতার বাবুদের বিশেষ করে যে মাতিয়েছিল, তা নাট্যপ্রসঙ্গেই বুঝেছি। প্রায় এ সময়েরই মানুষ কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য গোস্বামী (জন্ম ইং ১৮১০)। বাংলা দেশের মানুষের সর্বত্র যে রুচি-বিকার ঘটে নি, কৃষ্ণকমলের কৃষ্ণলীলা ও চৈতন্যলীলার গীত তার প্রমাণ (দ্রষ্টব্য, বঃ সাঃ

পরিচয় ২য়) গীতকার হিসাবেই এঁর পরিচয়, কাব্যরস যা আছে তা সুর ও তালের সাহায্যেই ফোটে, স্মরণে রাখবার মত কিছু নয়।

পাঁচালীকার—দাশরথি রায় (ইং ১৮১০—ইং ১৮৫৭)

'শ্রীরাম পাঁচালী', 'ভারত পাঁচালী' প্রভৃতি পুরাতন পাঁচালী এ শতকে আর নেই। পাঁচালীও কালের গুণে হয়ে উঠেছে হালকা, হাস্যরসপ্রধান নানা বিষয়ের পালা (দ্রষ্টব্য—ডঃ সুশীল দে, ১৯শ শতক, পৃঃ ৪৩৮ থেকে)। দাশু রায় বা দাশরথি রায় পাঁচালীকার হিসাবে সর্বাধিক খ্যাতিলাভ করেছেন। বর্ধমানের কাটোয়ার বাদমুড়া গ্রামে তাঁর জন্ম বাং ১২১৮ সালে, মৃত্যু ইং ১৮৫৭-তে;—তিনি ঈশ্বর গুপ্তের সমকালীন। প্রথমে তিনি নীল-কুঠিতে কেরানী হয়েছিলেন। শোনা যায় এক কবিওয়ালীর সঙ্গে তাঁর প্রণয় হয়; তার দলের তিনি গান বেঁধে দিতেন। এজন্ত প্রতিপক্ষের গানে বিশেষ গঞ্জনা-বিদ্রূপ লাভ করে তিনি কবির দল পরিত্যাগ করেন। গৃহে ফিরে নিজের 'পাঁচালীর দল' গঠন করেন. তাতেই তাঁর খ্যাতিলাভ হল। সম-সাময়িক বিষয়েও তাঁর পালা আছে। বিধবাবিবাহ বিষয়ে বিদ্যাসাগরকে তিনি ব্যাজস্তুতি করেছেন। তাঁর পালাও গীতসংখ্যায় ভারী। বঙ্কিমচন্দ্র সত্যই বলেছেন. "দাশরথি রায়ের কবিত্ব ছিল না এমত নহে। কিন্তু অনুপ্রাস-যমকের দৌরাত্ম্যে তাহা একেবারে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে. পাঁচালীওয়ালা ছাড়িয়া তিনি কবির শ্রেণীতে উঠিতে পারেন নাই।"

অধ্যাত্ম গীতিকার

পদাবলীর ধারা অনুসরণ করে যে সব গীত রচিত হচ্ছিল, তার মধ্যে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পিতা জন্মেজয় মিত্রের ('সঙ্কর্ষণ') পদাবলীর নাম করা হয়। কিন্তু বৃন্দাবন-লীলা একদিকে যেমন কবিওয়ালা যাত্রাওয়ালা প্রভৃতি সকলের সাধারণ সম্পত্তি হয়ে ওঠে, অন্যদিকে তার মূল প্রাণসম্পদ তখন নিঃশেষিত হয়ে যায়। তার অপেক্ষা বরং রামপ্রসাদের অনুবর্তীদের শাক্ত-লীলার গানে সহজ কবিত্বের ও আন্তরিক অধ্যাত্মানুরাগের পরিচয় বেশি পাওয়া যায়। বৈষ্ণব পদাবলীতে নানা রসের, বিশেষ করে উজ্জ্বল রসের, প্রকাশের যে সুযোগ আছে শাক্ত গানে তা নেই। অষ্টাদশ শতক হচ্ছে

জটিল ও কুটিল কালের শতাব্দী। বিভ্রান্ত অসহায় মানবাত্মা তখন স্বভাবতই জগন্মাতার নিকটে আশ্রয় চেয়েছে। মধুর রসের আস্বাদন তখন সহজ নয়; মানুষ ত্রাতা ও তারিণীর উপর নির্ভর করা ছাড়া পথ দেখে না। যশোদা-গোপালের লীলানন্দও এর সগোত্র, কিন্তু মন তখন আনন্দের সুরে বাঁধা নয়, আশ্রয়ের স্থল খোঁজে। অবশ্য জগন্মাতার নিকট সেই আত্মনিবেদনের সূত্রে সাধনার স্তরে স্তরে যে গভীর আত্মপ্রত্যয় ভক্ত লাভ করে, তা কম উজ্জ্বল নয়। এই ভক্তি-আদর-স্নেহ-প্রত্যয়ের বশে রচিত সরল গীত সশঙ্ক সরল মানুষের অন্তর স্পর্শ করে—বিশেষ করে সুর ও তালের সহায়তা পেয়ে। কবির কাব্য না হোক, সাধকের কাব্য হিসাবে তার কিছু কিছু গ্রাহ্য। অবশ্য কৃষ্ণ ও কালীতে রামপ্রসাদ প্রমুখ সাধকরা বিভেদ করতেন না। রামপ্রসাদের এই গীতধারা সত্যই এই উনিশ শতকের প্রথম দিকে প্রবল হয়, এবং যদি শ্রীরামকৃষ্ণকে মনে রাখি তা হলে বুঝতে পারি এ ধারার সাধনা কি করে সৃষ্টির সমৃদ্ধিতে রূপান্তরিত হয়েছে, এবং কিরূপে বিংশ শতকের বাঙালী চেতনাকেও রূপান্তরিত করেছে।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্র রাজা শিবচন্দ্র ও কুমার শম্ভুচন্দ্র, সে বংশের কুমার নরচন্দ্র, বর্ধমানের মহারাজার দেওয়ান নন্দকিশোর ও তাঁর ভ্রাতা দেওয়ান রঘুনাথ রায় (ইং. ৭৫০-ইং ১৮৩৬) প্রমুখ নদীয়া-বর্ধমানের সামন্ত-অভিজাত-গণ শাক্ত পদাবলীর ধারায় ভালো মন্দ বহু গীত রচনা করে গিয়েছেন। কিন্তু রামপ্রসাদের পরে সাধনায় ও সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য কমলাকান্ত। কালনা-অম্বিকাপুরে কমলাকান্ত ভট্টাচার্যের বাড়ি। বর্ধমানের মহারাজ তেজশ্চন্দ্র তাঁর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন আর মহারাজ মহতাবচন্দ্র ইং ১৮৫৭ সালে কমলা-কান্তের ২০০ শত গীত-সংগ্রহ প্রকাশ করেন। এসব গান আন্তরিকতা ও অনুভূতির দ্যুতিতে উজ্জ্বল। কবির সরল সাধারণ মানবিকতা তাতে আরও হৃদয়স্পর্শী হয়ে ওঠে। অধ্যাত্ম সঙ্গীতের ধারায় অবশ্য রামমোহন ও তাঁর সহযোগীরাও গণ্য হতে পারেন। কিন্তু রাজা কাব্যরসে বঞ্চিত ছিলেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের হাফেজানুরক্তি তাঁর সমকালীন কোনো ভক্তকে কবি করে তোলে নি। তাঁর প্রভাবে পরের যুগে ব্রহ্মসঙ্গীতের নতুন রহস্যবাদের উৎস হয় উপনিষদ্।

আসলে যে অধ্যাত্ম-গীতকাররা তখনো আপনাদের সাধনায় অব্যাহত

ছিলেন, তাঁরা ছিলেন শহরে কলকাতার বাবু বেনিয়ান বা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের থেকে বহুদূরে—চিরদিনের মত গ্রামে। সে সব আউল-বাউলের গান, বায়-ফতি-মুর্শেদি গানের সংকলন তাই সেদিনের গীত-সংগ্রহসমূহেও স্থান পায় নি। শতাব্দীর শেষ দিকে এ বিষয়ে বাঙালী শিক্ষিত-সমাজ আবার সচেতন হন, আর বিংশ শতকে লালন ফকির, গগন হরকরা, বিশা ভুঁইমালীরা আবার আবিষ্কৃত হলেন। একদিকে 'ময়মনসিংহ গীতিকা', রূপকথা ও উপকথা, ও অন্যদিকে এই অধ্যাত্ম-গীতের অলিখিত ধারা —এ দু' জিনিস এই শতাব্দীতে বাঙালী সাহিত্যিককে তার লোক-সাহিত্যের অফুরন্ত ভাণ্ডার সম্বন্ধে সচেতন করে। লোক-সাহিত্য অবশ্য নানাবিধ কারণে স্বতন্ত্র আলোচনার যোগ্য। কিন্তু 'ময়মনসিংহ গীতিকা'র মত কিংবা রাগাত্মিকা পদাবলীর মত, কিছু কিছু বাউলগীতিও সাহিত্যের হিসাবে প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য বলে স্বীকার্য ও এখানে স্মরণীয়। সেরূপ উঁচুদরের উদাহরণ অনেক আছে, কিন্তু কোনোটিকে নিঃসংশয়ে বলতে পারি না ইং ১৮০০-১৮৫৭-এর।

প্রণয়-সঙ্গীত

নিঃসংশয়ে যে গীত-কাব্য যুগমানসের বাহন হয়, সে যুগ ছাড়িয়ে যে গীতি-কবিতা আগামী যুগের কতকটা ইঙ্গিত উত্থাপন করেছিল,—তা কবি-গানও নয়, অধ্যাত্মসঙ্গীতও নয়; সে হচ্ছে প্রণয়-সঙ্গীত। আর যিনি নতুন করে তার পথ রচনা করলেন সেই 'নিধুবাবু'কে বাঙালী মনের এক দিকের একজন শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিও বলা যায়।

ভারতচন্দ্রের অনুসরণে প্রণয় বর্ণনাই ছিল তখন কাব্যের আদর্শ—কিন্তু তা গীত নয়, অলঙ্কার-প্রধান কৃত্রিম কাব্য। রাধা-কৃষ্ণের নামের আড়ালেই প্রণয়-গীতি বাঙলাদেশে রচিত হয়েছে। কবিওয়ালারা রাধা-কৃষ্ণের নামকে প্রণয়-নামেই পর্যবসিত করেছিলেন। নাম ছাড়িয়ে, প্রণয়-উপাখ্যানের মত প্রণয়-গীতিও হয়ত পরিষ্কার প্রণয়-গীতিরূপেই আবির্ভূত হচ্ছিল, কিন্তু তার প্রমাণ নেই। প্রমাণ পাওয়া গেল, যখন ভাব ও রসের ছাড়পত্র আদায় করে রামনিধি গুপ্ত বাঙলায় 'টপ্পা' রচনা করতে লাগলেন। আলঙ্কারিক রূপবর্ণনা, দেহ-বিলাস ও অধ্যাত্মবিলাস ছাড়াও দেহমন-ধর্মী যে মানব প্রণয় আছে, পৃথিবীর একটা সহজ ও শাশ্বত সত্য রূপে বাঙালীর মন তাকে সহজভাবেই

স্বীকার করে কিন্তু বাঙলা কাব্যে তা এ পর্যন্ত বারে বারেই অধ্যাত্ম-উচ্ছ্বাসে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। উনিশ শতকে আধুনিক মানবীয়তার বোধ সম্ভাবিত হতেই সেই বৈকুণ্ঠ-ছায়া লঘুতর হয়ে উঠল—অবশ্য পরে উনিশ শতকের শেষার্ধে গীতিকাব্যে আবার *subjective* বা বিষয়ী-গত অন্তর্মুখিতা প্রবল হয়ে ওঠে। বিহারীলালের পর থেকে ক্রমে গীতিকবিতা নূতন এক অধ্যাত্ম ভাবতন্ময়তায় প্রভাবিত হতে থাকে। ভারতচন্দ্র ও বিহারীলাল, এই দুই সীমার মধ্যে নিধুবাবু ও তাঁর অনুসরণকারী শ্রীধর কথক ও কালী মির্জা প্রভৃতি গীতকাররা একবারের মত বাঙালীর প্রণয়-চেতনাকে স্বাভাবিক রূপ দিতে পেরেছেন,—আপন প্রাণের অনুভূতি, ভালোবাসা, প্রণয়জাত নানা স্বাভাবিক ভাবকে তাঁরা প্রকাশ করেছেন—এ জন্ত বাঙলা সাহিত্যে নিধুবাবু বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী, বাঙলা-সাহিত্যও এই প্রকাশ-সম্পদের জন্ত বাঙলা সঙ্গীত-শিল্পীদের নিকট কৃতজ্ঞ।

নিধুবাবুর জীবনবৃত্তান্তও 'প্রভাকরে' ঈশ্বর গুপ্ত সংকলন করে গিয়েছিলেন (১লা শ্রাবণ, ১২৬১ বাং)। এখন পর্যন্ত তাই আমাদের প্রধান অবলম্বন (আর তা ইদানীং পূরণ করেছেন ডঃ সুশীলকুমার দে 'নানা নিবন্ধে'র প্রবন্ধে)। নিধুবাবুর আসল নাম রামনিধি গুপ্ত। তাঁদের পৈতৃক ভিটা ছিল কুমারটুলিতে। কিন্তু ত্রিবেণীর নিকট চাঁপতা গ্রামে (হুগলী জেলায়) তিনি জন্মেন বাং ১১৪৮ সালে (ইং ১৭৪১;—তখনো বর্গীর হাঙ্গামার দিন; পলাশীও ঘটেনি। তাঁরা কলিকাতায় ফিরে আসেন বাং ১১৫৪;—এখানেই নিধু-বাবুর বিদ্যারম্ভ। সংস্কৃত ও ফারসি ছাড়া কিছু কিছু ইংরেজিও নিধুবাবু শিক্ষা করেন। প্রায় ৩৫ বৎসর বয়সে নিধুবাবু ছাপরা (বিহার) কালেক্টরিতে কেরানীর কাজে নিযুক্ত হন। এখানেই এক মুসলমান ওস্তাদের নিকট নিধু-বাবুর হিন্দুস্থানী সঙ্গীতবিদ্যা শিক্ষার সুযোগ ঘটে। কিন্তু ওস্তাদের মনে ক্রমে এই গুণী শিষ্যের উপর ঈর্ষা জাগে। তাই নিধুবাবু তাঁর সহায়তা থেকে বঞ্চিত হন।' তখন নিজেই তিনি হিন্দুস্থানী গীতের আদর্শে বাঙলা ভাষায় গীত রচনায় লাগলেন। তাঁরই কথা—

নানান দেশে নানান ভাষা।
বিনে স্বদেশী ভাষা পুরে কি আশা॥
কত নদী সরোবর কিবা ফল চাতকীর।
ধারা-জল বিনে কভু ঘুচে কি তৃষা॥

এভাবেই বাঙলা 'টপ্পা'র জন্ম হয়। সরকারী কর্মে অসদুপায়ে বিত্তার্জন তখন সমাজে অন্যায় বলে গণ্য হত না। কিন্তু নিধুবাবুর তাতে আপত্তি হল। আর এই কারণেই তিনি ছাপরার সরকারী কর্ম ত্যাগ করে কলকাতায় ফিরলেন। তাঁর জীবনে এর পরে শোকের আঘাত আসে—স্ত্রী ও পুত্রের মৃত্যু হয়। সেই শোকাকুল মনেই লেখা হল 'মনঃপুর হতে মোর হারায়েছে মন' প্রভৃতি গান। দ্বিতীয় স্ত্রীও বিবাহের পরেই গত হলেন। তৃতীয় দার তিনি গ্রহণ করলেন বাং ১২০১-২ সালে অর্থাৎ পঞ্চাশোর্ধ্বে' এবং এ বিবাহে ছ'টি পুত্রকন্যা তিনি লাভ করেছিলেন।

নিধুবাবু সঙ্গীত-শিল্পী। শোভাবাজারের এক বড় আটচালায় প্রথম দিকে তাঁর গানের বৈঠক বসত। ধনী ও গুণী লোকেরা সেখানেই নিধুবাবুর 'টপ্পা' শুনতে এসে জুটতেন। তাঁদের নিকটও নিধুবাবুর সম্মান ছিল প্রচুর। 'পক্ষীর দলের'ও বৈঠক বসত এ আটচালায়—তাঁরা শৌখীন 'বাবু' সমাজেরই এক অংশ। নিধুবাবুকে তাঁরাও মান্য করতেন। এ আড্ডা ভেঙে গেলে নিধুবাবুর উদ্যোগে (বাং ১২১২-১৩ সালে) নতুন আখড়াই গাইবার মত দুটি দলের সৃষ্টি হয়। সাবেক আখড়াই পদ্ধতি ভেঙে প্রথমতঃ 'দাঁড়া কবি' ও পরে 'হাফ্-আখড়াই' গাহনার সৃষ্টি করেন বাগবাজারের মোহনচাঁদ বসু। আখড়াই গাহনা মোহনচাঁদ নিধুবাবুর নিকট শিখেছিলেন। তাই সঙ্গীত-জগতে শুধু বাঙলা টপ্পা নয়, মূলত 'হাফ্-আখড়াই'র সৃষ্টিকর্তাও নিধুবাবু।

পরের যুগে টপ্পার সম্বন্ধে শিক্ষিত সমাজের মনে বিরূপতা জন্মে—অনেকটা তাঁদের অজ্ঞানতার জন্য। আর নিধুবাবুর নাম 'টপ্পা'র সঙ্গে সংযুক্ত বলেই, নিধুবাবুর সম্বন্ধেও একটা ভ্রমপূর্ণ লঘু ধারণাও গড়ে ওঠে। এজন্যই জানা দরকার—নিধুবাবু ইয়ার-সমাজের লোক ছিলেন না। "তিনি কখনো লোকের তোষামোদ করেন নাই, নিজের মান রাখিয়া চলিতেন। তাঁহার প্রকৃতি স্বভাবতঃ এত গম্ভীর ছিল যে—কেহ তাঁহাকে একটি গান গাইতে অনুরোধ করিতে সাহসী হইত না।" অথচ তিনি যে "সদানন্দ, সন্তোষপরায়ণ' পুরুষ ছিলেন, তাঁর গীতই তার প্রমাণ।

শ্রীমতী নাম্নী এক রূপবতী, গুণবতী বারাঙ্গনার সঙ্গে তাঁর মেলামেশা নিয়ে নানা কথা শোনা যায়। এরূপ সৌহার্দ্য সেদিনে মোটেই বিস্ময়কর নয়। বিশেষ করে নিধুবাবু গীতবাদ্যের জগতের কৃতীপুরুষ। বরং উল্লেখযোগ্য

এ বিষয়ে 'প্রভাকরে'র এই বিচার, "তিনি লম্পট ছিলেন না ; কেবল স্তুতি বিনয় স্নেহ ও নির্মল প্রণয়ের বশ্য ছিলেন।" এ তথ্যটুকু উল্লেখযোগ্য—এই শ্রীমতীর গৃহে গানবাজনা হাস্যালাপ চলত এবং এখানে বসেই যখন যেমন ভাবের উদয় হত, নিধুবাবু তখনই তাঁর এক এক গীত রচনা করতেন। (নিধুবাবুর চরিত্রচিত্র ও কাব্য-বিচারে ডঃ সুশীল দে'র প্রবন্ধটি বিশেষ মূল্যবান—দ্রষ্টব্য : 'নানা নিবন্ধ'—'রামনিধি গুপ্ত')। দীর্ঘ জীবন স্বাস্থ্য ও প্রতিপত্তি ভোগ করে নিধুবাবু ৯৭ বৎসরে যখন প্রাণত্যাগ করেন (২১শে চৈত্র বাং ১২৪৫ সাল—ইং ১৮৩৯ অব্দে) তখনো তাঁর বুদ্ধি, দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি অক্ষুণ্ণ ছিল। পলাশীর পূর্বে জন্মে তিনি একটা দীর্ঘ যুগাবর্তন প্রায় প্রত্যক্ষ করেন, কলিকাতার 'বাবু' সমাজের উদ্ভব ও প্রভাব তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁদের রসবোধের শ্রেষ্ঠ দিকের প্রমাণ নিধুবাবুর গান। তাঁর নিজের জীবনও কম বিচিত্র নয়—যোগ্য কথাশিল্পী বা চলচ্চিত্রশিল্পীর হাতে তা শিল্পবস্তু হতে পারে।

নিধুবাবুর গানের সম্পূর্ণ ও প্রামাণিক সংগ্রহ নেই। তবু বিচার-বিশ্লেষণ করে মোটামুটি স্থির করা যায় কোন্‌টি নিধুবাবুর, কোন্‌টি তাঁর অনুকারী অন্য কোন গীতকারের। সেদিকে নিধুবাবুর মৃত্যুর এক বৎসর পূর্বে মুদ্রিত (বাং ১২৪৪) "গীতরত্ন গ্রন্থ"ই প্রধান আশ্রয়—তা সম্ভবত অসম্পূর্ণ, আর সম্ভবত তাতে অন্যেরও দু'একটি রচনা গৃহীত হয়েছে। পরবর্তী সংগ্রহ-গ্রন্থসমূহ থেকে নিধুবাবুর আরও কিছু আখড়াই, ব্রহ্মসঙ্গীত, শ্যামাবিষয়ক সঙ্গীত প্রভৃতি পাওয়া যায়। অন্যের রচিত অনেক আদিরসাত্মক গানও নিধুবাবুর বলে সে সব সংগ্রহে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। (এ সব সংগ্রহ-গ্রন্থ ও তাদের বিচার ডঃ দে'র পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধে করা হয়েছে।) দু'একটি প্রসিদ্ধ গান যা নিধুবাবুর নামে চলে, মনে হয়, তা তাঁর নয়। যেমন,

> ভালবাসিবে বলে ভালবাসিনে।
> আমার স্বভাব এই তোমা বই আর জানিনে॥
> বিধুমুখে মধুর হাসি দেখিলে সুখেতে ভাসি
> সে জন্যে দেখিতে আসি দেখা দিতে আসিনে॥

এটি শ্রীধর কথকের রচনা হবারই সম্ভাবনা। এরূপ শ্রীধর কথকেরই হয়ত গান—

তবে প্রেমে কি সুখ হত।
আমি যারে ভালবাসি সে যদি ভালবাসিত॥

আরও কিছু টপ্পাও নিধুবাবুর রচিত কিনা বলা যায় না। যথা

নয়নেরে দোষ কেন—

এবং

তোমারি তুলনা তুমি প্রাণ এ মহীমণ্ডলে।—ইত্যাদি।

আসলে নিধুবাবু টপ্পা রচনার প্রায় একটা 'স্কুল' তৈরী করে যান। এসব যদি নিধবাবুর গান না হয় তবে 'নিধুবাবুর স্কুলের গান' বললে ভুল হবে না। এদেশের নৈর্ব্যক্তিক আবহাওয়ার গুণে ব্যক্তি নিধুবাবু ব্যক্তি চণ্ডীদাসের মত, পরম্পরার রচনায় হারিয়ে যেতে পারতেন—যদি ঈশ্বর গুপ্ত প্রভৃতি তাঁর পরিচয় না রেখে যেতেন, আর মুদ্রাযন্ত্র সেই পরিচয়কে আরও পাকা করে না ফেলত। তথাপি শ্রীধর কথক, কালী মির্জা, ছাতুবাবু প্রভৃতির স্বতন্ত্র পরিচয় ও গান থাকলেও তাঁদের অনেক গান সংগ্রহ-গ্রন্থে নিধুবাবুর গানের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। নিধুবাবুর মৃত্যুর মাত্র ষোল বৎসর পরে ঈশ্বর গুপ্ত লিখেছেন, "অনেকেই 'নিধু' 'নিধু' কহেন, কিন্তু নিধু শব্দটি কি, অর্থাৎ এই নিধু কি গীতের নাম, কি সুরের নাম, কি রাগের নাম, কি মানুষের নাম, কি, কি? তাহা জ্ঞাত নহেন।" এই নৈর্ব্যক্তিকতার আবহাওয়ায় পরবর্তী কালে নানা কুরুচিপূর্ণ ও অসার্থক গানও 'নিধুর টপ্পা' বলেই চলেছে। অবশ্য একথা স্বীকার্য নিধুবাবুর আমলে বাঙালীর মনে নূতন কালের রুচিবোধ সম্পূর্ণ স্থির হয়ে ওঠেনি—শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধেই তা বঙ্কিমের যুগে স্থির হয়। আর নূতন কাব্যসংস্কারও নিধুবাবুর আমলে স্থির হয়নি·· মধুসূদন না আসতে তাও ছিল অস্পষ্ট। অতএব, নিধুবাবুর গানে এখানে-ওখানে একালের বিবেচনায় রুচির দোষ দেখা যায়। আর, কাব্যগুণেরও অভাব প্রচুর চোখে পড়ে। দু'চারটি চমৎকার চরণ অতিক্রম করতে না-করতে একই গানে এসে অচল-চরণে ঠেকে যেতে হয়। এই সাধারণ এবং প্রধান ত্রুটি মনে রেখেই বলতে পারি—যে চরণগুলি চমৎকার তা নূতন শহুরে কালচারের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ, বাবু-বিলাসের আওতায় রচিত শুভ্র প্রণয়-মাল্য, আর কথায়, সুরে, সুক্ষ্মরসবোধে বাঙলার প্রণয়-সঙ্গীতের ধারায় নূতন সংযোজন।

বৈষ্ণবপদাবলীতে ও পল্লীগীতিতেই শুধু বাঙালীর প্রণয় কবিতা শেষ হয়ে

গেল না। "প্রেমের বিষয় যাহা কিছু বলিবার আছে নিধুবাবু তাহার অনেক কথাই বলিয়াছেন।" আর প্রেমের কথা সাহিত্যের শাশ্বত উপাদান। নিধুবাবুর গীতিসাহিত্যের বৈশিষ্ট্যই এবার উল্লেখ করছি।

বৈষ্ণব-পদকারদের মতই নিধুবাবু পীরিতির প্রশস্তিকার :

পিরীতি না জানে সখী সে জন সুখী বল কেমনে।
যেমন তিমিরালায় দেখ দীপ বিহনে॥

অবশ্য এ বৈকুণ্ঠের গান নয়, সে পিরীতিও নয়। "যতদিন দেহ আছে, প্রেম দেহসম্পর্কশূন্য থাকিতে পারে না," এই সহজ সত্য নিধুবাবুর গানে স্বীকৃত। কলকাতার শহরে সমাজেরও এ বাস্তব বোধ ছিল মজ্জাগত, কবিওয়ালা-যাত্রাওয়ালারা তা নিয়ে রঙ লাগাতেও ছাড়ত না। কিন্তু নিধুবাবুরই শ্রেষ্ঠ চরণে দেখি এই প্রণয়ের সহজ ও পরিচ্ছন্ন প্রকাশ। ডাক্তার সুশীলকুমার দে নিধুবাবুর গানগুলি থেকে প্রেমের এই বিচিত্র প্রকাশের সাক্ষ্য নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করেছেন—('নানা নিবন্ধ', পৃঃ ১২১-২৯) : "মিলনাকাঙ্ক্ষা, মিলনের আনন্দ, অভিমান, সাধনা, সোহাগ, আত্মনিবেদন, বিচ্ছেদের দুঃখ, অপূর্ণ প্রেমের নৈরাশ্য, উদ্বেগ, সন্দেহ, অবিশ্বাস, প্রেমে শঠতা ও নিষ্ঠুর অনুযোগ প্রভৃতি বহুরূপী প্রেমের বিভিন্ন রূপের বর্ণনা তাঁহার সঙ্গীতে অপ্রতুল নহে।"

আগে কি জানি সই এমন হবে।
নয়নে নয়ন মিলে মনেরে মজাবে।

—শুধু দেহই শেষ নয়, দেহ ছাড়িয়ে যায়, 'মনেরেও মজায়'। অথচ—

নয়ন-অন্তরে, অন্তরে তোরে নিরখি মন-নয়নে।
চাক্ষুষে যতেক সুখ, তত কি হয় মননে॥

তথাপি দেখারও শেষ নেই—

নয়নে নয়ন রাখি (প্রাণ) অনিমিখ হয় আঁখি বাসনা মনেতে।

কিন্তু—

বিচ্ছেদে যা ক্ষতি তাহা অধিক মিলনে।
আঁখির কি আশা পুরে ক্ষণ দরশনে।

এই রহস্য জেনেও শেষ নেই—

তুমি কি জানিবে আমার মন।
মন আপনারে আপনি জানে না।

তাই একথা আরও সত্য—

নয়ন রূপেতে ভুলে মন ভুলে গুণে।

কিংবা সেই গানটি যেটির রচয়িতা অন্যেও হতে পারে, নিধুবাবুও হওয়া সম্ভব :

নয়নের দোষ কেন।
মনেরে বুঝায়ে বল নয়নের দোষ কেন।
আঁখি কি মজাতে পারে না হলে মন মিলন।
আঁখি যে যত হেরে সকলই কি মনে ধরে,
যেই যাকে মনে করে সেই তার মনোরঞ্জন॥

'মনের মিলনে'র শেষ কথা সেই একাত্মতায়, আধুনিক মনোবিজ্ঞান যাকে বলে identification :

এতদিন পরে নিখিল আমার মনের অনল সখী।
দেখ যতদিন ছিল দুই জ্ঞান, সতত ঝুরিত আঁখি॥

এখন—

আমি লো তাহার তাহার মনে, সে আমার মোর মনে,
দেখ দেখি কত সুখ উভয় প্রেম দু'জনে॥

তাই শুনি—

আমি কি দিব তোমারে সঁপিয়াছি মন।
মনের অধিক আর কি আছে রতন॥

এই আত্মসমর্পণের সার্থকতাতেই বলা যায়—

ভালবাসিবে বলে ভালবাসিনে।
আমার স্বভাব এই তোমা বই আর জানিনে॥ —ইত্যাদি

তাই "ভোগ অপেক্ষা ত্যাগ, সুখ অপেক্ষা দুঃখ, তৃপ্তি অপেক্ষা অতৃপ্তির কথা" তাঁর গানে বেশি—

তবে প্রেমে কি সুখ হতো।
আমি যারে ভালবাসি সে যদি ভালবাসিতো॥ —ইত্যাদি

তা হলেও—

'প্রেম মোর অতি প্রিয় হে তুমি আমারে ভেজো না।'
'দুঃখ হলো বলে কি প্রেম ত্যজিব।
দুঃখে সুখ বোধ করে যতনে তায় তুষিব।' —ইত্যাদি

একথাটা আবার স্মরণ করা দরকার—কবিতাকার হিসাবে নিধুবাবুর দোষ অনেক। ঈশ্বর গুপ্তের কালেও তা বোঝা গিয়েছিল—তাই তিনি জানিয়েছেন "তখন লোকে কিছু মোটা কাজ ভালবাসিত; এখন সরুর উপরে লোকের অনুরাগ।" এ ত্রুটির কথা পূর্বেই বলেছি।—দেহ-মন-প্রণয় এ সবকে একে-

বারে ধোঁয়া করে না ফেলে আত্মপ্রকাশের চেষ্টা তখনকার গীতিকার, কবিতাকাররা করেছেন—ঈশ্বর গুপ্তও তার এক ধরনের দৃষ্টান্ত।—নিধুবাবু একটা মূল পার্থিব ভাবকে এই সহজ পার্থিব অর্থেই গ্রহণ করেছেন—এ হিসাবে তা বাঙলা কাব্যের দুর্লভ বস্তু—বাস্তবের স্বীকৃতি (দ্রষ্টব্য—ডঃ দে, ইংরেজিতো বঃ সাঃ ইঃ, পৃঃ ৩৩৮)। তাছাড়া যিনি হিন্দুস্তানী ভাষা ছেড়ে বাঙলায় টপ্প রচনায় নামলেন তিনি একটা 'যুগপ্রবর্তক', নতুন যুগের এই বোধটা তাঁর জন্মেছে—

নানান দেশে নানান ভাষা
বিনে স্বদেশী ভাষা পুরে কি আশা॥

—'ইয়ং বেঙ্গলের' যা তখনো জন্মেনি, অথচ তাঁদের স্বদেশপ্রীতি ছিল প্রবল। নিধুবাবুর জীবন থেকে দেখতে পাই—স্বদেশপ্রীতি ও মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ, দুইই এক হয়ে বাঙালী গুণীদের মনে সঞ্চারিত হয়েছে। ঈশ্বর গুপ্ত সেদিনের প্রধান নেতা। নিধুবাবু নিজে সে যুগের নন, বরং পূর্বযুগের। তাঁর গুণিসমাজেও সম্ভবত ইংরেজি জানা পাঠকেরা ছিলেন না—ছিলেন কলিকাতার বাবুসমাজের গুণী প্রতিনিধিরা। নিধুবাবুর চিত্তেও এই নতুন কালের চেতনার আভাস দেখা দিয়েছিল, এইটুকু লক্ষণীয় বিষয়:

"বিনে স্বদেশী ভাষা পুরে কি আশা?"

॥ ৩ ॥ পদ্যের নূতন অনুভাবন।

নবযুগের সভ্যতার সঙ্গে সাক্ষাতের ফলে জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে নূতন বোধ বাঙালী-জীবনে আসত। ইংরাজি সাহিত্যের রসাস্বাদনে তা বাঙলা সাহিত্যে কল্পনাতীত নতুন অনুভাবনার সঞ্চার করল। সে অনুভাবনা যেমন তীব্র ও প্রবল, বাঙলা সাহিত্যের পরিচিত পথ ছিল সেই পক্ষে তেমনি দুর্গম। নাটকের বেলা শেক্‌স্‌পীয়রকে বাঙলায় ঢালবার দুঃসাধ্য চেষ্টায় আমরা তা দেখেছি। বাঙলা পদ্যের অভ্যস্ত পথ ছিল তার অপেক্ষাও সংকীর্ণ; নতুন দৃষ্টিতে প্রায় অচল। অনভ্যস্ত রাজ্যে যাত্রার জন্য চাই নতুন পথ নির্মাণ করা—সে সাধ্য কার আছে? যাঁরা ইংরেজি কাব্য-সাহিত্যের রসাস্বাদন করলেন তাঁরা তাই সরাসরি ইংরেজিতেই কাব্য-রচনার প্রয়াসে উৎসাহী হয়েছিলেন। এ চেষ্টা যে আরও দুঃসাধ্য তাঁদের তা বোঝা উচিত ছিল। কারণ যত্নায়ত্ত পরভাষায়

মানুষ আপনার যুক্তি-বদ্ধ চিন্তা-ভাবনা প্রকাশ করতে পারে। এমন কি, এক ধরনের গল্প-উপন্যাস-নাটকও হয়ত তাতে রচনা করা যায়। কিন্তু কাব্য?—মাতৃভাষায় ছাড়া পরভাষায় যথার্থ কাব্য-রচনা অসম্ভব। মনোমোহন ঘোষ, শ্রীঅরবিন্দ বা সরোজিনী নাইডুও এর ব্যতিক্রম নন—তাঁদের পক্ষে ইংরেজিই ছিল প্রকৃত মাতৃভাষা। মাতৃভাষা যদি বাঙলা হয় তা হলেও কারও হতাশ হবার কারণ নেই. একথা উনবিংশ শতকের কবিযশঃপ্রার্থী ইংরেজি-শিক্ষিতদের বুঝতে শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদও অতিবাহিত হয়। সেই পাদেই স্বদেশ ও স্বভাষার প্রতি মমতা ও শ্রদ্ধা জেগেছিল, তাতে দৃষ্টি-পরিবর্তনের স্পষ্টাভাস পাওয়া যায়—স্বভাষার অনুশীলনের মধ্য দিয়েই পদ্যের এই নতুন অনুভাবনা ক্রমে আপনার পথ বাঙলাতে আবিষ্কার করবে।

বাঙালীর ইংরেজি কবিতা : যে বাঙালী শিক্ষিতরা ইংরেজির গৃহে আশ্রয় খুঁজেছিলেন তাঁরাও কিন্তু বাঙলা সাহিত্যের পক্ষে একবারের মত স্মরণীয়—শিক্ষিত বাঙালী মন নবযুগের চেতনাকে কিভাবে আত্মসাৎ করতে চাইছে, তাঁরা তার সাক্ষ্য দেন। তাঁদের সেই সাক্ষ্যও তাঁদের সহযোগী ও অনুগামী শিক্ষিত বাঙালীদের ভাবলোককে পরোক্ষে প্রভাবিত করেছে, এবং পরবর্তী বাঙালী কবিরা সবাই সেই ভাবলোকের সন্তান।—ইংরেজিতে লেখা বাঙালীর কবিকর্মও বাঙালীর কবিতা, আর সে বিপরীত প্রয়াস বাঙালী কবিদের সতর্কও করেছে; অন্যদিকে সেই কাব্যানুভাবনা সমসাময়িকদের কাব্য-চেতনাকে কিছু-না-কিছু পুষ্ট করেছে।

এই ইংরেজিওয়ালা বাঙালী কবিদের মধ্যে প্রথম গণ্য কবি ডিরোজিও, যদিও তিনি বংশে পর্তুগীস ফিরিঙ্গি, ধর্মে নবযুগের জিজ্ঞাসু মানুষ আর কর্মে 'ইয়ং বেঙ্গলের' বা নবযুগের বাঙালীর মন্ত্রগুরু। ভারতবর্ষকে 'মাই কাণ্ট্রি' বা 'স্বদেশ আমার' বলে তিনিই প্রথম অনুভব ও সম্বোধন করেছেন,—আর এই দেশাত্মবোধ যুগধর্মের প্রধান এক মন্ত্র। 'ডিরোজিও'র প্রেরণা অবশ্য বাঙলার পথে তাঁর শিষ্যদের না চালিয়ে ইংরেজি কাব্য-পথেই প্রথম দিকে (ইং ১৮৩০) থেকে চালিয়েছে—কাশীপ্রসাদ ঘোষ (ইং ১৮০৯—ইং ১৮৭৩), রাজনারায়ণ দত্ত (ইং ১৮২০—ইং ১৮৮০) আর সে পথ ত্যাগ করতে পারেন নি। 'দত্ত ফ্যামিলি অ্যালবামের' দত্ত-কবিরাও সেখানে আবদ্ধ থাকেন। তরু দত্ত-অরু দত্ত দু'বোনের খ্যাতি এখনো লুপ্ত হয় নি, না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু

ততক্ষণে বাঙলার কাব্যপথ আবিষ্কৃত হয়েছে। ইং ১৮৩৯-এও মাইকেল 'ক্যাপটিব্ লেডি' লিখেছিলেন, সংযুক্তার উপাখ্যান অবলম্বন করে,—কিন্তু বিশ বৎসর পরে বঙ্গ-ভাণ্ডারের বিবিধ রতনে তাঁর উৎসাহ জাগ্‌ল।

লক্ষ্য করবার মত এই যে, এসব কবিদের প্রেরণা প্রায়ই রোমান্টিক। ইংরেজির মারফতে তাঁরা গ্রীক-লাতিন থেকে প্রায় সমস্ত নূতন পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের সঙ্গেই পরিচিত হয়েছিলেন। ইংরেজি সাহিত্যেরও তিনটি প্রধান যুগের তাঁরা রসাস্বাদন করছিলেন—প্রথম, রোমান্টিক যুগের শেক্‌স্‌পীয়র-মিলটন ছিলেন তাঁদের চোখে প্রায় দেবতা। দ্বিতীয়, 'ক্লাসিক' যুগের (বা ইংরেজি অষ্টাদশ শতকের) ড্রাইডেন পোপ প্রভৃতির সঙ্গেও তাঁদের কারও কারও পরিচয় কম ছিল না। তৃতীয়, ইংরেজি সাহিত্যের 'রোমান্টিক পুনরাবির্ভাবের' যুগ (ইং ১৭৯৮—ইং ১৮৩২) তাঁদের নিজেদের নিকটবর্তী কাল—ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, কোলেরিজ, বায়রন, শেলি, কীট্‌সকে আমরা এখন দূর থেকে বিস্ময়ের দৃষ্টি মেলে যেভাবে দেখি তখনকার যুগে তাঁদের পক্ষে তা সুসম্ভব ছিল না। বাঙালী যতই ইংরেজিওয়ালা হোক্, দেশ-কালগত একটা দূরত্ব থেকেই গিয়েছিল—বিংশ শতকের প্রথম পাদ পর্যন্তও সে দূরত্ব লোপ হয় নি। তাই ইং ১৮৫৭-৫৮ পর্যন্ত বাঙালীর দৃষ্টিতে দীপ্ত মহিমায় ফুটে উঠেছিলেন বায়রন,—অবশ্য 'ডন জুয়ান' অপেক্ষা 'চাইল্‌ড হারল্ড' প্রভৃতির কবিরূপেই বায়রন পরিচিত ছিলেন। তারপরেই বাঙালীর পরিচিত ছিলেন স্কট্, মুর, ক্যাম্পবেল প্রভৃতি আখ্যান-রচয়িতা কবিরা; আর কতকটা ওয়ার্ডসওয়ার্থ—হয়ত সেদিনের রাজকবি বলে, এবং একটু পরে টেনিসন। মধুসূদনের মত অত ব্যাপক পরিচয় আর কারও নিশ্চয়ই ছিল না। ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙালীদের কাব্যানুভাবনা তখনো প্রধানত শেক্‌সপীয়র-মিলটন ও বায়রন-স্কট্-মুর প্রভৃতির দ্বারাই বেশি প্রভাবিত ছিল—এই কথাটা তবু মনে রাখা দরকার। মধুসূদনের বিপ্লবী প্রয়াস (ইং ১৮৬০—১৮৭২-এর মধ্যে) বাঙলা কাব্যকে একেবারে হোমার-ভার্জিল-দান্তে-তাসো-মিলটন-ওবিদ-পেত্রার্কা এবং কৃত্তিবাস-কাশীদাস-কবিকঙ্কণ-জয়দেব-কালিদাস-ব্যাস-বাল্মীকি পর্যন্ত স্বচ্ছন্দগামী করে দিয়ে গেল। কিন্তু বায়রন-স্কটের শাসন তার পরেও বহুদিন পর্যন্ত বাঙালীর মনে ছিল—অবশ্য সেই শতাব্দীর শেষ পাদে শেলি, টেনিসন, সুইনবার্ণও একটু-একটু করে দেখা দিয়েছিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

ইংরেজি সাহিত্যের কাব্যানুভাবনায় প্রবুদ্ধ হয়ে যখন বাঙালী শিক্ষিতরা ইংরেজি কাব্য-রচনার কথা ভাবতেন তখন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বাঙলা পদ্য-রচনায় নূতন করে উৎসাহ সঞ্চার করেন। নূতন কাব্যানুভাবনায় তিনি প্রবুদ্ধ হন নি; তবু নবযুগের বাস্তব উদ্যোগ আয়োজনের ফলে কতকটা বাস্তব-বোধ তাঁর চিন্তায়-দেখা দেয়; কতকটা নিজের প্রবণতায়ও তিনি বাঙলা পদ্যে অভিনবত্ব দান ক'রন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর গুণগ্রাহী শিষ্য হয়েও দুঃখ করেছেন —বাঙলার উন্নতি আরও ত্রিশ বৎসর অগ্রসর হত যদি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বাল্য-কালে সম্পূর্ণ শিক্ষালাভ করতেন। ইংরেজি শিক্ষা দূরের কথা, তিনি প্রায় কোনো শিক্ষালাভেরই সুযোগ পান নি।

কাঁচরাপাড়ায় ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্রের জন্ম,—দরিদ্র বৈদ্য বংশেই জন্ম। বাল্য থেকেই ঈশ্বরচন্দ্র অসাধারণ মেধাবী ও স্মৃতিধর ছিলেন। মুখে মুখে তিনি ছড়া কাটতে পারতেন, পরে হাফ-আখড়াইয়ের দলে গান বেঁধে দিতেন। ওইখানেই তাঁর শিক্ষা। ভাগ্যক্রমে পাথুরিয়াঘাটার যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হল, তাঁর সাহায্যে (ইং ১৮৩১ সালের ২৮শে জানুয়ারি) ঈশ্বরচন্দ্র নিজের সম্পাদনায় প্রথম 'সংবাদ প্রভাকর' প্রকাশিত করলেন। বাঙলা সাহিত্যের সেটি শুভদিন—'সংবাদ প্রভাকর' সংবাদপত্রের ইতিহাসে একটা কীর্তি স্থাপন করল। তাঁর গদ্যরীতি আদর্শ না হলেও তখন বহুল অনুকৃত হয়। 'প্রভাকর' ছাড়া অন্য সংবাদপত্রও তিনি পরিচালনা করেছিলেন; কিন্তু নানা ভাগ্যবিপর্যয় সত্ত্বেও 'প্রভাকর' বাঙলার প্রথম দৈনিকে পরিণত হয় (ইং ১৮৩৯-এর ১৪ই জুন)—তাঁর প্রধান কীর্তি বাঙলা সাহিত্যক্ষেত্রে—'প্রভাকরে'র মাসপয়লার কাগজে বাঙলার প্রাচীন কবিদের জীবনী ঈশ্বরচন্দ্র সযত্নে সংগ্রহ করে মুদ্রিত করেন (ইং ১৮৫৩ থেকে)—আমরা তা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। 'প্রভাকরে' ঈশ্বর গুপ্ত কবিতা রচনার আসর প্রস্তুত করেন; আর একদল নূতন যুবককে কাব্য-রচনায় উৎসাহিত করেন—তাঁদের মধ্যে ছিলেন রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র। এজন্যও ঈশ্বর গুপ্ত ও 'প্রভাকর' অমর হয়ে থাকবেন। ইং ১৮৫৯ সালে (২৩শে জানুয়ারি) মাত্র ৪৭ বৎসর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করেন। তখন মাইকেলও প্রায় উদিত হয়েছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সম্বন্ধে বলেছেন, "সে কাল আর এ কালের সন্ধিস্থলে ঈশ্বর গুপ্তের আবির্ভাব।" হাফ-আখড়াইয়ের দলে তিনি কবিতা বাঁধতেন; দেশীভাবে ছড়া কাটা, ব্যঙ্গপ্রবণতা ছিল তাঁর স্বভাব। সাধারণ বাঙালীর প্রতিদিনকার জীবনযাত্রার জিনিসে তাঁর অনুরাগ ছিল, আর সেই অভ্যস্ত জীবনকে নূতন কালের দাপাদাপি থেকে ব্যঙ্গবিদ্রূপে তিনি রক্ষা করতে চাইতেন। এসব তাঁর একদিক। অন্যদিকে দেখি তিনি 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র সভ্য, ব্রাহ্মসভার একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী, নানা রকম সভা সমিতি উৎসবে উৎসাহী।—এসব অন্যদিক, নবযুগের প্রাণধর্ম। তথাপি ঈশ্বর গুপ্তের ঝোঁকটা রক্ষণশীলতার দিকেই বেশি, নতুনকে আক্রমণেই তাঁর ব্যঙ্গের তীব্রতা। যেমন আগে মেয়েগুলো ছিল ভালো, 'বেথুন' এসে শেষ করেছে—

যত ছুঁড়ীগুলো তুড়ী মেরে,
কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে।
তখন "এ, বি", শিখে বিবি সেজে,
বিলাতী বোল কবেই কবে।
ও ভাই! আর কিছু দিন বেঁচে থাকলে
পাবেই পাবে দেখতে পাবে।
এরা আপন হাতে হাঁকিয়ে বগী,
গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে।...
ঘোর পাপে ভরা হোলো ধরা
রাঁড়ের বিয়ের হুকুম যবে।...

ঐতিহ্যের এমনি জোর, নারীর অধিকার জিনিসটা বহু যুক্তিবাদীও স্বাভাবিক মন নিয়ে বিচার করতে পারেন না। সে আমলে তখন একদিকে ছিল 'ইয়ং বেঙ্গলে'র উৎকট বিদ্রোহ, অন্যদিকে ছিল ডাফ প্রমুখ পাদ্রিদের 'উৎপাত'। দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখদেরও তা শঙ্কিত করে তুলেছিল। ঈশ্বর গুপ্তের এ বিদ্রূপে তাঁদেরও আপত্তি হত না—

হোটেল মন্দিরে ঢুকে দেখিয়া বাহার।
ইচ্ছা হয় হিন্দুয়ানী রাখিব না আর॥
জেতে আর কাজ নাই ঈশগুণ গাই।
খানা সহ মানা রূপে বিবি যদি পাই॥...

যা থাকে কপালে ভাই, টেবিলেতে খাব।
ডুবিয়া ডবের টবে চ্যাপেলেতে যাব।…

কিন্তু নিজেদের নিয়ে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করতেও ঈশ্বরগুপ্তের কিছুমাত্র বাধত না। কারণ, তাঁর ব্যঙ্গে কোথাও বিদ্বেষ ছিল না। তিনি তাই বলতে পারতেন—

কসাই অনেক ভাল গোঁসাইয়ের চেয়ে।

ঈশ্বরকে বলতেও তাঁর বাধেনি—

তুমি হে আমার বাবা 'হাবা আত্মারাম।'

কিংবা পাঁঠার মাংসের সুখ্যাতি করে স্বচ্ছন্দে রায় দিতেন—

এমন পাঁঠার নাম যে রেখেছে বোকা।
নিজে সেই বোকা নয়, ঝাড়ে বংশে বোকা॥

আসলে তাঁর অন্তরে একটা রঙ্গের ফোয়ারা ছিল—আর এটি শুধু তাঁর বৈশিষ্ট্য নয়। সাধারণ বাঙালীরও তখনকার দিনে কতকটা অমার্জিত হলেও সহজ রঙ্গপ্রিয়তা ছিল। তাঁর একথাটা সেই 'ইয়ং বেঙ্গল' ও 'বাবু-বিলাসে'র দিনেও সত্য ছিল—এবং এখনো একেবারে মিথ্যা হয় নি—

এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গে ভরা!

কিন্তু ঈশ্বরগুপ্তের অভিনবত্ব কিসে?—শুধু এই রঙ্গপ্রিয়তায় ও ধর্মমতের উদারতায় নয়। তাছাড়া, প্রথম অভিনবত্ব তাঁর দেশপ্রীতিতে। 'ইয়ং বেঙ্গলে'র দেশপ্রেম বাঙলায় রাজনৈতিক-বোধ জাগায়। তার পূর্বেই ঈশ্বরগুপ্তের দেশপ্রেম—দেশের প্রতি স্বাভাবিক মমতা—আপনা থেকেই আত্মপ্রকাশ করেছে—

জান না কি জীব তুমি জননী জনমভূমি
যে তোমায় হৃদয়ে রেখেছে—…

এবং

কতরূপ স্নেহ করি দেশের কুকুর ধরি
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া।

তারপর

বৃদ্ধি কর মাতৃভাষা পুরাও তাহার আশা
দেশে কর বিদ্যা বিতরণ।

স্বদেশপ্রীতি স্বাভাবিক হলে স্বভাষাপ্রীতিও তার অঙ্গ হতে বাধ্য—'ইয়ং

বেঙ্গল' সে সত্য উপলব্ধি করতে পারেন নি বলে তাঁদের এত বিড়ম্বনা—দেবেন্দ্রনাথ; রাজনারায়ণ বসুর মত এ সত্য ঈশ্বরগুপ্ত অনুভব করেছেন—'মাতৃসম মাতৃভাষা'।

দ্বিতীয়ত, ঈশ্বরগুপ্ত বাস্তব বস্তু ও দৈনন্দিন জীবনযাত্রার কবি—পূজা অর্চা, প্রথা নিয়ম, পৌষ-পার্বণ', 'পাঁঠা', 'গ্রীষ্ম', 'শীত',—সব জিনিসে একটা সহজ সরস আনন্দ তাঁর আছে। সাময়িক বিষয়ে পদ্য রচনায় তাই তাঁর চমৎকার হাত দেখা যায়। ঈশ্বরগুপ্তের ভাষাও ছিল এই খাঁটি বাংলা কথার ছাঁদ। এই যে জাগতিক ব্যাপারে আগ্রহ, ঐহিকতায় আগ্রহ, এইটি সহজ জীবন-প্রীতির লক্ষণ; এইটি নবযুগের চেতনার একটি অঙ্গ, তা বারবার বলা নিষ্প্রয়োজন। এ সহজ বাস্তববোধ কিন্তু বাঙলা কবিতায় যথানুরূপ বিকাশ লাভ করে নি—পরে রোমান্টিকতা ও ভাবতন্ময়তা এসে তাকে ডুবিয়ে দিয়েছে। নবযুগের আরও লক্ষণ ঈশ্বরগুপ্তের কাব্যে দেখা যায়—যেমন প্রকৃতি-বর্ণনা। তা অবশ্য ওয়ার্ডসওয়ার্থীয় ধারার প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতার কথা নয়, শুধু বাস্তব বর্ণনা। আর একটি জিনিস নীতিমূলক কবিতা, -এও নতুন কালের নীতিবোধের চিহ্ন। কিন্তু একথা স্বীকার্য—ঈশ্বরগুপ্তের কাব্যবস্তু জীবনের গভীরতলা থেকে আহৃত নয়, উপরতলার বস্তু। তার কাব্যরীতি সম্পূর্ণ গতানুগতিক—তাঁর কৃতিত্ব কবিওয়ালাদের মত খাঁটি বাঙলা প্রয়োগে। বঙ্কিমের কথাতেই তাঁর শেষ পরিমাপ করা যায়—"কবির প্রধান গুণ, সৃষ্টি-কৌশল। ঈশ্বরগুপ্তের এ ক্ষমতা ছিল না।" অথচ তিনি বঙ্কিম-দীনবন্ধুর মত সাহিত্য-স্রষ্টাদের সৃষ্টিতে প্রবুদ্ধ করেছেন, খাঁটি বাঙলার কবি বলে বঙ্কিমের দ্বারা প্রশংসিত হয়েছেন। "আপনার অধিকারের ভিতর তিনি রাজা। ...তিনি বাঙলা সমাজের কবি। তিনি কলিকাতা শহরের কবি। তিনি বাঙলার গ্রাম্য দেশের কবি।"

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ও ঈশ্বরগুপ্তের দ্বারাই কবিতা রচনায় উদ্বুদ্ধ হন—স্রষ্টা হিসাবে তিনি অকিঞ্চিৎকর। ইং ১৮২৭ সালে রঙ্গলাল বর্ধমান জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ পেয়েছিলেন, হুগলী কলেজেও কিছুদিন পড়েন। 'প্রভাকরে'র পাতায় তাঁর সাহিত্যিক জীবন শুরু

হয়—ঈশ্বরগুপ্তের নেতৃত্বে। নিজেও নানা সংবাদপত্র পরিচালনা করেন. 'এডুকেশন গেজেট'-এর তিনি সহকারী সম্পাদক ছিলেন ইং ১৮৬২ পর্যন্ত। তারপর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হয়ে ইং ১৮৮২ পর্যন্ত নানা স্থানে সে কাজ করেন। ইং ১৮৮৭ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

কবি রঙ্গলাল প্রথমাবধিই রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি মনস্বীদের দ্বারা অভিনন্দিত হয়েছিলেন। দীর্ঘদিন পর্যন্ত কাব্য রচনাও তিনি করেছেন। তাঁর 'ভেক-মূষিকের যুদ্ধ' ও 'পদ্মিনী উপাখ্যান' প্রকাশিত হয় ইং ১৮৫৮ সালে, আর শেষ দিককার 'কাঞ্চীকাবেরী' কাব্য ইং ১৮৭৯ সালে—মধুসূদন কেন, হেম-নবীনও তখন সুপরিচিত। কিন্তু যে কারণেই হোক, নাট্যজগতে রামনারায়ণ আদির মত, কবিতার জগতে রঙ্গলাল পরবর্তী মহাপ্রকাশের যুগে কিছুতেই আত্ম প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন নি। তার নাড়ীর যোগ প্রস্তুতির পর্বের সঙ্গেই, তিনিও যুগসন্ধিস্থলেরই কবি। তিনি লিখতে চাইছেন মূর, স্কট, বায়রনের মত আখ্যান কাব্য, কিন্তু তা লিখছেন বাঙলা পদ্যের পুরাতন ধারায়। 'পদ্মিনী উপাখ্যান' তাঁর সর্বাধিক পঠিত কাব্য। 'কর্মদেবী'ও (ইং ১৮৬২) রাজস্থানের সতী-বিশেষের চরিত্র নিয়ে লিখিত; আর 'শূরসুন্দরী'ও (ইং ১৮৬৮) রাজস্থানীয় বীরবালা-বিশেষের চরিত্র। কেবল 'কাঞ্চিকাবেরী', (১৮৭৯) ওড়িস্যার বীরাঙ্গনা চরিত্র, না হলে সবই রাজস্থানীয়। টডের রাজস্থান প্রকাশিত হয়ে পরাধীন বাঙালী হিন্দুর মানসক্ষেত্রে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল রঙ্গলালের 'পদ্মিনী উপাখ্যানে' তার প্রথম পরিচয় পাই।—মাইকেলের 'ক্যাপটিব লেডি'তে (১৮৪৯) টডের ছায়া নেই. কিন্তু পরে 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে' মধুসূদনও টডের রাজস্থান থেকে আখ্যান-বস্তু গ্রহণ করেছেন। শুধু টড নয়, রঙ্গলাল সংস্কৃত ও ইংরেজি থেকে নানা কুসুম চয়নেই উৎসুক ছিলেন—হোমার কালিদাস কেউ বাদ যায় নি। গোল্ডস্মিথ, মূর প্রভৃতি ছিল তাঁর প্রিয় কবি। 'বাঙলা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ'-এ (১৮৫২তে) তিনি বাঙলা কবিতার প্রতি তাঁর মমতার প্রমাণও দিয়েছেন। কিন্তু কাব্যরচনায় তাঁর সার্থকতা সামান্য। মাত্র একটি মহৎ ভাবের ও যুগ-সত্যের বাণীর জন্যই তিনি বাঙলা সাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে আছেন—

'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,
কে বাঁচিতে চায়।'

কাব্যানুভাবনা সম্ভবত তাঁর ছিল, কাব্যশক্তিও কিছু ছিল,—মাঝে মাঝে পুরনো রীতিতে ছন্দকৌশলও দেখিয়েছেন—

ঠুকে তাল, আঁখি লাল, কি করাল মূর্তি।
মহাকায়, হরি-প্রায়, যেন পায় স্ফূর্তি ॥

রঙ্গলালের প্রধান আকর্ষণ এই যে, সিপাহী যুদ্ধের বিপর্যয়ের মধ্যে তিনি যুগের অন্তর্নিহিত এই সুরটি ধরতে পেরেছিলেন—স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে। এ শুধু ঈশ্বরগুপ্তের স্বদেশপ্রীতির জের নয়, স্বাধীনতা মন্ত্রেরও প্রথম উচ্চারণ হেমচন্দ্রের 'ভারত-সঙ্গীত'-এরও প্রথম আভাস।

পর্বাবশেষ

ইং ১৮৫৮ সালের ১লা নভেম্বর কোম্পানির হাত থেকে মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারতের শাসনভার গ্রহণ করেন। সমস্ত ভারতবর্ষ সিপাহী যুদ্ধের শেষে অনুভব করল—পুরনো সামন্ত-ব্যবস্থা ও ভাবধারার আর প্রভাব থাকবে না; তার জের যা থাকবে, তা থাকবে ব্রিটিশ ('কলোনিয়াল') শাসন ও শিল্পাধিপত্যেরই প্রয়োজনে। বিজয়ী নবযুগের সভ্যতার উদ্যোগ-আয়োজনে যোগ না দিয়ে আর ভারতবাসীর পথ নেই। এই সত্যটা বাঙালী অনুভব করছিল প্রায় চল্লিশ বৎসর ধরে (অন্তত ১৮১৭তে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা থেকে)। বাঙালীর আত্মপ্রকাশের চেতনারও তখন থেকেই উন্মেষ হয়—ব্যক্তিগত আত্মপ্রকাশের ও জাতীয় আত্মপ্রকাশের, সামাজিক-রাজনৈতিক আত্মপ্রকাশের ও সাংস্কৃতিক আত্মপ্রকাশের। শহরের বণিক শ্রেণী অপেক্ষাও শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণীই 'শিক্ষিত শ্রেণী'রূপে এ প্রেরণার বাহন হয়ে উঠতে থাকেন। বাঙালীর মহাসৌভাগ্য, যুগসত্যকে অনিবার্য ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে জীবনে গ্রহণ করবার মত মহামনস্বীও এই প্রস্তুতিপর্বে 'শিক্ষিত শ্রেণী'র মধ্যে জন্মেছিলেন—রামমোহন. ইয়ং বেঙ্গল. বিদ্যাসাগর, এই তিন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে তাঁদের তপস্যা অগ্রসর হয়ে এল। পর্বান্তে সেই প্রস্তুতি সমাজে ধর্মে বিশেষ সক্রিয়, কেশবচন্দ্রের অভ্যুদয়ে তার বিরাট প্রকাশ আরম্ভ হবে। রাষ্ট্রে তা প্রতিবাদ থেকে প্রতিরোধে এসে উত্তীর্ণ হতে প্রস্তুত, নীলবিদ্রোহে তা প্রমাণিত হবে। আর সাহিত্যে-সংস্কৃতিতে তা মহোৎসবের সংকল্পে অপেক্ষ-

মান—জ্ঞানগর্ভ ও ভাবগর্ভ গদ্যের ভাষা আবিষ্কৃত ও অধিকৃত হয়েছে, নাটকের সামাজিক-ক্ষেত্র প্রস্তুত, আর কাব্যের অনুভাবনায় পদ্য মুক্তি-ব্যাকুল। ইং ১৮৫৮-এর শেষে প্রয়োজন ছিল প্রতিভার—মধুসূদনের ও বঙ্কিমের,—নবযুগের জীবনাদর্শ ও সাহিত্যাদর্শকে ইংরেজির মোড়ক ছাড়িয়ে যাঁরা জাতীয় জীবনাদর্শ ও সাহিত্যাদর্শে পরিণত করতে পারবেন—স্বাধীনতার সাধনায় ও সাহিত্যের সাধনায় সমস্ত শতাব্দী তাতে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

অবশ্য মূলগত অসঙ্গতিও রইল, তা ভুলবার নয়—ঔপনিবেশিকতার পরিবেশে বাঙালীর নবপ্রণীত সাধনা বাস্তব জীবনে খর্বিত থেকে গেল; সাংস্কৃতিক আয়োজনেও বাঙালী শিক্ষিত শ্রেণী দেশের জনসমাজ থেকে কতকাংশে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। বিশেষ করে দেখি, বিক্ষুব্ধ মুসলমান সমাজকে নবযুগের এই জাগরণ-চাঞ্চল্য প্রায় স্পর্শও করতে পারে নি। অপরদিকে, খ্রীষ্টীয় প্রভাব প্রতিহত করবার জন্য দেবেন্দ্রনাথ-রাজনারায়ণ বসু প্রমুখ মনীষীরা প্রাচীন হিন্দু ঐতিহ্যের সঙ্গে এই সাধনাকে সংযুক্ত করলেন। তাতে তখন থেকেই হিন্দু জাগরণ ও হিন্দু জাতীয়তাবাদ ক্রমেই আমাদের জাতীয় জাগরণের প্রধান রূপ হয়ে উঠতে লাগল।
